2 – year B. Ed Programme

Part – I

Method Paper : Education

UNIVERSITY OF BURDWAN

DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

Golapbag, P.O – Rajbati,

Burdwan – 713104

পাঠ-প্রণেতা

ডঃ সনৎ কুমার ঘোষ

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
কালনা কলেজ (বি.এড. বিভাগ)
কালনা, বর্ধমান।

যুগ্ম সম্পাদক

অধ্যাপক তুহিন কুমার সামন্ত

শিক্ষা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

বিভাগীয় প্রধান (বি.এড)
ডিরেক্টরেট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থসত্ত্ব © ২০১৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান—৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রকাশনা

ডিরেক্টর, দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

সম্পাদকের নিবেদন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে ১৯৯৪ সাল থেকে। আর দূরশিক্ষার মাধ্যমে বি.এড. চালু করার পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয়েছে ২০১৪ সালে, যা দূরশিক্ষা অধিকরণের তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই প্রচেষ্টা এই প্রথম। ভারতের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য এবং এই পেশামূলক কোর্সটির বিস্তার ঘটানোর জন্য এই কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বি.এড. কোর্সটি NCTE-র (National Council For Teacher Education) নিয়মানুসারে দ্বি-বার্ষিক কোর্স হিসাবে কার্যকরী হয়েছে। Part-I ও Part-II-এর চারটি করে আবশ্যিক পেপার এবং সর্বমোট ১২টি মেথড পেপারের পাঠ্যবিষয়গুলি যাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই যাতে তারা তা অনুধাবন করতে পারে, সেজন্য প্রতিটি পেপারের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা কিনা সম্পূর্ণভাবে এখানকার পাঠক্রম অনুসারী। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য দূরশিক্ষা অধিকরণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ এবং অন্যান্য অনুমোদিত কলেজগুলি থেকে দক্ষ অধ্যাপক/অধ্যাপিকা নিযুক্ত করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁদের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অধিকর্তা ডঃ দেবকুমার পাঁজা মহাশয় এই কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করেছেন। উপ-অধিকর্তা শ্রী অংশুমান গোস্বামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই কাজটি সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অন্যান্য সকল আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মীদের সহযোগিতা অবশ্য-স্মরণীয় এবং সামগ্রিকভাবে সবক্ষেত্রে আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই বি.এড.-এর দুইজন কোর-ফ্যাকাল্টি ডঃ সোমনাথ দাস এবং শ্রী অর্পণ দাসকে।

আগস্ট, ২০১৬

প্রফেসর তুহিন কুমার সামন্ত

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

CONTENT

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
একক - ১ :	পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসূচী	১
একক - ২ :	শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসারী বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ	১০
একক - ৩ :	শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রকৃতি	২৬
একক - ৪ :	শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	৭৯
একক - ৫ :	শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার	১৩৫

Group - A

একক- ১

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসূচী

(Content of the syllabus of Class XI-XII under WBCHSE or equivalent)

১.১ ভূমিকা (Introduction)

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.৩ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আলোচ্য বিষয়বস্তু (Contents)

১.৪ সারাংশ (Summary)

১.৫ গ্রন্থপঞ্জী (References)

১.৬ প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

১.১ ভূমিকা (Introduction)

মানুষের জীবনের দুটি দিক, একটি হল তার জৈবিক সত্তার দিক (Biological Aspect) এবং আর একটি হল তার সমাজিক সত্তার দিক (Sociological Aspect), এই উভয়দিকের সমন্বয়ের মধ্যে তার জীবনপ্রবাহ আবদ্ধ থাকে। এই কারণেই জৈবিক এবং সামাজিক এই উভয় ধরনের চাহিদাই তার মধ্যে সতত বর্তমান। জৈবিক চাহিদাগুলিকে চরিতার্থ করে, নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে খাদ্য পরিপাক, প্রজনন ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরনের জৈবিক কৌশল সে প্রয়োজন মত ব্যবহার করে। এইসব কৌশল শুধু মানুষেরই কেন, অন্যান্য ইতর প্রাণীদেরও আয়ত্তাধীন। কিন্তু, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দিকে, সে প্রাণীকুলে একক। জীবনের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য মানুষের সকল রকম জৈবিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি প্রয়োজন। অর্থাৎ তার জীবনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে, দুধরনের চাহিদাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তাবিদগণ মনে করেন, মানুষের অন্তর্নিহিত যে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক চাহিদার বা ক্ষুধার সৃষ্টি হয়, তা একমাত্র পরিতৃপ্ত করতে পারে শিক্ষা (Education)। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ গোয়েটিং বলেছেন, ''Just as three are certain vital process of life in a biological sense, so education may be considered as a vital process in social sense.'' অর্থাৎ জৈবিক প্রক্রিয়াগুলির মত শিক্ষাও মানুষের জীবনে এক জীবনদায়ী প্রক্রিয়া। এই কারণেই 'শিক্ষা', মানুষের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষার ইতিহাস, মানবসভ্যতার বিকাশেরই ইতিহাস।

1976 সালে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (West Bengal Council of Higher Secondary Education)-এর তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা শুরু হয়। এই স্তরের শিক্ষা পরিচালনার জন্য সংসদ একটি পাঠ্যক্রম রচনা করেন। পরবর্তীকালে এই পাঠ্যক্রমের সাংগাঠনিক কাঠামোটিকে বজায় রেখে, বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজ্যের অনুমোদিত শিক্ষালয়গুলিতে বর্তমানে এই পরিবর্তিত পাঠ্যক্রমই অনুসরণ করা হয়। এই স্তরের শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের উপর বিশেষভাবে

গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমেও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে এই স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে দুটি সমান্তরাল পাঠ্যক্রম বর্তমান। একটি হল সাধারণ শাখার (General Stream) পাঠ্যক্রম এবং অপরটি হল বৃত্তিমূলক শাখার (Vocational Stream) পাঠ্যক্রম।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

- শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করা।
- শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা।
- শিক্ষাতত্ত্ব ও শিশুর বিকাশ সম্পর্কে বোধ জাগানো।
- শিক্ষার ইতিহাসকে জানা।
- উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১.৩ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আলোচ্য বিষয়বস্তু (Contents)

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান হল একটি প্রয়োগমূলক সমন্বয়ধর্মী বিজ্ঞান। একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞান বা জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট আলোচনাসূচী থাকা স্বাভাবিক। তার এই আলোচনাসূচীকে বলা হয় শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Subject Matter)। এই বিষয়ে শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শনের সব বিষয়গুলিই শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। তবে একথাও স্মরণ রাখা দরকার, উল্লিখিত বিষয়গুলিই শুধুমাত্র শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নয়। একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান হিসাবে, শিক্ষাবিজ্ঞান প্রয়োজনের চাহিদায়, সে তার বিষয়বস্তুকে সতত বিস্তৃত করে চলেছে। তাই তার আলোচ্যসূচি ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমান পর্যায়ে এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে ব্যাপক ক্ষেত্রগুলি উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল-

(১) শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy) : শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশে বিশেষভাবে শিক্ষার আদর্শগত দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মানুষের চরম জীবনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার তাৎপর্য নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ তাদের আলোচ্য বিষয়সূচীতে এই অংশটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আদর্শগত দিক থেকে, শিক্ষা বলতে কী বোঝায়, শিক্ষার চরম লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত, শিক্ষার পাঠ্যক্রমের (Curriculum) প্রকৃতি কীরূপ হওয়া উচিত, এসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় শিক্ষাদর্শনে অর্থাৎ শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োগিক দিকের দার্শনিক সমর্থন একত্রিত করাই শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশের উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশে আলোচিত বিষয়বস্তুকে এককভাবে, শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical bases of education) নামে অভিহিত করা হয়।

(২) শিক্ষাতত্ত্ব (Principles of Education) : শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার যে দিক নির্দেশ করে বা যে আদর্শ স্থাপন করে, সেগুলিকে কীভাবে লাভ করা যায় সে সম্পর্কিত আলোচনাই হল শিক্ষাতত্ত্ব। শিক্ষাবিজ্ঞানের

এই অংশে মূলত, শিক্ষার নীতি কী হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। আর এই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সামাজিকবিজ্ঞান (Sociology) এবং মনোবিদ্যার (Psychology) সাহায্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিদ্যার পরীক্ষিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করে, শিক্ষাদর্শ চরিতার্থ করার উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব এবং কার্যকরী নীতিসমূহ নির্ধারণ করাই শিক্ষাতত্ত্ব অংশে, আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

(৩) শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Method) : শিক্ষাবিজ্ঞানে এই অংশটি শিক্ষার পদ্ধতি কীরকম হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আলোচনা করে। শিক্ষক কীভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন, শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, কীভাবে তিনি শিক্ষার্থীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়াটিকে চরম পর্যায়ে কার্যকরী করে তুলতে পারেন, সেই সম্পর্কে আলোচনা হয় এই অংশে। পাঠ্যবিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময়, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, উভয়ের কী করণীয়, সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করাই শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশের উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক তাৎপর্যে, শিক্ষাবিজ্ঞানে, শিক্ষণ কৌশল এবং শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। তাই আধুনিককালে, শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশকে পৃথকভাবে বলা হয় পদ্ধতিবিজ্ঞান (Methodology)। শিক্ষণের বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও মনোবিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান, সামাজিকবিজ্ঞান ইত্যাদির তথ্যাবলীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

(৪) শিক্ষা প্রশাসন (Educational Administration) : শিক্ষার সম্পূর্ণ কাজ পরিচালিত হয় কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সাধারণভাবে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হয়, শিক্ষালয়, (Educational Institution/School) এই শিক্ষালয়গুলিকে কীভাবে পরিচালনা করলে, শিক্ষা পরিবেশে আদর্শ এবং শিক্ষা সহায়ক মানবীয় সম্পর্ক (Human Relation) বজায় থাকবে, সেসম্পর্কে আলোচনা করা হয়, শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশে কীভাবে পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করলে, শিক্ষালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আদর্শস্থানীয় হবে, এবং শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ রচনা করা সম্ভব হবে, সেবিষয়ে আলোচনা করা হয়, শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশে। শিক্ষালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং শিক্ষালয়ের পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো (Organisation) নির্ধারণ করা, শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দায়িত্ব এবং কর্তব্য এই সকল বিষয় সম্পর্কেও শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, বর্তমানে শিক্ষালয়গুলিকে এক একটি সমাজ (Society) হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই এই শিক্ষালয় সমাজের প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, সেবিষয়েও আধুনিককালে আলোচনা করা হয়, শিক্ষা প্রশাসন সংক্রান্ত অংশে।

(৫) শিক্ষাগত অর্থনীতি (Economics of Education) : আধুনিককালে শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সমাজকে বা রাষ্ট্রকেই তার বেশিরভাগ ব্যয়ভার বহন করতে হয়। আধুনিককালে, শিক্ষার আর্থিক দিককে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার অর্থনীতি জাতীয় বা সামাজিক অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে। সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তিদের জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সম্পদ লাভ করা হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে। তাই সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থায়, প্রাপ্তি ও বিনিয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা একান্তভাবে প্রয়োজন। শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষাগত অর্থনীতি সংক্রান্ত অংশে বিশেষভাবে শিক্ষার আর্থিক সমস্যা এবং সেই সংক্রান্ত পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে

আলোচনা করা হয়। কীভাবে, অর্থ ব্যয় করে বা বিনিয়োগ করে সবচেয়ে বেশী মানব সম্পদ (Human Resource) সৃষ্টি করা যায়, সেবিষয়ে দিক্‌নির্ণয় করাই, শিক্ষাগত অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য।

(৬) শিক্ষার ইতিহাস (History of Education) : সুষ্ঠু শিক্ষানীতি গড়ে তোলার জন্য মনুষ্যসমাজে, শিক্ষার বিবর্তনের ধারাটি যথার্থভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তিতে, পূর্ববর্তী পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে, শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে না পারলে তা কখনো সার্থক ফল দেবে না। এই কারণে, শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। শিক্ষা-সংক্রান্ত এই ঐতিহাসিক তথ্যাবলী শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক সমস্যাবলীর প্রকৃত মূল্যায়নে সহায়তা করে। শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর এই অংশকে বলা হয়, শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historical Basis of Education)

(৭) তুলনামূলক শিক্ষা (Comparative Education) : তুলনামূলক শিক্ষা, শিক্ষাবিজ্ঞানের এমন একটি অংশ যেখানে বিশেষভাবে বিভিন্ন দেশের বা সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষণ কৌশল ও শিক্ষার অন্যান্য দিক সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে। শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশের মূল উদ্দেশ্য হল— পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে বা রাষ্ট্রে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা। তাছাড়া, তুলনামূলক শিক্ষা, প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিগুলি সংক্রান্ত জ্ঞানও সরবরাহ করা থাকে।

(৮) শিক্ষাগত প্রযুক্তিবিদ্যা (Educational Technology) : শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশে, শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কৌশল প্রয়োগের রীতি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত কৌশলগুলি ব্যবহার করে, শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটানো সম্ভব, এই ধারণা আধুনিককালে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন ধরনের শিখন সহায়ক প্রদীপন (Aids) কীভাবে ব্যবহার করা যায়, বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করে, শিক্ষণকে স্বয়ংক্রিয় (Auto-Instruction) করা যায়, কীভাবে গণসংযোগের মাধ্যমগুলিকে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায়, এইসব বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অংশে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হল উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় শিখন (Learning) এবং শিক্ষণের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শিক্ষাবিজ্ঞান মানুষের জ্ঞানের এমন একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র যার মধ্যে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকল রকম বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এর অন্তর্গত বিষয়বস্তুসমূহের আপাত ভিন্নতা লক্ষ করা গেলেও সেগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে উন্নত পর্যায়ে কার্যকরী করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান করাই এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান তার নিজের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে গিয়ে অন্যান্য সামাজিকবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সার্থক সমন্বয় করেছে। উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যসূচীতে উপরোক্ত বিষয়গুলিকেই বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। নীচে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বর্তমান পাঠ্যসূচিটিকে (Syllabus) উল্লেখ করা হল।

শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

একাদশ শ্রেণী

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষার সংজ্ঞা

শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ ও সংজ্ঞা, জ্ঞান আহরণ করাই শিক্ষা, মানসিক শক্তির উৎকর্ষণই হল শিক্ষা, শিক্ষার ব্যাপক অর্থ ও সংজ্ঞা, জীবনবিকাশ হল শিক্ষা, শিক্ষা হল অভিযোজন প্রক্রিয়া, শিক্ষা অভিজ্ঞতা পুনঃসৃজনের প্রক্রিয়া, শিক্ষাপ্রক্রিয়া বনাম ফল।

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী

শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কী, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিখনের প্রকারভেদ, জ্ঞানমূলক শিখন, কর্মসম্পাদনের জন্য শিখন, যুথবদ্ধভাবে বাস করার শিখন, মানুষ হওয়ার শিক্ষা।

তৃতীয় অধ্যায় : শিক্ষার বিভিন্ন রূপ

শিক্ষার প্রকারভেদ, অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা, অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী, অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান : পরিবার, পরিবারের সাধারণ দায়িত্ব, পরিবারের শিক্ষামূলক দায়িত্ব, পরিবারের কর্মসীমা, ধর্মীয় সংস্থা, ক্লাব, অর্থনৈতিক ও উৎপাদনকেন্দ্র, সংযোগ মাধ্যমসমূহ : সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন, প্রথাগত/বিধিবদ্ধ শিক্ষা, প্রথাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী, শিক্ষালয়ের দায়িত্বাবলী, শিক্ষালয় ও সমাজ, শিক্ষালয়ের সীমাবদ্ধতা, প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, অপ্রথাগত/বিধিমুক্ত শিক্ষা, অপ্রথাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী, অপ্রথাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।

চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষা ও মানবীয়

সম্পর্ক জাতীয় সংহতির জন্য শিক্ষা, আন্তর্জাতিকবোধের জন্য শিক্ষা, আন্তর্জাতিকতাবোধের তাৎপর্য, আন্তর্জাতিকতাবোধের উপাদান।

শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

পঞ্চম অধ্যায় : পাঠ্যক্রম

পাঠ্যক্রম কী? পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্যাবলী, পাঠ্যক্রমের মৌলিক নির্ধারক উপাদান, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা ও ক্ষমতা, পাঠ্যক্রম ও সুযোগ সুবিধার প্রাপ্তি, পাঠ্যক্রমের বিন্যাসগত উপাদান।

ষষ্ঠ অধ্যায় : সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী সংক্রান্ত ধারণার বিবর্তন, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর প্রকারভেদ, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উপযোগিতা।

শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

সপ্তম অধ্যায় : শিক্ষা মনোবিদ্যা

শিক্ষা-মনোবিদ্যা, শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক, শিক্ষার ব্যবহারিক দিক ও মনোবিদ্যা।

অষ্টম অধ্যায় : জ্ঞাত হওয়ার মানসিক প্রক্রিয়া

জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়াসমূহ, সংবেদন, সংবেদনের বৈশিষ্ট্যাবলী, সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ, শিক্ষায় সংবেদনের গুরুত্ব, প্রত্যক্ষণ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য, প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্যাবলী, শিক্ষায় প্রত্যক্ষণের গুরুত্ব, ধারণা, ধারণার বৈশিষ্ট্যাবলী, শিক্ষায় ধারণার গুরুত্ব।

নবম অধ্যায় : শিখন

শিখনের সংজ্ঞা, ব্যবহারিক শিখনের বিভিন্ন পর্যায়, সংরক্ষণ প্রক্রিয়া, পুনরুদ্রেক প্রক্রিয়া, প্রত্যভিজ্ঞা, শিখনের সঙ্গে সম্পর্কিত উপাদানসমূহ, পরিণমন, পরিণমনের বৈশিষ্ট্যাবলী, পরিণমন, শিখন ও জীবনবিকাশ, অনুরাগ/আগ্রহ, অনুরাগের বৈশিষ্ট্যাবলী, শিক্ষায় শিশুর অনুরাগের প্রয়োজনীয়তা, মনোযোগ, মনোযোগের বৈশিষ্ট্যাবলী ও সংজ্ঞা, মনোযোগের নির্ধারক, শিক্ষায় মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা, মানসিক ক্ষমতাসমূহ।

শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তি

দশম অধ্যায় : ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকাশ

ভারতীয় শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা : বৈদিক শিক্ষা, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা, মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিক্ষা।

একাদশ অধ্যায় : জাতীয় উন্নয়নে সর্বজনীন সাক্ষরতা

ভারতে সর্বজনীন সাক্ষরতা কর্মসূচীর প্রকৃতি, সাক্ষরতার ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুরুত্ব, ভারতে সাক্ষরতা কর্মসূচী, সর্বজনীন সাক্ষরতার পথে বাধা।

দ্বাদশ অধ্যায় : পরিবেশগত শিক্ষা

পরিবেশ ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী, পরিবেশের উপাদান ও ব্যক্তিজীবনে তাদের গুরুত্ব, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব, সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব, শিক্ষা, পরিবেশ ও পরিবেশগত শিক্ষা।

শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

দ্বাদশ শ্রেণী

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষার লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তনশীলতা, শিক্ষার গতানুগতিক বিভিন্ন

লক্ষ্য, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যক্তি ও সমাজের গুরুত্ব, শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য, শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য, আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য : ব্যক্তিকল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ, শিক্ষার লক্ষ্য ও জাতির সামগ্রিক বিকাশ।

শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিখনের উপাদান মানসিক ক্ষমতা

স্পীয়ারম্যানের মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত মতবাদ, স্পীয়ারম্যানের পরীক্ষা, সাধারণ মানসিক ক্ষমতা, বিশেষ মানসিক ক্ষমতাবলী, থার্স্টোনের বহু উপাদানতত্ত্ব।

তৃতীয় অধ্যায় : শিখনকৌশল

বিভিন্ন ধরনের শিখনকৌশল, অনুবর্তন, প্রাচীন অনুবর্তন, প্যাভলভের পরীক্ষা, শিশুর শিখনে অনুবর্তন, অনুবর্তন কৌশলের বৈশিষ্ট্যাবলী, অপারেন্ট অনুবর্তন, স্কিনারের পরীক্ষা, অপারেন্ট অনুবর্তনের বৈশিষ্ট্যাবলী, প্যাভলভীয় প্রাচীন অনুবর্তন ও স্কিনারের অপারেন্ট অনুবর্তন-এর মধ্যে পার্থক্য, সমস্যা ও সমাধানমূলক শিখনকৌশল, শিখনের প্রচেষ্টা ভুলের কৌশল, থর্নডাইকের পরীক্ষা, প্রচেষ্টা ভুলের কৌশল, প্রচেষ্টা ভুলের কৌশলের বৈশিষ্ট্যাবলী, শিখনের বিভিন্ন কৌশল।

চতুর্থ অধ্যায় : রাশিবিজ্ঞান

রাশিবিজ্ঞান কী? তথ্যাবলীর বিন্যাসকরণ, মানের ক্রম হিসাবে স্কোরের বিন্যাসকরণ, পরিসংখ্যা বণ্টনের মাধ্যমে স্কোরের বিন্যাসকরণ, একক স্কোরভিত্তিক পরিসংখ্যা বন্টন গঠন, শ্রেণীবদ্ধ স্কোরভিত্তিক পরিসংখ্যা বণ্টন, রাশিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা।

পঞ্চম অধ্যায় : কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপসমূহ, পাটীগণিত গড়, অবিন্যস্ত রাশিমালার গড় নির্ণয়, বিন্যস্ত/শ্রেণীবদ্ধ রাশিমালার গড় নির্ণয়, মধ্যমমান বা মধ্যক, অবিন্যস্ত স্কোর, মধ্যমমান নির্ণয়ের পদ্ধতি, মোড বা ভূষিষ্টক।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লেখচিত্রে তথ্য পরিবেশন

পরিসংখ্যা বহুভূজ, হিস্টোগ্রাম।

শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

সপ্তম অধ্যায় : জীবন বিকাশের স্তর ও শিক্ষার পর্যায়

বিকাশের স্তর ও শিক্ষাস্তর, শৈশবকাল : শৈশবের বিকাশগত বৈশিষ্ট্যাবলী, শৈশবের শিক্ষা, বাল্যকাল : বাল্যের বিকাশগত বৈশিষ্ট্যাবলী, বাল্যের শিক্ষা, কৈশোরকাল : কৈশোরের বিকাশগত বৈশিষ্ট্যাবলী, কৈশোরের শিক্ষা, জীবন বিকাশের স্তর ও শিক্ষা।

অষ্টম অধ্যায় : সাধারণধর্মী ও বিশেষধর্মী শিক্ষা

সাধারণধর্মী শিক্ষা, সাধারণধর্মী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী, সাধারণধর্মী শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী, সাধারণধর্মী শিক্ষার পাঠ্যক্রম, সাধারণধর্মী শিক্ষার শিক্ষালয়, বিশেষধর্মী শিক্ষা, বিশেষধর্মীশিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী, বিশেষধর্মী শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিশেষধর্মী শিক্ষার পাঠ্যক্রম, বিশেষধর্মী শিক্ষার শিক্ষালয়, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, সাধারণ ও বিশেষধর্মী শিক্ষার পার্থক্য।

নবম অধ্যায় : বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা

দৈহিক ব্যতিক্রমী শিশুদের শ্রেণীবিভাগ, বিকলাঙ্গদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অন্ধ শিশুদের শিক্ষা, অন্ধদের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য, অন্ধদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম, অন্ধদের জন্য শিক্ষণ পদ্ধতি, আলোচনা : ভারতীয় পরিস্থিতি, মূক ও বধির শিশুদের শিক্ষা, মূক ও বধিরদের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য, মূক ও বধিরদের জন্য শিক্ষার পাঠ্যক্রম, মূক ও বধিরদের শিক্ষাদান পদ্ধতি, ভারতীয় পরিস্থিতি।

শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তি

দশম অধ্যায় : আধুনিক ভারতে শিক্ষার বিকাশ

ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা, ১৮৫৪-১৮৮২ পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিংশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষা, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী।

একাদশ অধ্যায় : স্বাধীন ভারতে শিক্ষা

ভারতীয় সংবিধানের শিক্ষা, সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারা, শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬), ১৯৬৪-৬৬ খ্রিস্টাব্দে কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী, কমিশন প্রস্তাবিত বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামো, প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর, প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর, জাতীয় শিক্ষানীতি, রামমূর্তী কমিটির মুখ্য সুপারিশ আলোচনা।

দ্বাদশ অধ্যায় : কম্পিউটার প্রযুক্তি

শিক্ষায় কম্পিউটার, কম্পিউটার সহযোগী শিখন, কম্পিউটার পরিচালিত শিক্ষা, শিখন ও শিক্ষণের কাজে কম্পিউটারের বহুমুখী প্রয়োগ, কম্পিউটারভিত্তিক শিক্ষার সাধারণ সুবিধা, কম্পিউটারভিত্তিক শিক্ষার অসুবিধা।

১.৪ সারাংশ (Summary)

- ব্যক্তিজীবন জৈবিক ও সামজিক সত্তা নিয়ে গঠিত।
- ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়াই হল শিক্ষা।
- ব্যক্তির অন্তর্নিহিত চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায় শিক্ষা।
- ১৯৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পশ্চিমবঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম শুরু করে।
- শিক্ষাদর্শন শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষামনোবিজ্ঞান, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষাপ্রশাসন, শিক্ষার ইতিহাস, শিক্ষা প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

১.৫ গ্রন্থপঞ্জি (References)

১। শিক্ষার দার্শনিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি— সুশীল রায় ও ড. সনৎ কুমার ঘোষ।

২। Theory and principles of education - J.C. Agarwal.

৩। Philosophical and Sociological Prespectives on Education -- J.C. Agrawal.

৪। Principles and practies of Education. - B.R. purkait.

৫। Philosophical bases of educations-- R.R. Rusk.

১.৬ প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

- শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
- শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি বলতে কী বোঝায়?
- শিক্ষার অর্থনৈতিক ভিত্তি বলতে কী বোঝায়?
- শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তি বলতে কী বোঝায়?
- শিক্ষাদর্শনের আলোচ্য বিষয়গুলি কী কী?
- উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

একক (Unit) - ২

শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসারী বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ
(Pedagogical analysis of Contents)

২.১ ভূমিকা (Introduction)

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.৩ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের কৌশল (Techniques of Pedagogical Analysis)

২.৪ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের নমুনা (Content Analysis)

২.৫ সারাংশ (Summary)

২.৬ প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী (References)

২.১ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষাবিজ্ঞানের পদ্ধতি শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার (Teaching learning Process) ক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসারী বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Pedagogical Analysis) একটি নূতন ও আধুনিক ধারণা। Pedagogy এবং analysis -এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে এটি গঠিত। 'Pedagogy' শব্দের অভিধানিক অর্থ 'শিক্ষাবিজ্ঞান' এবং 'analysis' শব্দের অর্থ 'বিশ্লেষণ' - অর্থাৎ 'pedagogical analysis' বলতে বিষয়বস্তুর শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণকেই বোঝায়। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যপূরণে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়াই হল এই বিশ্লেষণের অন্যতম কাজ। শুধু তাই নয়, এর অন্যতম কাজ হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে কাঙ্খিত আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে সুষম বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা। শিক্ষার্থীর মধ্যে কাঙ্খিত আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটানো। এই পরিবর্তন যে ধরনেরই হোক না কেন, তার গতি, প্রকৃতি ও পরিমাপ শিক্ষককে তাঁর পথ নির্ধারণে সহায়তা করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ধারা লক্ষ করেন, তার পরবর্তী পাঠের পরিকল্পনা রচনা করেন প্রয়োজনে তার শিক্ষণ পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস করে থাকেন। আর এর সঙ্গে যুক্ত থাকে উপযুক্ত মূল্যায়ন কৌশল। তাই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত মূল্যায়নকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পরবর্তীকালে তার উপর ভিত্তি করে শিক্ষণব্যবস্থা পরিচালিত করতে হবে। শিক্ষাপ্রয়াসের সার্থকতা, কার্যকারিতা ও পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই পঠন-পাঠন বা শ্রেণী শিক্ষণের ফলে শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণের পরিবর্তনটুকু যাচাই করা যায়। মূল্যায়নের ফলাফল শিক্ষার্থীদের জীবনে সামগ্রিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

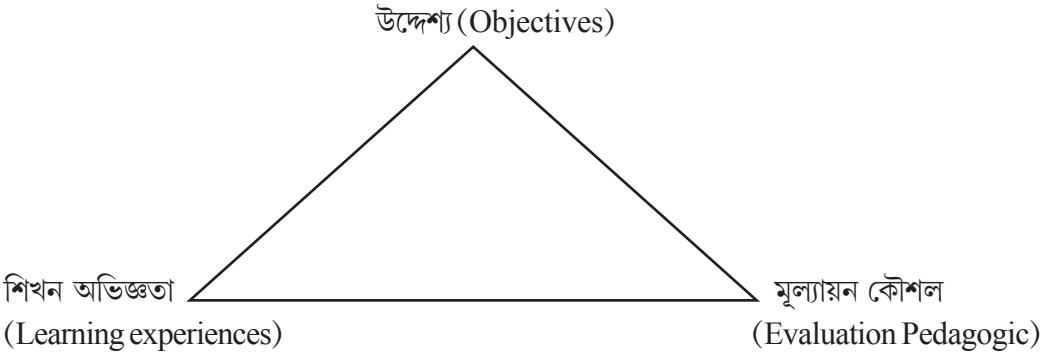

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

❖ **সাধারণ উদ্দেশ্য (General Objectives)**

ক) শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসারী বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায় তা জানা।

খ) কীভাবে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করতে হয় তা জানা।

গ) নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ করা।

ঘ) একক অভীক্ষা পত্রের গঠন প্রণালী জানা।

❖ **শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসারী বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য (Objectives of Pedagogical analysis)**

- পাঠ্যবস্তুর প্রতিটি উপাদানকে শিক্ষার্থীর কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া।
- শিখন-শিক্ষণ পরিবেশকে আনন্দমুখর করে তোলা।
- শিক্ষার্থীকে শিখনে উদ্দীপিত করা।
- শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী ও আগ্রহী করে তোলা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটানো।
- শিক্ষার্থীদেরকে স্ব-শিখনে উদ্দীপিত করা।
- শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিতি ঘটানো।
- সর্বোপরি UNESCO নির্দেশিত শিক্ষার উদ্দেশ্য
  - * জানার জন্য শিক্ষা (Learning to Know)
  - * কাজ করার জন্য শিক্ষা (Learning to do)
  - * যুতবদ্ধতার শিক্ষা (Learning to live together)
  - * মানুষ হওয়ার শিক্ষা (Learning to be)

    -এগুলিকে বাস্তবায়িত করা ও পরিপূর্ণতা দেওয়া।

২.৩ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের কৌশল (Techniques of Pedagogical analysis)

আমরা নির্দিষ্ট রীতি মেনে শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করে থাকি যা নীচে উল্লেখ করা হলো -

প্রথমত - এককের নাম (Name of the Unit) :

বিষয়বস্তুর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের প্রথম ধাপ হল পাঠ্য বিষয় নির্বাচন। অর্থাৎ যে অধ্যায়টা পড়ানো হবে তার নাম (শিরোনাম)। শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণের জন্য শিক্ষার সংজ্ঞা, শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী শিক্ষার বিভিন্ন রূপ, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা মনোবিদ্যা, শিখন, জীবন বিকাশের স্তর, শিক্ষার পর্যায়, স্বাধীন ভারতের শিক্ষা, শিক্ষায় কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রভৃতি যেকোনো বিষয় একক হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে। বিষয় নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী নির্বাচনও করা হয়।

দ্বিতীয়ত - উপএকক নির্ধারণ (Determination of subunit) :

একক নির্বাচনের পর সেটিকে যেভাবে দৈনন্দিন শ্রেণীতে পড়ানো হবে সেই অনুযায়ী এক একটি এককের বিষয়বস্তুকে ভাগ করা হয় যাকে উপএকক (Subunit) বলা হয়। উপএককে ভাগ করার সময় মোট পিরিয়ডের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। এককের বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী একে আমরা আবার এক বা একাধিক উপএককে ভাগ করতে পারি। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য এক বা একাধিক উপএকক বা সমগ্র এককেকেও গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত - বিষয়বস্তুর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা (Brief summary of Concepts) :

এই স্তরে শ্রেণীপাঠের জন্য নির্ধারিত একক বা উপএককের মূলধারণাকে সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করা হয়। অর্থাৎ যে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার সারাংশ এখানে বর্ণিত হবে। নির্ধারিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে চার-পাঁচটি মূলসূত্রকে বেছে নিয়ে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হবে।

চতুর্থত - পূর্বতন জ্ঞান (Previous Knowledge) :

শুধুমাত্র বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ নয়, যেকোনো বিষয়বস্তু আলোচনার আগে শিক্ষার্থীদের বর্তমান মানসিক অবস্থা যাচাই করা বিশেষ প্রয়োজন। নির্বাচিত বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান কতটুকু আছে সে বিষয়ে শিক্ষকের যথাযথ ধারণা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। তাই শিক্ষক এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পূর্বার্জিত শিখনের দিকগুলিকে চিহ্নিত করবেন বা জেনে নেবেন।

পঞ্চমত - উদ্দেশ্য ঠিক করা (Determination of Objectives) :

শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্তু প্রণালীবদ্ধ (Systematic) ও পরিকল্পিতভাবে উপস্থাপন করা হয় যা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণও বটে। শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত আচরণ পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য ঠিক করতে হয়। কোনো বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সাপেক্ষে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যগুলি নির্দিষ্টক্রমে সাজাতে হয় তবেই আচরণমূলক উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে পৌঁছানো যায়। অর্থাৎ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য এবং আচরণমূলক উদ্দেশ্য পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এই উদ্দেশ্যগুলি ঠিক করতে গেলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের

প্রতি নজর দিতে হয় -

(১) বিষয় অনুযায়ী (যেমন - ভাষা, বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি) নির্দেশদানের উদ্দেশ্যগুলিকে ঠিক করতে হয়।

(২) শিক্ষার্থীর বয়স, পরিণমন, সক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক আচরণগুলিকে স্মরণে রাখতে হয়।

(৩) শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত আচরণ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষণ পদ্ধতি, কৌশল প্রভৃতি শর্তগুলি নির্দিষ্ট করতে হয়।

(৪) সময় যেকোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তাই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যকে (task) সম্পাদন করার উপর জোর দিতে হবে।

(৫) এই জাতীয় উদ্দেশ্য স্থির করার ক্ষেত্রে বর্তমানে অধিক প্রচলিত ও কার্যকরী 'Bloom's taxonomy' অনুযায়ী প্রজ্ঞামূলক (Cognitive) অনুভূতিমূলক (affective) এবং মনোসঞ্চালনমূলক (Psychomotor)-এই তিনটি এলাকা বা মাত্রার (domain) প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

(৬) প্রত্যেক নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যকে সরাসরি পাঠ এককের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা উচিত।

(৭) শ্রেণী শিক্ষণের শেষে এই সকল উদ্দেশ্যগুলি যাতে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা যায় সে দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া দরকার।

'Bloom's taxonomy' অনুযায়ী নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের (Instructional objective) শ্রেণীবিভাজনটি দেখানো হল -

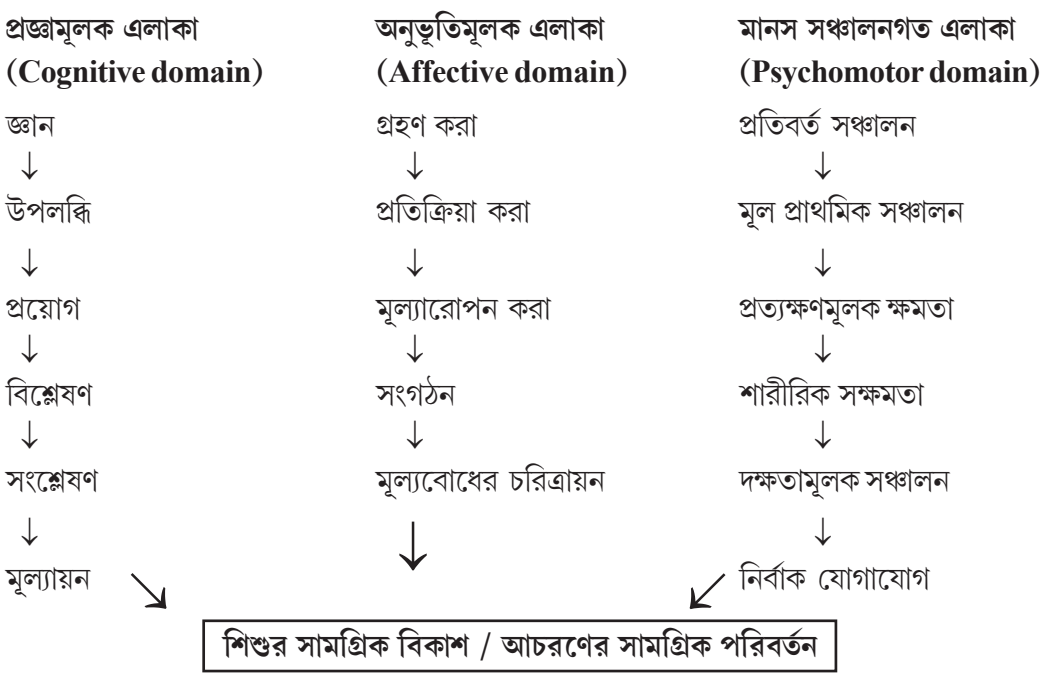

পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ণয় ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীবিন্যাসকেই ব্যবহার করা হয়।

ষষ্ঠত - শিক্ষণ বা নির্দেশনার কৌশল নির্ণয় (Selection of teaching or Instructional Strategy) :

বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শিক্ষণকৌশল নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। পাঠদানকে আরো সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য শিক্ষণ পদ্ধতি কী হবে, কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হবে এই স্তরে সেগুলি নির্দিষ্ট করা হয় যেমন—

- **পদ্ধতি (Teaching method) :**

বক্তৃতা, আলোচনা, প্রতিপাদন, সমস্যা সমাধান, প্রোজেক্ট বা আবিষ্কার এইসব পদ্ধতির কোনগুলি এই নির্ধারিত পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে তা নির্দিষ্ট করা।

- **শিক্ষণ কৌশল (Teaching Technique) :**

পাঠদানের সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ বা সরঞ্জাম (যেমন, চার্ট, ম্যাপ, প্রোজেক্টর, মডেল, বোর্ডের ব্যবহার বা কোনো সফটওয়্যারের ব্যবহার প্রভৃতি) কী কী ব্যবহার করা হবে তা নির্দিষ্ট করা।

- **অনুসন্ধানী প্রশ্ন (Probing questions) :**

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকে আকর্ষণীয় করার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানোর প্রয়োজন। সেইসঙ্গে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা তৈরী করাও প্রয়োজন। আর এই লক্ষপূরণের জন্য শিক্ষক তিন বা চারটি অনুসন্ধানী ও কৌতূহল উদ্দীপক প্রশ্ন করবেন এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরও লিখে দেবেন। পরবর্তীকালে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে কিছু উদাহরণও দিতে পারেন।

- **কাজের পাতা (Work sheet) :**

কাজের পাতা সংযুক্তিকরণ শিক্ষণ কৌশল স্থির করার ক্ষেত্রে একটি আধুনিক ধারণা। কাজের পাতায় শিক্ষার্থীদের কিছু ছোট ছোট কাজ দেওয়া হয়, যেগুলি শিক্ষকের শিক্ষাদানের অগ্রগতি যাচাইয়ে সাহায্য করে। কাজের পাতা মূলত পাঠ উপস্থাপন পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়। এগুলি বিকাশধর্মী প্রশ্ন। কিছু অপ্রচলিত শব্দ, বিভিন্ন শব্দের মধ্যে মিল অমিল খুজে বের করা, এলোমেলোভাবে থাকা শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন, শূন্যস্থান পূরণ করা। বিভিন্ন বাক্যকে ঘটনাপ্রবাহ অনুযায়ী সাজানো প্রভৃতি কাজ (task) সংগঠিত হয়। আর এইসব কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়।

সপ্তম - মূল ধারণা / বিষয়বস্তুর আলোচনায় বিভিন্ন উদাহরণ (Examples to illustrate concepts/ Content) :

বিষয়বস্তুকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে যেসব বিশেষ শব্দ (term), উদাহরণ, উদ্ধৃতি, গল্প, কোনো ছোট কাহিনি প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এই স্তরে। এই ধরনের তিন চারটি উদ্ধৃতি বা উদাহরণের ব্যবহার অন্তত এখানে দেখানো প্রয়োজন।

অষ্টমত - একক অভীক্ষা পত্রের খসড়া (Table of specification) :

শিক্ষা পরিকল্পনার শেষ ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হল মূল্যায়ন (Evaluation)। পরিকল্পিত পঠন-পাঠনের পর শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত আচার-আচরণের পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে তা পরিমাপ করার কাজটিকেই শিক্ষাবিজ্ঞানে মূল্যায়ন নামে অভিহিত করা হয়। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন শিখন-শিক্ষণের প্রতি স্তরে শিক্ষার্থীর ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যবস্থার দিকনির্দেশ করে এবং শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা অর্জনের মানকে উন্নত করতে সাহায্য করে। এর মধ্য দিয়ে সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনারও মূল্যায়ন হয়ে থাকে। বিষয় বিশ্লেষণের এই স্তরে একক অভীক্ষাপত্র তৈরী করা হয়। প্রথমে তার একটি খসড়া পরিকল্পনা বা দিকনির্দেশক সারণী (Table of specification) তৈরী করা হয়। এই অভীক্ষাপত্রে পাঠের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন জাতীয় প্রশ্ন (Bloom's taxonomy অনুযায়ী) কটা, এবং তার মান কত হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা থাকে। পরিশেষ এই খসড়া অনুযায়ী একটি আদর্শ প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়। যেখানে প্রশ্ন সংখ্যা, সময় ও প্রতিটি প্রশ্নের মান নির্দিষ্ট করা হয়।

২.৪ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের নমুনা (Content Analysis)

২.৪ ক. বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) : **নমুনা - ১**

একক (Unit) : **বিধিমুক্ত শিক্ষা** (Non-formal education) : **শ্রেণী - একাদশ**

উপএকক (Subunits) : (১) সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য পিরিয়ড সংখ্যা - **1 + 2 + 2 + 1 = 6**

(২) দূরাগত শিক্ষা

(৩) মুক্ত শিক্ষা

(৪) বিভিন্ন ধরনের বিধিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

উপ এককের বিশ্লেষণ (Analysis of Subunits) :

দূরাগত শিক্ষা (Distance education) :

বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা (Brief Summary of Concepts or matter) :

সংজ্ঞা : শ্রেণীকক্ষে, বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ, বিষয়বস্তু উপস্থাপন, শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ সঞ্চার, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজের জন্য শিক্ষক যে কৌশলগুলি ব্যবহার করেন তাদের সমবায়ই সাধারণ অর্থে শিক্ষণ। এই কৌশলগুলিই শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা অর্জনে বা শিখনে সহায়তা করে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক এই কৌশলগুলি শ্রেণীকক্ষের গণ্ডির মধ্যে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে বর্তমানে প্রয়োগ করতে পারেন। শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, শিক্ষণ সংক্রান্ত এই কৌশলগুলি শিক্ষকের অনুপস্থিতিতেও শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দিলে তার শিখন প্রচেষ্টা কার্যকরী হতে পারে। শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষক বা নির্দেশকের

প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়াই যখন শিক্ষণ কৌশলগুলির প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় দূরাগত শিক্ষা (Distance Education)।

দূরাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষ থাকে না। স্ব-শিখনে (Self- learning) সহায়ক।

(২) এই জাতীয় শিক্ষণ ব্যক্তিগতভাবে হয় আবার দলগত হয়।

(৩) এই শিক্ষণ আংশিক সময়ের জন্য ঘটে।

(৪) এই শিক্ষায় পড়াশুনার খরচ তুলনামূলক কম।

(৫) এই শিক্ষায় পাঠ্যক্রম জীবনকেন্দ্রিক হয়।

(৬) এই শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সংগঠন মূল্যায়ন এবং ঐ পাঠন নমনীয় হয়।

(৭) যারা কোনো কারণে গতানুগতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে না বা গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে থাকে তাদের কাছে এই শিক্ষা খুবই কার্যকরী। এই শিক্ষা হল দূরাগত শিক্ষার সরলরূপ। এখানে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার বিষয়গুলি ছোট ছোট মডিউল আকারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, শিক্ষার্থীরা নিজেরাই পড়াশুনা করে। শিক্ষার্থীর নিকটবর্তী কোন প্রতিষ্ঠানে ক্লাশের ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র ডাকযোগের ওপর নির্ভরশীল নয়, বিভিন্ন বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের মাধ্যমেও শিক্ষালাভ করে। এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।

উপযোগিতা :

(১) সবার জন্য এই শিক্ষা।

(২) এই শিক্ষায় আর্থিক সুবিধা বেশী।

(৩) এই শিক্ষায় মেধার পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে।

(৪) মানব সম্পদের অপচয় রোধ করা যায়।

পূর্বজ্ঞান (Previous Knowledge/Learning) :

পূর্বজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করা হবে -

(১) শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?

(২) শিক্ষায় দুটি সংস্থার নাম বল।

(৩) প্রথাগত শিক্ষা কাকে বলে?

(৪) প্রথাগত শিক্ষার বাইরে শিক্ষার সুযোগ ঘটে এরূপ দুটি ক্ষেত্রের নাম বল।

উদ্দেশ্য (Objectives) :

জ্ঞানমূলক : (১) প্রথামুক্ত শিক্ষার সংজ্ঞা জানা।

(২) দূরাগত শিক্ষার সংজ্ঞা জানা।

(৩) দূরাগত শিক্ষার বিভিন্ন রূপকে চিহ্নিত করতে পারা।

(৪) মুক্ত শিক্ষা বলতে কী বোঝায় তা জানা।

বোধমূলক : (১) এই শিক্ষার বিভিন্ন রূপগুলি জেনে তাদের পার্থক্য করতে পারবে।

(২) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সঙ্গে এই শিক্ষার পার্থক্য করতে পারবে।

(৩) সমাজ উন্নয়নে এই শিক্ষার তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক : (১) সর্বশিক্ষা অভিযানে এই শিক্ষা কীভাবে প্রযুক্ত হতে পারে তা বলতে পারবে।

(২) গণশিক্ষায় দূরাগত শিক্ষাকে কীভাবে যুক্ত করা যায় তা জানবে।

দক্ষতামূলক : দূরাগত শিক্ষার পরিকাঠামোগত রূপের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করতে পারা।

শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies)

শিক্ষণ পদ্ধতি (Broad method of teaching) :

বক্তৃতা পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞানমূলক বিষয়গুলি বলা হবে। আলোচনা পদ্ধতির দ্বারা এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হবে। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সঙ্গে এই শিক্ষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি খুঁজে বের করার সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি বা প্রশ্ন উত্তরের কৌশল গ্রহণ করা হবে।

বোর্ডের ব্যবহার (Use of chalk and Board) :

এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডে লেখা হবে।

অনুসন্ধানী প্রশ্ন ও উত্তর (Probing Questions with Answers) :

প্রশ্ন : (১) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও দূরাগত শিক্ষার মধ্যে মূল পার্থক্যগুলি কী কী?

উত্তর : (১) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত হাজির থাকতে হয়। দূরাগত শিক্ষায় এই ব্যবস্থা থাকে না।

(২) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় পাঠ্যক্রম অনমনীয় হয়, বাঁধাধরা পাঠপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দূরাগত শিক্ষায় পাঠ্যক্রম নমনীয় হয়, পাঠপদ্ধতি শিক্ষার্থীর অভীজ্ঞতাভিত্তিক হয়।

(৩) বিধিবদ্ধ শিক্ষায় পঠন-পাঠনের সময় নির্দিষ্ট থাকে, দূরাগত শিক্ষায় মূলত ছুটির দিনগুলিকেই পঠন-পাঠনের সময় হিসাবে নির্দিষ্ট হয়।

(৪) এই শিক্ষায় খরচ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা অপেক্ষা কম।

প্রশ্ন : (২) সর্বশিক্ষা অভিযানকে সফল করতে দূরাগত শিক্ষা কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর : সর্বশিক্ষা অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। যেসব শিক্ষার্থী উপযুক্ত সময়ে বিভিন্ন কারণে প্রথাগত শিক্ষা লাভ করতে পারেনি বা শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেনি তাদের কাছে দূরাগত শিক্ষা আশীর্বাদ স্বরূপ।

কাজের পাতা (Work Sheet)

শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত চার্টগুলি পূরণ করতে বলা হবে।

ক.

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও দূরাগত শিক্ষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য	
সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

খ.

	সুবিধা	অসুবিধা
দূরাগত শিক্ষা		

বৈশিষ্ট্যভিত্তিক অভীক্ষা (CRITERION REFERENCED TEST)
একক অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Table of specifications : Objectives, Content)

বিষয় (Content)	উদ্দেশ্য (Objectives)				
	জ্ঞান (Knowledge) 20%	বোধ (Understanding) 40%	প্রয়োগ (Application) 20%	মানস সঞ্চালন (Psychomotor) 20%	Total 100%
1. সংজ্ঞা	2(10%)	-	-	-	10%
2. চিহ্নিতকরণ	2(10%)	-	-	-	10%
3. পার্থক্য	-	2(10%)	-	-	10%
4. বৈশিষ্ট্য	-	2(10%)	-	-	10%

5. সীমাবদ্ধ	-	2(10%)	-	-	10%
6. প্রয়োগ	-	-	4(20%)	-	20%
7. সুবিধা	-	2(10%)	-	-	10%
8. রেখাচিত্র	-	-	-	4(20%)	20%
100%	**20%**	**40%**	**20%**	**20%**	**100%**

Test Items : **Full marks - 20**

(১) দূরাগত শিক্ষার সংজ্ঞা দাও। (২)

(২) দূরাগত শিক্ষার বিভিন্ন রূপগুলির (Form) নাম লেখ। (২)

(৩) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার সঙ্গে দূরাগত শিক্ষার দুটি পার্থক্য লেখ। (২)

(৪) দূরাগত শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। (২)

(৫) দূরাগত শিক্ষার দুটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর। (২)

(৬) সর্বশিক্ষায় সাফল্য আনতে দূরাগত শিক্ষাকে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। (৪)

(৭) দূরাগত শিক্ষার দুটি সুবিধা উল্লেখ কর। (২)

(৮) দূরাগত শিক্ষার পরিকাঠামোগত দিকের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন কর। (৪)

২.৪ খ. বিষয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) : নমুনা - ২

একক (Unit) : শিখন (Learning) **Class - একাদশ**

উপএকক (Subunits) : **No. of Periods.**

১। শিখনের সংজ্ঞা ১

২। শিখনের বিভিন্ন পর্যায় ২

৩। শিখন সম্পর্কিত উপাদান ৪

উপএককের বিশ্লেষণ (Analysis of Subunits)

(ক) বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা (Brief Summary of concepts or matter) :

মনোবৈজ্ঞানিক এবং ব্যবহারিক উভয়দিক থেকেই ব্যক্তির শিখন, তার পূর্বঅভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেকোনো শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী বা ব্যক্তি তার পূর্বে জানা বা অর্জিত কোনো অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের মাধ্যমেই নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অর্থাৎ, অতীত অভিজ্ঞতা বা পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা ছাড়া শিখন হয় না। শিক্ষাগত দিক থেকে, শিখনের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। শিখনই শিখনের শর্ত (Learning is itself condition of learning)। সুতরাং, শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন। এছাড়া, সংরক্ষিত শিখন-অভিজ্ঞতা যদি সঠিকভাবে শিক্ষার্থীরা জীবনের পরবর্তী কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে না পারে,

তাহলে শিক্ষার কোনো সামাজিক উপযোগিতাই থাকে না। অর্থাৎ, শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলির প্রয়োজনমতো পুনরুত্থান (Reproduction) করার দরকার। অভিজ্ঞতার এই পুনরুত্থান না হলে, পরবর্তী পর্যায়ে শিখনও হবে না। সুতরাং প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবহারিক দিকে শিখন (Learning), সংরক্ষণ (Retention) এবং পুনরুত্থান (Reproduction) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখা দরকার, শিখনের জন্য অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুত্থাপন দুভাবে হয়ে থাকে। একটিকে বলা হয়, পুনরুদ্রেক (Recall) এবং অপরটিকে বলা হয় প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)।

(খ) পূর্ব অভিজ্ঞতা (Previous learning) :

Knowledge : শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের সংজ্ঞা ও ধারণা; বৃদ্ধি, বিকাশ ও পরিণমনের ধারণা সংক্রান্ত জ্ঞান থাকবে।

(গ) উদ্দেশ্য (Objectives) :

১। **জ্ঞানমূলক (Knowledge)**

(১) শিখনে ধারণ কাকে বলে বলতে পারবে।
(২) শিখনে পুনরুদ্রেক বলতে কী বোঝায় বলতে পারবে।
(৩) শিক্ষার্থীরা প্রত্যভিজ্ঞা কী জানতে পারবে।

২। **বোধমূলক (Comprehension)**

(১) শিখনে ধারণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে।
(২) শিখনে পুনরুদ্রেক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
(৩) শিখনে ধারণ ক্রিয়ার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে।

৩। **প্রয়োগমূলক (Application)**

(১) প্রত্যভিজ্ঞা কীভাবে শিখনে সাহায্য করে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।
(২) শিক্ষার্থীরা পুনরুদ্রেক ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারবে।

৪। **Other (Analysis)**

শিক্ষার্থীরা শিখনের বিভিন্ন পর্যায়কে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে। দক্ষতামূলক (Psychomotor) শিখনের লেখচিত্রকে (learning curve) সঠিকভাবে আঁকতে পারবে।

(ঘ) **শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies) :**

➢ **শিক্ষণ পদ্ধতি (Broad method of teaching)**

* এই অংশটি পাঠদান করার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করবেন—

(১) বক্তৃতামূলক পদ্ধতি ;

(২) আলোচনা পদ্ধতি ;

(৩) পরীক্ষণ পদ্ধতি ;

➢ **শিক্ষণ প্রদীপন (Teaching learning materials)**

শিক্ষণ প্রদীপন ছাড়া প্রশ্ন উত্তর, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, উদাহরণ, আরোহী অবরোহী প্রভৃতি কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন।

* শিক্ষক এই অংশটি পড়ানোর সময় শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী হিসাবে পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠটীকা প্রস্তুত করতে পারেন। এছাড়াও OHP Sheet-এ লিখে এনে OHP ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন।

➢ **ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার (Use of Black Board)**

* শিক্ষক এই অংশটি পড়ানোর জন্য শিক্ষণ-সহায়ক প্রদীপন হিসাবে চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, OHP, LCD Projector প্রভৃতি প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারবেন।

➢ **অনুসন্ধানী প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তর (Probing Questions with brief answers)**

শিক্ষকের প্রশ্ন	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য উত্তর
১। শিখন প্রক্রিয়ার ধারণ প্রক্রিয়াকে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?	১। শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল ধারণ বা Retention। কোনো কিছু শেখার পর তাকে যদি মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করে রাখতে না পারে তবে তা পুনরুৎপাদন হবে না বা প্রয়োজনে সেই শিখনকে কাজে লাগাতে পারবে না। যেমন, শিখন প্রক্রিয়ার চারটি স্তর রয়েছে, এটা শেখার পর যদি সে ধারণ করে রাখতে না পারে, তবে তার পক্ষে ঐ চারটি স্তর সম্পর্কে কখোনই বলা সম্ভব হবে না। শিখনও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই শিখন প্রক্রিয়ার ধারণ প্রক্রিয়ায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
২। পুনরুদ্রেক ও প্রত্যভিজ্ঞা পরস্পরের পরিপূরক কিনা ব্যাখ্যা কর।	২। যখন কোন বিষয় পুনরুদ্রেক করতে অসুবিধা হয়, তখন যদি সেই বিষয়গুলির কিছু নমুনা বা সূত্র (Clue) উপস্থাপন করা হয়, তাহলে সহজে আমাদের পুনরুদ্রেক করতে সুবিধা হয়। যেমন মহাবিদ্রোহ কত সালে হয়েছিল— (১৯৫৭, ১৮৫৭, ১৭৫৭)-এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর

	দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা সহজেই সঠিক উত্তরটিকে চিনতে পারবে। অর্থাৎ এটাকে দিয়ে বলা যায়, পুনরুদ্রেক ও প্রত্যভিজ্ঞা পরস্পরের পরিপূরক।
৩। শিখন ও ধারণ ক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কী?	শিখন ভালো হলে ধারণ ভালো হবে, আর ধারণ ভালো হলে, পুনরুৎপাদন ভালো হবে; শিখনও সার্থক হবে। তাই শিখন ও ধারণ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

➢ **উদাহরণ (Examples with content illustration)**

বিষয়বস্তু	উদাহরণ
(১) ধারণ ক্রিয়া (Retention)	কোনো শেখা বিষয়বস্তুকে কিছুদিন পরে বলতে পারা বা চেতনায় নিয়ে আসা। যেমন, একজন আচরণবাদী মনোবিদের নাম হল Watson. কিছুদিন পরে শিক্ষার্থীদের আবার তা মনে করার পিছনে যে মানসিক ক্রিয়া কাজ করে, তাই হল ধারণ ক্রিয়া। শেখা এবং ভুলে যাওয়ার অন্তরফল হল ধারণ।
(২) পুনরুদ্রেক (Recall)	সময়ের ব্যবধানে কোনো শেখা বিষয়কে বা সঠিকভাবে বলতে পারা বা পুনরায় একইভাবে বলতে পারাই হল পুনরুদ্রেক। যেমন, নিউটনের কোনো সূত্র মুখস্থ করার কিছুদিন পর পুনরায় স্মরণে আনতে পারলে যা আবার মুখস্থ বলতে পারলে এর পিছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করল, তাই হল পুনরুদ্রেক।
(৩) প্রত্যভিজ্ঞ (Recognition)	কোন কিছু দেখে চিনতে পারা, ছবি দেখে, মানুষ দেখে ইত্যাদি যেমন, অনেকদিন পরে পুরানো কোনো বন্ধুর গলার স্বর বা ছবি ইত্যাদি দেখে তাকে আমরা চিনতে পারি। এই ধরনের ঘটনার পিছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে, তাই হল প্রত্যভিজ্ঞা।

ঙ. বৈশিষ্ট্যভিত্তিক অভীক্ষা (Criterion Referenced Test)

(Based on objectives cited before)

একক অভীক্ষাপত্রের খসড়া

(Table of specifications : Objectives, Content)

Blueprint of CRT

(A) Design of a CRT

1: Weightage to Content

Sub-Unit : 1 Marks = 5 Percent : 100

II : Weightage to objectives

Objectives	Marks	Percent
জ্ঞান Knowledge (K)	1	20
বোধ Understanding (U)	2	40
প্রয়োগ Application (A)	2	20
দক্ষতা Psychomotor (S)	1	20
TOTAL	**5**	**100**

III : Weightage to forms of questions

Form	Marks	No. of questions	Percent
Objective Type (O)	$1\frac{1}{2}$	3	40
Multiple Choice (MC)	$1\frac{1}{2}$	2	20
True / False (T/F)	$1\frac{1}{2}$	3	30
Fill in the blanks (F.B)	$\frac{1}{2}$	1	10
Total	**5**	**9**	**100**

(B) Blueprint of a CRT

Objectives	K				U				A				S				
Forms	O	MC.	T/F	FB	O	MC.	T/F	FB	O	MC.	T/F	FB	O	MC.	T/F	FB	Total
of	$\frac{1}{2}$	-	-	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	-	$\frac{1}{2}$	-	$\frac{1}{2}$	-	–	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	–	5
questions	(1)			(1)	(1)	(1)	(1)		(1)		(1)			(1)	(1)		(9)

Note : The numbers within brackets indicate the number of questions asked and the numbers outside brackets indicate marks.

চ. অভীক্ষাপত্র (Test Items) **Full Marks - 10**

(১) যখন কোনো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অংশটি বারবার অনুশীলন করে শেখা হয় তখন তাকে বলে অবিরাম পদ্ধতি - ঠিক না ভুল। ১

(২) শিখনের বিভিন্ন পর্যায়গুলির মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়টি কী? ১

(৩) শিখনই _____ শর্ত (শূন্যস্থান পূরণ করো)। ১

(৪) সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বা ধারণ ক্রিয়া হল একটি - (ক) সামাজিক প্রক্রিয়া, (খ) মানসিক প্রক্রিয়া, (গ) দৈহিক প্রক্রিয়া, (ঘ) বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া। ১

(৫) সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্য উল্লেখ কর। ২

(৬) শিখনের সামগ্রিক পদ্ধতি, আংশিক পদ্ধতির তুলনায় 'ভালো' - উক্তিটি সত্য না মিথ্যা। ১

(৭) কোনো একজন ব্যক্তিকে রাস্তায় দেখে, তাকে ছোটোবেলার বন্ধু হিসাবে চিনতে পারা এটি কোন শিখন পর্যায়ে ঘটে থাকে। ১

(৮) শিখনের লেখচিত্রের গতি সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী হয় উক্তিটি সত্য না মিথ্যা। ১

(৯) শিখনের লেখচিত্র হল শিখনের অগ্রগতির হার / ভুলে যাওয়ার হার / ধারণ ক্ষমতার হার / অনুশীলনের হার। ১

২.৫ সারাংশ (Summary)

❖ 'Pedagogy' শব্দের অভিধানিক অর্থ 'শিক্ষাবিজ্ঞান' এবং 'analysis' শব্দের অর্থ 'বিশ্লেষণ' - অর্থাৎ 'pedagogical analysis' বলতে বিষয়বস্তুর শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণকেই বোঝায়। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যপূরণে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে

দেওয়াই হল এই বিশ্লেষণের অন্যতম কাজ। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থীর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে সুষম বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

❖ UNESCO নির্দেশিত শিক্ষার উদ্দেশ্য

* জানার জন্য শিক্ষা (Larning to know)
* কাজ করার জন্য শিক্ষা (Larning to do)
* যুতবদ্ধতার শিক্ষা (Larning to live together)
* মানুষ হওয়ার শিক্ষা (Larning to be)

-এগুলিকে বাস্তবায়িত করা ও পরিপূর্ণতা দেওয়া।

২.৬ প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

(ক) বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়? কীভাবে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করতে হয় তা আলোচনা করুন।

(খ) একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীর কোনো একটি পাঠ্যবিষয়কে নিয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মতভাবে তার বিশ্লেষণ করুন।

(গ) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করুন।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জিকা (References)

1. "pedagogy noun - definition in British English Dictionary & Thesaurus - Cambridge Dictionary Online".
2. "Analysis of Pedagogy". Educ. utas.edu.au.
3. Petrie et al. (2009). Pedagogy - a holistic, personal approach to work with children and young people, across services.
4. " pedagogy". *Online Etymology Dictionary.*
5. Montessori, M. (1910). *Antropologia Pedagogica.*
6. Bruner, J.S., (1966). Toward a theory of Instruction. Cambridge, MA: Belkapp Press.

Group - B

একক - ৩

শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রকৃতি

* শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি (Nature and Scope of Education)
* শিক্ষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Education)
* শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক (Relation between Education and other subjects)

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.৩ শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ (Origin of the word 'Education' & Meaning)

৩.৪ শিক্ষা ও শিক্ষাবিজ্ঞান (Education and Science of Education)

৩.৫ আধুনিক শিক্ষার স্বরূপ (Nature of modern Education)

৩.৬ শিক্ষার পরিধি (Scope of Education)

৩.৭ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Education)

৩.৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক (Relation Between Education & Other Subjects)

৩.৯ সারাংশ (Summary)

৩.১০ প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি (References)

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

'শিক্ষা' শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তি তার দ্বারা কী বোঝাতে চাইছেন, সে বিষয়ে সচেতন হলেও তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সমভাবে সকল ব্যক্তি গ্রহণ করেন না। এর কারণ 'শিক্ষা' শব্দটির দ্বারা এমন কিছুকে ইঙ্গিত করা হয়, যা সত্য সত্যই বিমূর্ত (Abstract)। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, চিন্তবিদ এবং দার্শনিক, বিভিন্ন যুগে, এই শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে এবং নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের আলোচনার ধারা বিশ্লেষণ করলে, মতপার্থক্যই থেকে 'শিক্ষা' শব্দের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে দুটি ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। **প্রথমত,** 'শিক্ষা' শব্দটি সাধারণ কথোপকথনের বহুল ব্যবহৃত হলেও, সেটি বিমূর্ত অর্থবহ। তাই বিচার বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। **দ্বিতীয়ত,** 'শিক্ষা' সম্পর্কিত

ধারণা গতিধর্মী বা গতীয় (Dynamic)। সমাজজীবনের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে এই ধারণা মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল। মনুষ্যসমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজ প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে, এই 'শিক্ষা' সম্পর্কিত ধারণারও বিবর্তন ঘটেছে, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে। তাই বিভিন্ন যুগের মনীষীদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা মূলত তাঁদের জীবনাদর্শের বা সমকালীন সার্বিক সমাজাদর্শের পার্থক্যের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজ বিবর্তনের এই প্রবাহ বর্তমানে এসে থেমে যায়নি। মানুষের সমাজাদর্শ এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনাদর্শ অবিচ্ছিন্ন গতিতে এক অচিহ্নিত দিকে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাই সামাজিকসত্তা গতিধর্মী হওয়ায়, শিক্ষাও গতীয় ধর্মসম্পন্ন হয়ে তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। সভ্যতা বিকাশের আদিমযুগে 'শিক্ষা' সম্পর্কিত যে ধারণা (Concept of Education) তৎকালীন মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই শিক্ষার ধারণার উপর নির্ভর করে, বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর মানুষের জটিল জীবন পরিস্থিতি উদ্ভূত জটিলতর চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। তাই আধুনিক তাৎপর্যে, শিক্ষাকে এমন এক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যা সতত পরিবর্তনশীল সমাজে প্রত্যেকটি বিকাশশীল মানুষের বহুমুখী চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

ক) শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানা।

খ) শিক্ষার সংজ্ঞা জানা।

গ) শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করা।

ঘ) শিক্ষাবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

ঙ) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে চিহ্নিত করা।

চ) শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক উপলব্ধি করা।

৩.৩ শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ (Origin of the word 'Education' & Meaning)

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত 'শিক্ষা' শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায়, এই শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'শাস'-ধাতু থেকে। এর বহুবিধ অর্থ হল - 'শাসন করা', 'শৃঙ্খলিত করা', 'নিয়ন্ত্রিত করা', 'প্রশিক্ষণ দেওয়া' বা 'নির্দেশনা দেওয়া'। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় যেখানে 'শিক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, সেখানে সেটিকে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, শিক্ষণের কৌশলকেই ইঙ্গিত করা হয়। আবার, অনেক সময় বাংলাভাষায়, 'শিক্ষার' সমার্থক শব্দ হিসাবে 'বিদ্যা গ্রহণ বা আহরণ' কথাটিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই 'বিদ্যা' শব্দটিও সংস্কৃত 'বিদ'-ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হল 'জানা' বা 'জ্ঞান আহরণ করা'। সুতরাং, এই শব্দটি ব্যবহার করেও, সেই একই জ্ঞান আহরণের ক্রিয়ার বা কৌশলের (Processor, Technique of Acquring Knowledge) কথাই বলা হয়। আবার, ইংরেজি 'Education' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অন্বেষণ করতে গিয়ে ভাষাবিদগণ উৎস হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন ল্যাটিন শব্দের আশ্রয় নিয়েছেন। এইসব বিশ্লেষণের মধ্যে কোনোটি যে ভুল, তা নয়।

তবে, তাৎপর্যগত দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। একটি মতবাদ অনুযায়ী, ইংরেজি 'Education' শব্দটি মূল ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে এসেছে। 'Educare' শব্দের অর্থ হল— প্রতিপালন বা পরিচর্যা করা (To Bring up or to Nourish)। অর্থাৎ, এই অর্থে, শিক্ষা হল— শিশু বা অপরিণত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য যত্নের মাধ্যমে জীবনের পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পন্থা বা তাকে জীবনযাপনের উপযোগী কৌশল ও দক্ষতাগুলি অর্জনে সহায়তা করার প্রক্রিয়া। দ্বিতীয় এক মতবাদ অনুযায়ী 'Education' শব্দটি মূল ল্যাটিন শব্দ 'Educatum' থেকে এসেছে, যার অর্থ হল 'শিক্ষাদানের কাজ' (Act of Teaching) বা 'নির্দেশনা দান' (Instruction)। অর্থাৎ, এই অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায়, শিক্ষক বা নির্দেশকের কাজ। তৃতীয় অপর একটি মতবাদ অনুযায়ী 'Education' শব্দটি এসেছে মূল ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে। এই 'Educare' শব্দের অর্থ হল— 'নিষ্কাশন করা' বা 'বের করে আনা' (To Draw Out) বা 'প্রকাশ করা' (To Lead Out)। অর্থাৎ, এই অর্থে শিক্ষা হল, শিশুর অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে পরিস্ফুটিত করার প্রক্রিয়া। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের বিচারে, 'শিক্ষা' শব্দের প্রত্যেকটি অর্থের সম্ভাবনা আছে। তবে, তাৎপর্যগত দিক থেকে অর্থগুলির মধ্যে পার্থক্য বর্তমান এবং যুগের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, এইসব তাৎপর্যগত অর্থগুলির উপর বিভিন্ন সময়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায়, তাই 'শিক্ষা' বলতে সঠিকভাবে কী বোঝায়, তা ব্যক্ত করার জন্য 'শিক্ষা' বা 'Education' শব্দের তাৎপর্যগত অভিব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দের অথবা ইংরেজি 'Education' শব্দের প্রথম যে দুটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উল্লেখ করা হয়, সেগুলির তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই অর্থেই (Narrow Concept of Education), 'শিক্ষা' শব্দটি এক সময় ব্যবহার করা হত। সমাজজীবন যখন সংকীর্ণ চাহিদাভিত্তিকভাবে গড়ে উঠেছিল তখন একক মানুষও তার জীবন ধারণের উপযোগী সংকীর্ণ ব্যক্তিগত চাহিদাগুলিকে পরিতৃপ্ত করার জন্য, শিক্ষার অর্থকে অনুরূপ সংকীর্ণ তাৎপর্যে গ্রহণ করেছিল। এই অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য হল— চাহিদা পূরণের উপযোগী কিছু কৌশল আয়ত্ত করা; অপরিপক্ক ব্যক্তি-মনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অভিজ্ঞতার চাপে ভারাক্রান্ত করে তোলা। অর্থাৎ, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনই হল শিক্ষা। প্রাক-স্বাধীনতাযুগে, এমনকি এখনও আমাদের দেশের বেশিরভাগ তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের মনে, এই ধারণাই বদ্ধমূল। শিক্ষাকে এই অর্থে গ্রহণ করলে, সামগ্রিক শিক্ষাপ্রক্রিয়ার (Process of Education) কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষা শব্দের তাৎপর্যগত ব্যাপকতার হানি ঘটায়। তাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে, শিক্ষার এই অর্থকে, তার সংকীর্ণ অর্থ (Narrow Concept of Education) হিসেবে অভিহিত করা হয়। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাধান্য পায়, সেগুলি হল—

১) কিছু জ্ঞান (Knowledge) বা কতকগুলি দক্ষতা (Skill) অর্জন করার নামই হল শিক্ষা।

২) এই অর্থে, শিক্ষার লক্ষ্য হল, শিক্ষালয়ে রেখে বা, অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে রেখে, কতকগুলি পাঠ আয়ত্ত করানো এবং একটি ডিগ্রি অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।

৩) এই অর্থে শিক্ষায়, শিক্ষকরাই হবেন প্রথম-পুরুষ; তাঁরা হবেন জ্ঞানের আধার; আর শিক্ষার্থীরা বা শিশুরা হবেন নিশ্চেষ্ট গ্রহক। অর্থ, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক হবে দাতা এবং গ্রহীতার। অন্য কোনো পর্যায়ের মানবীয় সম্পর্ক (Human Relation) তাদের মধ্যে স্থাপিত হওয়ার সুযোগ এখানে বাঞ্ছনীয় নয়।

৪) জ্ঞান দান বা গ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষার্থীর চাহিদা বা, তার নিজস্বতার কোনো মূল্য সংকীর্ণ অর্থে গৃহীত শিক্ষার মধ্যে নেই। সমাজের অভিভাবকশ্রেণী ব্যক্তিগতভাবে যা চাইবেন, তাই শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীর একান্ত নিজস্ব কোনো জন্মগত প্রবণতা যে থাকতে পারে বা তার কোনো বিশেষ বষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ থাকতে পারে, এসব দিকের বিবেচনার কোনো সুযোগ শিক্ষা-সম্পর্কিত এই ধারণায় নেই।

৫) এই সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে, শিক্ষার্থীর জীবনকালের একটি নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই সময়কাল শিক্ষার্থীর শিক্ষালয় জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ভাবা হয়। শিক্ষালয় জীবনের বাইরে যে শিক্ষাপ্রক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে, তা এই ধারণায় অন্তর্ভুক্ত নয়।

৬) সংকীর্ণ অর্থে যখন শিক্ষাকে গ্রহণ করা হয়, তখন শিক্ষণ কৌশল (Tearning Technique) এবং শিখন পদ্ধতি (Tearning Method) উভয়েই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শিক্ষণ কৌশল হিসেবে এই ধারণায় মৌখিক নির্দেশনাকে এবং শিখন পদ্ধতি হিসেবে মূলত হিসেবে মূলত আবৃত্তিকেই (Recitation) গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করার রীতি আছে।

শিক্ষা-সম্পর্কিত এই ধারণায়, শিক্ষা প্রক্রিয়ার উপর উল্লিখিত যে বৈশিষ্ট্যগুলি আরোপ করা হয়েছে, সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় তার প্রয়োজনীয়তা ও প্রকৃত তাৎপর্য হারাবে। তাই ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ থেকে শিক্ষার এই অর্থ পাওয়া গেলেও বা সাধারণের ধারণার সঙ্গে শিক্ষার এই অর্থের মিল পাওয়া গেলেও, এটিকে বর্তমান শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ হিসাবে বর্জন করেছেন।

অপরদিকে ইংরেজি 'Education' শব্দের যে তৃতীয় ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অর্থে বর্তমানে 'শিক্ষা' শব্দটি, শিক্ষাতত্ত্বে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই মতানুযায়ী 'Education' শব্দটি যে মূল শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে তার অর্থ হল— 'নিষ্কাশন করা' বা 'নির্দেশনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া'। অর্থাৎ 'শিক্ষা' (Education) শব্দের প্রকৃত অর্থ হল, শিশুর বা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির বা সম্ভাবনাগুলিরই যথাযথভাবে প্রকাশে সহায়তা করার প্রক্রিয়া। শিক্ষার এই ব্যাখ্যা আধুনিক মনোবিদ্যার (Psychology) এবং সমাজবিদ্যার (Sociology) পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনোবিদগণ বলেছেন, প্রত্যেক মানবশিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার মধ্যে কিছু সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, তার সেই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে, সমাজ-উপযোগী হিসেবে পরিপূর্ণভাবে বিকাশসাধন করা। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি যদি পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভের সুযোগ

না পায়, তাহলে ব্যক্তজীবন হবে পঙ্গু। আবার, ব্যক্তি যদি তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সহকারে সমাজজীবনে নিজেকে নিয়োজিত করতে না পারে, তাহলে সে সামাজিক দিক থাকে অক্ষম হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই শিক্ষা হবে ব্যক্তির জন্মগত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ধরনের চাহিদার তৃপ্তির প্রক্রিয়া। 'শিক্ষা' শব্দটিকে তার তৃতীয় ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গ্রহণ করলে, পূর্বোক্ত উভয় ধরনের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ তাই 'শিক্ষা' শব্দটিকে এই অভিহিত করে শিক্ষাতত্ত্বে স্থান দিয়েছেন। এই অর্থে, শিক্ষা বলতে কোনো একটি সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে সীমিত প্রশিক্ষণকে বোঝায় না। ব্যক্তির জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ণ ও উন্নয়ন ঘটমান সেই অর্থে শিক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়।

১) এই অর্থে শিশুর সকল রকম সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের প্রক্রিয়াই হল শিক্ষা।

২) ব্যাপক অর্থে, শিক্ষার লক্ষ্য হল, শিশুর দৈহিক (Physical), মানসিক (Mental), প্রাক্ষোভিক (Emotional), সামাজিক (Social), আধ্যাত্মিক ও নৈতিক (Spiritual and Moral) প্রভৃতি জীবনের সকল দিকের বিকাশসাধন করা। এককথায় বলা যায় শিশুর সামগ্রিক বিকাশসাধন করা শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৩) শিক্ষার লক্ষ্য যেহেতু শিশুর জীবনের সামগ্রিক বিকাশ এবং মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া যেহেতু জীবনব্যাপী ঘটমান প্রক্রিয়া, সেহেতু এই অর্থে, 'শিক্ষা' এক ধরনের জীবনকালব্যাপী ঘটমান প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, ব্যাপক অর্থে 'শিক্ষা' শিশুর বা ব্যক্তির শিক্ষালয় জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

৪) শিশুর সামগ্রিক জীবন বিকাশের জন্য বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি অপরিবর্তনীয় তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনের সকল দিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞানসমূহ ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাবলীর সমন্বয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা ব্যাপক অর্থে স্বাভাবিকভাবে, তার বিষয়বস্তু (Subject-Mater) সংক্রান্ত এই ধারণা অন্তর্ভুক্ত।

৫) ব্যাপক অর্থে, শিক্ষায়, শিক্ষকের কাজ জ্ঞান বিতরণ করা নয়; শিক্ষার্থী বা শিশুর কাজও শুধুমাত্র সেই পরিবেশিত জ্ঞান নির্বিচারে গ্রহণ করা নয়। অর্থাৎ, এখানে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে যান্ত্রিক দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রত্যাশা করা হয় না। শিক্ষকের ভূমিকা এখানে সহায়কের। তিনি শিক্ষার্থীর কাছে তার জীবনাদর্শের মূর্ত রূপ, তার প্রকৃত বন্ধু এবং সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক এখানে সহজ ও স্বাভাবিক।

৬) শিক্ষা ক্ষেত্রে, শিশু বা শিক্ষার্থী যে মুখ্য, সেকথা শিক্ষার এই আধুনিক ব্যাপক অর্থে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই কারণে, শিক্ষার্থী তার শিখনকৌশল হিসেবে, আত্মসক্রিয়তাকে ব্যবহার করবে, এটিই প্রত্যাশিত। আপন চাহিদাভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জনে, শিশু বা শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলাই হবে শিক্ষকের কাজ। অর্থাৎ, তিনি সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষণ কৌশল (Activity Technique) ব্যবহার করবেন।

সুতরাং, ব্যাপক অর্থে গৃহীত 'শিক্ষা' শব্দের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে যেখা যায়, শিক্ষা এখানে অপরিপক্ক ব্যক্তির উপর জ্ঞান আরোপের প্রক্রিয়া নয়। এই শিক্ষায়, জীবনধারণের কৌশলগুলি

শিক্ষার্থীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। সে সমাজজীবনে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করার মাধ্যমে নিজস্ব সক্রিয়তার আয়ত্ত করবে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই অভিজ্ঞতা অর্জনে থাকবে অভিনবত্বের স্বাদ; গতানুগতিক চিরন্তন ভাবধারা পরিবহনের চাপ কখনোই না। শিক্ষক এখানে দাতার ভূমিকা পালন করবেন না; তিনি হবে সহায়ক মাত্র। তিনি শিক্ষার্থীকে সমাজনিবদ্ধ পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবেন। জোর করে তার উপর সমাজের বিধি নিষেধ চাপিয়ে তাকে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা কখনোই করবেন না।

'শিক্ষা' শব্দের দুটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Meaning) তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সামগ্রিক। অর্থাৎ, দুটি পৃথক পৃথক অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করলে, শিক্ষার প্রক্রিয়ার অন্তর্গত লক্ষ্য (Aim), পদ্ধতি (Method), বিষয়বস্তু (Subject-Matter) ইত্যাদির মতো উপাদানগুলির মধ্যে বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। নীচের তালিকায় দুটি অর্থে গৃহীত 'শিক্ষায়' শিক্ষাপ্রক্রিয়ার যে উপাদানগত পার্থক্য বর্তমান থাকে সেগুলি সংক্ষেপে পরিবেশন করা হল। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখার দরকার, আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে, 'শিক্ষা' শব্দটিকে তার ব্যাপক অর্থেই বিচার করা হয় বা ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, পরবর্তী পর্যায়ে, শিক্ষা বলতে ব্যাপক অর্থকেই (Broader Meaning) ইঙ্গিত করা হবে।

শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থের তুলনামূলক তাৎপর্য

Comparative significance of Narrow and Borader Meaning of Education

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ Narrow Meaning	শিক্ষার ব্যাপক অর্থ Broader Meaning
অর্থ ঃ জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা	**অর্থ ঃ** শিশুর সকল রকম সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষা
লক্ষ্য ঃ পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে মানসিক বিকাশ	**লক্ষ্য ঃ** শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ইত্যাদি সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক বিকাশ
ব্যাপ্তিকাল ঃ বিদ্যালয় জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ	**ব্যাপ্তিকাল ঃ** শিক্ষা ব্যক্তির জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া
বিষয়বস্তু ঃ কতকগুলি অপরিবর্তনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান	**বিষয়বস্তু ঃ** তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়
শিক্ষকের ভূমিকা ঃ তাত্ত্বিক জ্ঞান বিতরণ করা	**শিক্ষকের ভূমিকা ঃ** শিক্ষার্থীর জীবনের আদর্শ ও তার বন্ধু ও সহায়কের ভূমিকা

শিখন ও শিক্ষণের কৌশল ঃ মৌখিক নির্দেশনা ও আবৃত্তি	**শিখন ও শিক্ষণের কৌশল ঃ** শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাভিত্তিক কৌশল
শিক্ষার্থীর ভূমিকা ঃ নিষ্ক্রিয় শ্রোতা বা গ্রহীতা	**শিক্ষার্থীর ভূমিকা ঃ** সক্রিয়ভাবে চাহিদাভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন

৩.৪ শিক্ষা ও শিক্ষাবিজ্ঞান (Education and Science of Education)

ইংরেজি 'Education' শব্দটি এতই প্রচলিত যে, সেটিকে সাধারণ কথাবার্তায় বিভিন্ন অর্থে বা তাৎপর্যে ব্যবহার করা হয়। দেখা গেছে, 'এডুকেশন' শব্দটি অন্ততপক্ষে তিনটি অর্থে ব্যবহার করার চল আধুনিককালে আছে। কখনো কখনো 'এডুকেশন' শব্দটির দ্বারা শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে (Educations Process) বোঝানো হয়। আবার কোনো সময় শব্দটির মধ্যে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ফলকে (Product of Education Process) ইঙ্গিত করা হয় (যেমন - তার কোন এডুকেশন নেই)। তৃতীয়ত, কোনো কোনো সময় এডুকেশন বলতে একটি বিজ্ঞানের শাখা বা জ্ঞানের ক্ষেত্রকে (Area of Knowledge) বোঝানো হয়। এটি হল (Science of Education) বা 'শিক্ষাবিজ্ঞান'। প্রক্রিয়াগত অর্থে (Education as a process) এবং ফলগত অর্থে (Education as product) শিক্ষা শব্দটির সঙ্গে সাধারণের পরিচিতি থাকলেও, 'শিক্ষাবিজ্ঞানের' সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই বললেই চলে। ফলে, 'এডুকেশন' তিনটি ব্যবহারিক অর্থ সম্পর্কে সচেতন হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন।

খুব সাধারণভাবে, শিক্ষা হল, শিশুকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া। এই ধরনের সুপরিকল্পিত প্রভাবের দ্বারা শিশুর এবং সমাজের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় এবং উভয়ের উন্নতি হয়। এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে কিন্তু পরিবর্তন হয়, যেগুলি তাদের উন্নতির সূচক। এই পরিবর্তগুলিকেই অনেক সময় শিক্ষা বলা হয়। যেমন, 'শিক্ষিত ব্যক্তি' বলতে কিছু বিশেষ ধরনের জ্ঞানের (Knowledge) বা দক্ষতার (Skill) অধিকারীকে বোঝায়। এখানে জ্ঞান, দক্ষতা, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তি শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করেছে। তাই এসব ক্ষেত্রে, এডুকেশন বলতে ফলকে বুঝতে হয়। অন্যদিকে, শিক্ষাবিজ্ঞান (Science of Education) যাকে চলতি কথায় শুধুই 'শিক্ষা' বলা হয়ে থাকে, সেটি হল মানুষের বিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডারের একটি বিশেষ অংশ বা শাখা (Branch of human knowledge)। এই জ্ঞানের শাখায় বা বিজ্ঞানে, মানুষের শিক্ষাপ্রক্রিয়াও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার জন্য এবং ওইসব সমাজ সংস্থাগুলির উন্নতিসাধনের জন্য বর্তমানে বহু বিশেষধর্মী (Specialized) জ্ঞানের শাখা গড়ে উঠেছে। এইসব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় সামাজিক বিজ্ঞান (Social sciences)। শিক্ষা, আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সেই সামাজিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, সামাজিক বিভিন্ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে। এই কারণে, শিক্ষাবিজ্ঞানও একটি সামাজিক বিজ্ঞান (Social sciences)। শিক্ষা, আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সেই সামাজিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, সামাজিক বিভিন্ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে। এই কারণে, শিক্ষাবিজ্ঞানও একটি সামাজিক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল— শিক্ষা-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, গতি, উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য সংযুক্ত বিষয়-সম্পর্কিত আলোচনা করা। শিক্ষাবিদ এম. আর. চার্লস (M.R.Charles) শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রকৃতি বোঝাতে তাকে একটি

প্রয়োগমূলক সামাজিক বিজ্ঞান (Applied Social Science) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি "Education is an applied social science অর্থাৎ, শিক্ষাবিজ্ঞানে, যে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাই নয়, তার একটি প্রয়োগমূলক দিকও আছে। আর এই কারণেই শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়। এই বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতেই শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বর্তমান সমাজে পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা হয়। শিক্ষার তাত্ত্বিক দিক (Theoretical aspect) সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকরা যেকোনো চিন্তাবিদের থাকলেও, সেই প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত মতামত ব্যক্ত করার অধিকার কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের। এই বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা হলেন শিক্ষাবিজ্ঞানী। এই শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ তাঁদের গবেষণা ক্ষেত্রে শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রয়োগমূলক দিক সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষামূলক তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অবদানের ফলশ্রুতি হিসেবে এবং যৌক্তিক ও পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের (Logical and experimental conclusions) ফলে জ্ঞানের যে পৃথক শাখা গড়ে উঠেছে, তাকেই বলা হয় শিক্ষাবিজ্ঞান (Science of Education)। বর্তমানে, প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য প্রয়োগমূলক সামাজিক বিজ্ঞানগুলির (Applied social sciences) মতোই শিক্ষাবিজ্ঞানও মানুষের জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমন্বয়ের ফলে গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আধুনির ভেষজ বিজ্ঞানের (Science of medicine) কথা। জ্ঞানের এই শাখা তার বিকাশে, জীববিদ্যা (Biology), রসায়ন (Chemistry), জৈব রসায়ন (Bio-Chemistry), নৃতত্ত্ব (Anthropology) ইত্যাদির মতো বিশেষধর্মী জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছে। ঠিক একইভাবে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানেও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে, অন্যান্য বিশেষধর্মী সামাজিক বিজ্ঞান সহায়তা করেছে। সাধারণত যে সকল শিক্ষা বিজ্ঞানকে, বর্তমান স্তরে উন্নীত হতে সহায়তা করেছে, সেগুলি হল— নৃতত্ত্ব (Anthropology), ইতিহাস (History), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), সমাজবিদ্যা (Sociology), অর্থনীতি (Economics), মনোবিদ্যা (Psychology) ইত্যাদি। এছাড়া দর্শনশাস্ত্র (Philosophy) এবং শিক্ষাবিজ্ঞানীদের নিজস্ব পরীক্ষালব্ধ বিভিন্ন তথ্যাবলী ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যাকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার প্রসঙ্গে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংযোজন করেছেন, যাকে বলা হয় শিক্ষাগত প্রযুক্তিবিদ্যা (Educational Technology)। তবে প্রসঙ্গক্রমে একথাও স্মরণ রাখার দরকার যে শিক্ষাবিজ্ঞান, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি তথ্যের সমবায় নয়। বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, শিক্ষাবিজ্ঞান তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করে, তার নিজস্ব আলোচ্য বিষয়বস্তুর একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। যেমন - নৃতত্ত্বের তথ্যাবলি তুলনামূলক শিক্ষাবিজ্ঞানের (Comparative Education) বিষয়বস্তু চয়নে সহায়তা করেছে। ইতিহাস, শিক্ষার বিবর্তন-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সূত্রাবলী (Sources) নির্ধারণের সহায়তা করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালন ও প্রশাসন (Educational organisation and administration)-সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে শিক্ষাবিজ্ঞানকে সহায়তা করেছে। সমাজবিদ্যা, শিক্ষাবিজ্ঞানে, শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে সহায়তা করেছে। মনোবিদ্যা, শিশুর বা শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে, শিক্ষাবিজ্ঞানের বিকাশে সহায়তা করেছে। দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদ, শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল কাঠামোর দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন বস্তুনির্ভর বিজ্ঞান (Physical Sciences) ও প্রযুক্তিবিদ্যার তথ্যাবলী, শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে শিক্ষাবিজ্ঞানীদের সচেতন করে এবং সে বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় উৎসাহিত করেছে। এমনিভাবে বিচার করলে দেখা যায়, বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান

সংগ্রহ করে, শিক্ষাবিজ্ঞান নিজেকে পুষ্ট করেছে এবং নিজের স্থায়ী সংগঠিতরূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে, শিক্ষাবিজ্ঞান যে তথ্যাবলি সংগ্রহ করে নিজেকে পুষ্ট করেছে, তার স্বীকৃতিস্বরূপ, সেগুলিকে সে তার বিষয়বস্তুর মধ্যে শিক্ষার ভিত্তি (Foundation and Basis of Education) হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছে।

৩.৫ আধুনিক শিক্ষার স্বরূপ (Nature of modern Education)

শিক্ষার সকল দিকই বিবর্তনশীল। প্রাচীন বিভিন্ন ধারণা বির্বতনের মধ্য দিয়ে, শিক্ষা বর্তমানে যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তাকেই এককথায় বলা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা (modern Education)। আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানুষের চিন্তাজগতের আলোড়ন। চিন্তাজগতে এই আলোড়নের ফলে মানুষ একদিকে যেমন, নতুন নতুন তত্ত্ব, জীব, দর্শন এবং সমাজদর্শন গড়ে তুলেছে, তেমনি অন্যদিকে তার শিক্ষাব্যবস্থাকেও নবরূপে সজ্জিত করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের চিন্তাজগত ও বস্তুজগত পরস্পর ক্রিয়াশীল এবং নির্ভরশীলও। তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই আধুনিকতার সৃষ্টি। তাই আধুনিক শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে একদিকে তার বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলিকে যেমন চিহ্নিত করা প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে চিন্তাজগত এবং বস্তুময় জীবন পরিবেশের যে পটভূমি তাকে নির্ধারণ করেছে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। বর্তমান অধ্যায়ে আধুনিক শিক্ষাকে, এইভাবে বিশ্লিষ্ট করে, তার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মানুষের চিন্তাজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিপূর্ণ রূপে দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে। জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক মতবাদ ওই সময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল আর তাদের প্রতিফলন মানুষের জীবনের সকল দিককে প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের ধারণাও সেই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। জীবনদর্শনগুলির সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে কতকগুলি শিক্ষাদর্শনও (Education Philosophy) গড়ে উঠেছিল। ওই সকল শিক্ষাদর্শন সম্পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিংশ শতাব্দীতে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং আধুনিকতা সৃষ্টি করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই শিক্ষাদর্শনে তিনটি স্পষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল - মনোবৈজ্ঞানিক প্রবণতা (Sociological tendency)। একসময়, পেস্তালাৎসি, ফ্রয়েবেল, হার্বার্ট, স্পেনসার, হাক্সলে, মন্তেসরি, লেস্টার ওয়ার্ড প্রভৃতি চিন্তাবিদগণের প্রচেষ্টায় ফলে এই দার্শনিক ধারণাগুলি কখনও সম্পর্কহীনভাবে আবার কখনও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে, সম্পূর্ণ শিক্ষাক্ষেত্রকে চিন্তার পরীক্ষাভূমিতে পরিণত করেছিল। শিক্ষাদর্শনের উল্লিখিত তিনটি প্রবণতার মূল বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করলে, আধুনিক শিক্ষার বৌদ্ধিক পটভূমিকে উপলব্ধি করা সহজ হবে।

৩.৫.১ মনোবৈজ্ঞানিক প্রবণতা ঃ

শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক প্রবণতার মূল বক্তব্য ছিল - শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু (Centre) হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শিশুরই সর্বাঙ্গীন বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে সামনে রেখে, তার আগ্রহ, জৈবমানসিক

ক্ষমতা ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলির উপর নির্ভর করে শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে। শিশুরই সর্বাঙ্গীন বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে সামনে রেখে, তার আগ্রহ, জৈবমানসিক ক্ষমতা ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলির উপর নির্ভর করে শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষাকে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে সংগঠিত করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিতৃপ্তিদানের মধ্য দিয়ে তার মধ্যে যাতে নতুন নতুন শিক্ষাভিমুখী চাহিদা সঞ্চারিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষার নামে তার উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ, শিশুর প্রতি পরিপূর্ণ সমবেদনাবোধই ছিল মনোবৈজ্ঞানিক প্রবণতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্কস্থাপন করে শিক্ষাদানের পদ্ধতির (Correlation of studies) কথাও এই মতবাদে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল। অর্থাৎ, শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে যা কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন, সে সমস্ত বিষয়ে এই মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

৩.৫.২ বৈজ্ঞানিক প্রবণতা (Scientific tendency) ঃ

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে, সাধারণ মানুষের চিন্তার জগতে যে পরিবর্তন এসেছিল, তারি পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবণতা দেখা যায়। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক প্রবণতার মূল লক্ষ্য ছিল, উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা। পূর্বে শিক্ষা বলতে বিশেষভাবে কতকগুলি গতানুগতিক জ্ঞানমূলক বিষয়ের পাঠ গ্রহণকে বোঝাত। ওই সকল জ্ঞান শিশুর বাস্তব জীবনের সমস্যাবলি সমাধান করতে এতটুকু সহায়তা করছে, তা শিক্ষার বিচার্য বিষয় ছিল না। বৈজ্ঞানিক প্রবণতা, এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে প্রয়াসী ছিল। এই প্রবণতার মূল বক্তব্য ছিল, শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকে সেইসব বিষয়ের জ্ঞান সরবরাহ করতে হবে, যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার দ্বারা শিশু আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল রকম উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবে, সেই ধরনের বহুমুখী জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাসমূহ তাকে শিক্ষার মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে। যেহেতু, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, শিশুকে, ব্যবহারিক দিক থেকে জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তুলবে একথা প্রমাণিত সেহেতু তাকে এই সমস্ত সম্মুখীন করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রবণতায় বিশেষভাবে পাঠ্যক্রমের বা পাঠ্য বিষয়বস্তুর পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল এবং তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সংযোজন করার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদগণ বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই মানুষকে তার প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারী করে তুলতে পারে। সুতরাং, এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের (Complete living) উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তা সম্ভব হবে বিজ্ঞানশিক্ষার মাধ্যমে।

৩.৫.৩ সমাজবৈজ্ঞানিক প্রবণতা (Sociolgical tendency) ঃ

সবশেষে, সমাজবৈজ্ঞানিক প্রবণতার (Sociolgical tendency) মূল বক্তব্য ছিল, সমাজই মুখ্য সত্তা। ব্যক্তিকে বা শিশুকে ওই মুখ্য সত্তার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে হবে। এই ধারণার বিশ্বাসী চিন্তাবিদগণ শিক্ষাকেই সামাজিক অভিব্যক্তির (Social evolution) প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, তাঁরা বলেন, সমাজ অভিব্যক্তির দুটি মূল উপাদান-একটি হল ব্যক্তির আত্মসচেতনতা (Self conciousness) এবং অপরটি হল উন্নতির বা অভিব্যক্তির ইচ্ছা (Will to evolve)। শিক্ষার দ্বারা মানুষকে, এই দুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে গড়ে তোলা সম্ভব এবং শিক্ষাকে সেই চেষ্টাই করতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার লক্ষ্য হবে, শিশুকে বিভিন্ন

ধরনের সামাজিক অভিযোজনের প্রশিক্ষণ দিয়ে, পরিপূর্ণভাবে সামাজিক জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। অথবা, এককথায় তার সামাজিক বিকাশে সহায়তা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রবণতার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, সর্বজনীন শিক্ষার প্রচলন। শিক্ষা, প্রাচীন সমাজে, খুবই সীমিতসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের অন্তর্গত সকল মানুষের শিক্ষার অধিকার ছিল না, সুযোগও ছিল না। সমাজবৈজ্ঞানিক প্রবণতার অন্তর্গত চিন্তাবিদগণ সমাজের স্বার্থেই সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

মানুষের চিন্তার এই তিনটি পৃথক প্রবণতা, আধুনিক শিক্ষার রূপবদলে নানাদিক থেকে সাহায্য করেছে। পূর্ববর্তী মনীষীদের চিন্তাধারার এই তিনটি প্রবণতা কীভাবে এবং কোন কোন দিকে আধুনিক শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে তা বিশ্লেষণ করার পূর্বে, এই শিক্ষার সংগঠনের মূল অপর যে উপাদানটি সক্রিয় ছিল, সেটির বৈশিষ্ট্যাবলিও বিচার করা প্রয়োজন। শিক্ষাকে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করার মূলে যে উপাদানটি সক্রিয়, সেটি হল, বস্তুময় জীবন পরিবেশ (Life environment)।

৩.৬ শিক্ষার পরিধি (Scope of Education)

আধুনিক চিন্তাবিদগণের মনে শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা দার্শনিক আদর্শ ও বিমূর্ত যুক্তি (Abstract reasoning)-নির্ভর। শিক্ষার এই আদর্শ বিমূর্ত ধারণা ক্রমে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চাহিদায় সম্পৃক্ত হয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। আর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, শিক্ষার তত্ত্বগত দিক (Theoretical aspect), তা যতই বিমূর্ত হোক না কেন, ব্যবহারিক দিক থেকে তাকে বিচার করলে দেখা যায়, তার সর্বশেষ অবস্থা হল তা কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য যাই হোক না কেন, সেই উদ্দেশ্য পৌঁছোতে হলে বা তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে গেলে, দরকার অনুশীলনের। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের সংব্যাখ্যানে 'শিক্ষা' ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ জীবনে একটি ঘটমান প্রক্রিয়া। এর পরিধি ব্যাপক। ও মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই শিক্ষাবিজ্ঞানের ছোঁয়া রয়েছে। ব্যক্তির সুষম বিকাশের প্রতিটি উপাদানকে পরিপুষ্ঠু করে এই শিক্ষাবিজ্ঞান। শিক্ষার উপাদান বলতে, সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রক্রিয়ার এমন কতকগুলি অংশকে বোঝায় যেগুলির ক্রিয়াশীল সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। শিক্ষার উপাদান হল, চারটি - ১) শিক্ষার্থী (Educand), ২) শিক্ষক (Educator), ৩) পাঠ্য বিষয়বস্তু বা পাঠ্যক্রম (Curriculum) এবং ৪) শিক্ষা পরিবেশ বা বিশেষ অর্থে শিক্ষালয় (Institution)। শিক্ষার এই চারটি মুখ্য উপাদান হলেও মানবজীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষার কর্মকান্ড বিস্তৃত। এখানে এই চারটি মুখ্য উপাদানকে কেন্দ্র করে শিক্ষার কর্মপরিধি আলোচনা করা হল।

৩.৬.১ শিক্ষার্থী (Educand) ঃ

শিশুকে বা ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীকে এমন কতগুলি আচরণগত কৌশল আয়ত্ত করতে এবং এমন এক মানসিক নমনীয়তা সৃষ্টি করতে সহায়তা করা হয়, যার প্রভাবে সে পরিবর্তনশীল পরিবেশের যে-কোনো অবস্থার সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, শিশু বা শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। সুতরাং, যে-কোনো শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে একজন শিশু বা শিক্ষার্থী থাকা

প্রয়োজন, যার আচরণের উপর শিক্ষাপ্রক্রিয়ার প্রভাবটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। শিক্ষার্থী শিক্ষার প্রভাবে তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত সকল রকম সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করে সর্বসমক্ষে তুলে ধরবে। অপরিপক্ক শিশুরাই যদি অস্তিত্ব না থাকে, অপরিণত অথচ সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষারও কোনো প্রয়োজন হয় না। তাই 'শিক্ষা' ব্যক্তি-উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত প্রক্রিয়া। এই অর্থে শিক্ষার প্রধান উপাদান হল শিশু বা শিক্ষার্থী। শিক্ষার এই উপাদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, সে দেহমনবিশিষ্ট একটি জৈবিক সত্তা। তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলির যেমন সংস্কার প্রয়োজন তেমনি তার মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিরও উন্মেষ প্রয়োজন। তবে তার মনোময় জগৎই শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার কতকগুলি প্রবৃত্তি বা সহজাত প্রবণতা (Instinct) আছে, তার কতকগুলি মানসিক ক্ষমতা (Mental ability) আছে, আকাঙ্ক্ষা ও প্রেষণা (Desires and motives) তার মধ্যে সর্বদা জাগরিত থাকে, আর আগ্রহ ও প্রক্ষোভানুভূতি তাকে সদাই সক্রিয় রাখে। তার এইসব বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করা শিক্ষার আদর্শ নয়; সেগুলির সংস্কার করাই শিক্ষার মূল কাজ। আর এই সংস্কারের কাজে তার যে বৈশিষ্ট্য শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করে তা হল তার নমনীয়তা (Plasticity)। শিক্ষা, শিক্ষার্থীর এই দেহমনের স্বাভাবিক নমনীয়তাকে কাজে লাগিয়ে তার বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাকে পরিণত ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করে। মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী, সর্বদা শিক্ষাগ্রহণের বা অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছাই, মানবপ্রকৃতি। তাই শিক্ষার্থীও শিক্ষাকে জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করে।

৩.৬.২ শিক্ষক (Educator) ঃ

আদিম গোষ্ঠীজীবনে, শিক্ষা যখন কোনো নিয়মতান্ত্রিক বা আধুনিক অর্থে রীতিসিদ্ধ কোনো রূপ গ্রহণ করেনি, তখন শিশুরা জীবনধারণের বিভিন্ন কৌশল মূলত জৈবিক তাড়নায় অনুকরণের দ্বারা (Imitation) আয়ত্ত করতে সক্ষম হত। আজও শিশুরা, এই প্রক্রিয়ায় জীবনের জন্য অনেক অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে। তবে সেই আদিম মানবগোষ্ঠীতে পিতা-মাতা বা অন্যান্য বয়স্কদের প্রভাব বা জীবন পরিবেশের সামগ্রিক প্রভাব যেমন, শিশুর উপর ছিল, আজও তা আছে। কিন্তু, বর্তমান জীবন পরিস্থিতি ও জীবনযাত্রার রীতিনীতি সম্পূর্ণ শিক্ষাকে একটি প্রথাগত পরিকল্পিত রূপ দিতে বাধ্য করেছে। আর যেদিন থেকে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়মতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই একজন শিক্ষাদানকারী ব্যক্তি বা প্রভাবকারী একটি সত্তার অস্তিত্ব আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। তাই শিক্ষক উপাধিধারী (Educator) একজন ব্যক্তি বা একটি সত্তা, শিক্ষাব্যবস্থায় একটি সত্তার অস্তিত্ব আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। তাই শিক্ষক উপাধিধারী (Educator) একজন ব্যক্তি বা একটি সত্তা, শিক্ষাব্যবস্থায় একটি প্রধান অঙ্গ বা উপাদান (Factor)। সামাজিক এবং শিক্ষাগত ধারণার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর দায়িত্বের যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, তিনি শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। প্রাচীন মনুষ্যসমাজে, শিক্ষার প্রথাগত রূপ গ্রহণের প্রারম্ভিক কালে, 'শিক্ষক' বা 'গুরু'ই ছিলেন শিক্ষার মুখ্য বা কেন্দ্রীয় উপাদান। তাঁকে সকল জ্ঞানের ধারক বা আধার হিসেবে বিবেচনা করা হত আর তাঁর দায়িত্ব ছিল, নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে 'শিষ্য' বা শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চালিত করা। আধুনিক যুগের শিক্ষক কিন্তু শিক্ষার উপাদান হিসাবে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে অবস্থান করেন না। এই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার যুগে, তিনি শিক্ষার অন্য বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়েছেন; কিন্তু স্থানচ্যুত্য হননি। স্বাভাবিকভাবে তাঁর দায়িত্বের পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি পরামর্শদাতা ও প্রথম প্রদর্শকের কাজ করেছেন। তিনি তাঁর দায়িত্বের পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি পরামর্শদাতা ও পথ প্রদর্শকের কাজ করেছেন। তিনি তাঁর আদর্শ চারিত্রিক গুণাবলি ও পরিণত ব্যক্তিত্বের

প্রভাবে শিশুকে তার প্রকৃত জীবনাদর্শ কী, তা নির্বাচন করতে সহায়তা করবেন এবং প্রকৃত পথপ্রদর্শকের মতো সে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে নির্দেশনা দান করবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - ''Like fire in apiece of flint, knowledge exists in mind'' অর্থাৎ, চকমকি পাথরে যেমন আগুন অন্তর্নিহিত শক্তি, জ্ঞানও তেমনি প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি। বহির্জগতের যে-কোনো প্রেরণা বা ইঙ্গিত ঘর্ষণের কাজ করে মানুষের সেই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শিক্ষার জগতে, শিক্ষকের দায়িত্ব হল সেই প্রেরণা সঞ্চার করা। শিক্ষক কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও আদর্শ জীবনাদর্শের প্রতীক হিসাবে (Friend, Philosopher and guide) নিজেকে তুলে ধরে, সেই দায়িত্ব সম্পন্ন করেন।

৩.৬.৩ পাঠ্যক্রম (Curriculum) ঃ

শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষাণীয় বিষয়বস্তু বা শিক্ষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় পাঠ্যক্রম। শিশুর বিকাশের ধারাকে প্রত্যাশিত পথে প্রবাহিত করার জন্য কতকগুলি সুনির্বাচিত জীবন-অভিজ্ঞতা (Life experience), সুনিয়ন্ত্রিত কৌশলে তার সামনে উপস্থাপন করা হয়। এইসব জীবন-অভিজ্ঞতার সমষ্টিকেই সাধারণভাবে বলা হয় পাঠ্যক্রম। এই পাঠ্যক্রম শিশুকে তার জীবনবিকাশে প্রত্যক্ষভাবে আত্মসক্রিয় করে তোলে। পাঠ্যক্রম বলতে পূর্বে শিক্ষালয়গুলিতে অনুশীলিত কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ের তালিকাকেই ইঙ্গিত করা হত। কিন্তু আধুনিক অর্থে, পাঠ্যক্রম তা ঠিক নয়। শিক্ষালয় জীবনের মধ্যে বসবাসকালে, শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই হোক বা বাইরেই হোক, যত রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পায়, সেসব অভিজ্ঞতার সমন্বয়পূর্ণ রূপকেই বলা হয় পাঠ্যক্রম। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার ব্যক্তিজীবনে উপযোগিতা এই পাঠ্যক্রমের সাংগঠনিক রূপের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে, একথা শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন। তাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে পাঠক্রম পরিকল্পনার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাধ্যমে সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণসাধন করা, সেক্ষেত্রে শিশুর বিকাশের ধারাকে সেই অভিমুখে প্রবাহিত করার জন্য পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন আবশ্যিক। আর, সেই পরিকল্পিত, বিকাশমুখী অভিজ্ঞতাগুলির সঞ্চয়ন এবং সংবর্ধন শিশুর দিক থেকে একান্তভাবে প্রয়োজন। এই হিসেবে, পাঠ্যক্রমকে বা শিক্ষার একটি আবশ্যিক প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩.৬.৪ শিক্ষালয় (School) ঃ

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা শূন্য অবস্থার মধ্যে সংঘটিত হতে পারে না। এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য যেমন শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বা পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন হয়, তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষালয়ের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ শিক্ষা-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, তা সংগঠিত বা অসংগঠিত যে প্রকারেরই হোক না কেন। সমাজ-সংগঠনের মধ্যেই, সমাজেরই প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা, শিক্ষালয়ের আবির্ভাব হয়েছিল সামাজিক অভিব্যক্তির সুদূর এক অতীত পর্যায়ে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হল ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী যাতে তার প্রয়োজনীয় জ্ঞানমূলক (Congnative), কৃষ্টিমূলক (Cultural), সামাজিক এবং অন্যান্য সকল শ্রেণির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, তার উপযুক্ত সুযোগ বা পরিবেশ সৃষ্টি করা। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে সাধারণ পর্যায়ের বিদ্যালয়, কলেজ, পেশাগত প্রতিষ্ঠানকেই সাধারণভাবে শিক্ষালয় বলা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution), এমনকি বিশ্বপ্রকৃতিও পরোক্ষভাবে ব্যক্তিকে শিক্ষামূলক

অভিজ্ঞতা দান করে। আধুনিক প্রযুক্তির সৃষ্টি হিসাবে বিভিন্ন ধরনের জনসংযোগ (Mass Communication) ব্যবস্থাসমূহ যেমন, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদিও শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে কাজ করছে। এদেরকেও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই এগুলি সবই আধুনিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বা শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই এগুলি সবই পরিস্থিতি অনুযায়ী এক একটি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং, এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপনীত হওয়া যায়, আধুনিক শিক্ষা-প্রক্রিয়া এই চারটি উপাদানের দ্বারা সংগঠিত রূপ ধারণ করে। এগুলির মধ্যে কোনো একটিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে, শিক্ষা-প্রক্রিয়া সংগঠিত হতে পারে না। যে-কোনো দেশে যে-কোনো কালে শিক্ষাব্যবস্থা এই চারটি উপাদানের সমন্বয়পূর্ণ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়েছে, কখনও অনিয়ন্ত্রিভাবে বা কখনও নিয়ন্ত্রিতভাবে। স্যার গ্রাহাম বেলফোর (Graham Belfour) তাঁর বিদ্যালয় প্রশাসন সংক্রান্ত পুস্তকে শিক্ষার বিশেষভাবে এই চারটি উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন এবং আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন - ''The function of education is to enable the right pupil to receive the right education (the curriculam) from the right teacher under conditions (institution) which will enable the pupils best to profit by their training.'' অর্থাৎ, এই সিদ্ধান্ত করা যে, শিক্ষা-প্রক্রিয়া হল, সুশিক্ষকের নির্দেশনায় সুসংগঠিত যে-কোনো রকমের প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষালয়ে সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক জীবনবিকাশের এক স্বীকৃত প্রচেষ্টা। সক্রিয় সমন্বয় (Education is the dynamic organisation of certain fundamental element) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, শিক্ষার এই উপাদানগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে, এই সমন্বয়ের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হবে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের কর্মপরিধিতে বোঝা সহজ হবে।

৩.৬.৫ শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Relation between educand and teacher) ঃ

প্রথমত, শিক্ষক (Teacher) এবং শিক্ষার্থী (Educand)-এর মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। শিক্ষার এই দুটিই মানবীয় উপাদান (Human factor)। শিক্ষা পরিস্থিতিতে তাদের সহাবস্থান আবশ্যিক। সামাজিক নিয়মে মানব ধর্মের প্রকৃতি অনুসরণ করে, দুজন ব্যক্তি সহাবস্থান করলে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক গড়ে উঠবেই; একজন ব্যক্তির আচরণ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, মনোভাব ইত্যাদি অপর জনকে প্রভাবিত করে। এই প্রকারের ব্যক্তিকেন্দ্রিক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামাজিক জীবনের ধারাবাহিকতা যেমন বজায় রাখতে সহায়তা করে তেমনি সামাজিক সুসম্পর্কও (Social realtion) গড়ে উঠতে সহায়তা করে। শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণ যখন সমষ্টিগতভাবে বাস করেন তখনও তাঁদের মধ্যে এই সাধারণ সামাজিক নিয়ম একইভাবে কাজ করে। শিক্ষা-প্রক্রিয়া চলাকালীন, শিক্ষার্থীরা যেমন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা এবং জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় তেমনি অপরদিকে একই পরিস্থিতিতে শিক্ষকও শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করে, অনুশীলন করে এবং তাদের প্রতিক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করে, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ভান্ডার পূর্ণ করেন এবং চিন্তাধারার সম্প্রসারণ ঘটানোর সুযোগ পান। অর্থাৎ, শিক্ষাপ্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কালে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এই উভয় মানবীয় উপাদান একইসঙ্গে দাতা ও গ্রহীতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল কথা হল, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য (Similarity of objective), মনোপ্রাকৃতির সাদৃশ্য (Similarity in mental makeup) এবং কর্মপ্রকৃতিগত সাদৃশ্য (Similarity of action) না থাকলে শিক্ষা-প্রক্রিয়া

সুষ্ঠুভাবে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন - ''গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি শুকিয়ে একেবারেকাঠ হয়ে যায়, তাহলে তিনি ছেলের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাজুয্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই''। তার শিক্ষা-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার একটি শর্ত হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উপযুক্ত পারস্পরিক ক্রিয়া।

৩.৬.৬ শিক্ষার্থী পাঠ্যক্রম সম্পর্ক (Relation between educand and curriculum) ঃ

শিক্ষার্থী ও পাঠ্যক্রম, শিক্ষার এই দুটি উপাদানের মধ্যে একটি সজীব মানবসত্তা (Human entity) এবং অপরটি হল আপাততভাবে নির্জীব বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা (Objective experience), যাকে কেবলমাত্র মনোধর্ম দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। গতানুগতিক শিক্ষাসম্পর্কীয় ধারণায় মনে করা হত, যেহেতু এদের মধ্যে একটি জৈবিক এবং অপরটি অজৈবিক, সেহেতু এদের মধ্যেকার সম্পর্ক একমুখী। অর্থাৎ, সেই ধারণা অনুযায়ী, পাঠ্যক্রম হল কতকগুলি স্থায়ী অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং জড়ধর্ম (Static) সম্পন্ন এবং শিক্ষার্থীর কাজ হল, যে-কোনো প্রকারের হোক সেগুলিকে আয়ত্ত করা। ব্যক্তিগত বা সমাজজীবনে প্রয়োজনে আসুক বা না আসুক ওই অভিজ্ঞতাগুলিকে আয়ত্ত করাই ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রধান কাজ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে, শিক্ষা-সম্পর্কিত ধারণার সম্প্রসারণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত ওই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। এই ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা, শিক্ষার্থীকে তার জীবন উপযোগী প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাই সরবরাহ করবে। মনোবিদগণ বলেছেন, শিক্ষার্থী বা ব্যক্তি কেবলমাত্র সেই অভিজ্ঞতাগুলিকে গ্রহণ করবে, যেগুলি তার কোনো না কোনো চাহিদা পরিতৃপ্তিতে সহায়তা করে। যে অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে যুক্ত নয়, সেগুলি সে গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ, শিক্ষার পাঠ্যক্রমের (Curriculum) মধ্যে কোন বিষয়বস্তুগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে, তা নির্ধারিত হচ্ছে অনেকাংশে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার দ্বারা। অপরদিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত যে-কোনো নতুন অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাপুঞ্জের (Apperceptive mass) পুনবিন্যাসে এবং তার উন্নত পর্যায়ের সংগঠনের সহায়তা করছে। এই সংগঠনকে বিশিষ্ট দার্শনিক-মনোবিদ পিঁয়াজে (Piaget) নাম দিয়েছেন স্কিমা (Schema)। এরই প্রভাবে শিক্ষার্থীর আচরণধারার উন্নতি হয়। সুতরাং এখানেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার্থী পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। পাঠ্যক্রম, শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করে এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার দ্বারা পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়। এটাই পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক যা শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

৩.৬.৭ শিক্ষক ও পাঠ্যক্রমের সম্পর্ক (Relation between Teacher and Curriculum) ঃ

শিক্ষাপ্রক্রিয়ার অন্তর্গত আলোচ্য উপাদানগুলির মধ্যে আর একটি সম্পর্কের দিক হল, শিক্ষক ও পাঠ্যক্রমের মধ্যেকার সম্পর্ক। শিক্ষকের দায়িত্ব হল, পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধাবন করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের মধ্যে সাংগঠনিক পরিবর্তন আনা। তাই শিক্ষক এবং পাঠ্যক্রম, শিক্ষার পরস্পরনিরপেক্ষ উপাদান নয়। শিক্ষক তাঁর বিচারবিবেচনা, যুক্তিশক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োগের মাধ্যমে একটি পাঠ্যক্রম নির্বাচন করেন। অর্থাৎ, একটি শিক্ষাপ্রক্রিয়ার অন্তর্গত পাঠ্যক্রমের কাঠামো কীরূপ হবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শিক্ষক। কিন্তু পাঠ্যক্রম একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে, শিক্ষকের পরবর্তী সক্রিয়তা তার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে যায়। শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সচল রাখার জন্য তাঁকে কী কী বিশেষধর্মী দায়িত্ব পালন করতে হবে, তিনি শিক্ষার্থীদেরকে কীভাবে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলির সম্মুখীন করবেন, অভিজ্ঞতা উপস্থাপনের কী পর্যায়

অনুসরণ করবেন, এ সবকিছুই পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং কাঠামোই নির্ধারণ করে দেয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও শিক্ষক এবং পাঠ্যক্রম, শিক্ষার এই দুটি উপাদান পরস্পর ক্রিয়াশীল সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে; একে অপরকে প্রভাবিত করে সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মধ্যে গতিধর্মের সঞ্চার করে।

শিক্ষা-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত চতুর্থ উপাদানটি হল, শিক্ষালয় বা শিক্ষাপরিবেশ (Educational environment)। শিক্ষালয় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার অন্য উপাদানগুলিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন, শিক্ষালয়ের মধ্যে জীবনযাপন করতে করতেই শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলি অর্জন করে। অন্যদিকে, বিভিন্ন শিক্ষার্থীর আচরণগত ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের সংশ্লেষণের মধ্য দিয়েই এক-একটি শিক্ষালয়ের নিজস্ব কৃষ্টি গড়ে ওঠে। আবার, শিক্ষালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের সক্রিয়তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। বিপরীতক্রমে, শিক্ষকও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিক্ষালয়ের সামগ্রিক পরিবেশকে শিক্ষাপ্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সংঘটিত হওয়ার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারেন। আবার, শিক্ষালয়জীবনে বসবাস কালে অনুভূত বৈচিত্র্যগুলিই, শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনের জন্য অভিজ্ঞতা হিসেবে পুঞ্জীভূত হয়। শিক্ষার্থীর এই অভিজ্ঞতাগুলিকেই পাঠ্যক্রমের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, শিক্ষালয় জীবনের বৈশিষ্ট্যাবলি পাঠ্যক্রমকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। বিপরীতদিকে, পাঠ্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু শিক্ষাপরিবেশ রচনা করা একান্তভাবে প্রয়োজন। সুতরাং, সকলদিকে থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাপরিবেশ বা শিক্ষালয় (School) শিক্ষার অন্য তিনটি উপাদানের সঙ্গে অনুরূপভাবেই পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্কে (Mutual interaction) আবদ্ধ। যেহেতু, শিক্ষাপরিবেশ বা শিক্ষালয়, শিক্ষাপ্রক্রিয়ার অন্তর্গত অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার মাধ্যম (Medium) হিসেবে কাজ করে, সেহেতু ওই উপাদানগুলির উপর তার প্রতিক্রিয়া সর্বমুখী। এসবই শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে।

৩.৭ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Education)

আধুনিক সমাজে, শিক্ষাব্যবস্থা সর্বতোভাবে পরিকল্পিত। কারণ, প্রত্যেক সমাজ তার নিজস্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতকগুলি আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনারই প্রচেষ্টা করে। তাই ইতিপূর্বে শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনার সূচনায়, তাকে একটি সচেতন এবং ঐচ্ছিক সামাজিক প্রক্রিয়া (Conscious and deleberate social process) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী, মানুষের যে-কোনো সচেতন এবং ঐচ্ছিক প্রচেষ্টাই উদ্দেশ্যমুখী। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষই তার কোনো না কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সক্রিয়তা প্রকাশ করে বা আচরন সম্পাদন করে। সুতরাং, শিক্ষাও যদি মনুষ্য সমাজের সচেতন-ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া হয়, তবে তারও নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবে শিক্ষা ব্যক্তিজীবনে সংগতিবিধানে সহায়তা করতে যেমন ব্যর্থ হবে, তেমনি সামাজিক উন্নয়নে ও সহায়তা করতে পারবে না। এই কারণেই, আধুনিককালে শিক্ষাবিজ্ঞানে যখন ''শিক্ষা'' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন তার তাৎপর্য স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্যকেন্দ্রিক (Goal-centric) হয়ে ওঠে। যে কোনো ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা (প্রথাগত, অপ্রথাগত বা অনিয়ন্ত্রিত) হোক না কেন, তার নিজস্ব কিছু লক্ষ্য (Aims) থাকবেই। পৃথিবীর প্রাচীনতম গোষ্ঠী জীবনগুলিতে শিশুদের প্রশিক্ষণের যে রীতি অনুসরণ করা হত, তার যদিও কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা লক্ষ্য কোথাও ব্যক্ত করা হয়নি, তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেই শিক্ষারও কিছু লক্ষ্য ছিল,

তা যতই জৈবির স্তরেরই হোক না কেন। বর্তমান যুগে মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক বেশি জটিলতা লাভ করেছে; দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মানুষের অভিজ্ঞতার ভান্ডারেরও বহুমুখী বিস্তৃতি ঘটেছে। এ মত লক্ষ্যকে আর উপেক্ষা করা যায় না। শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করার পথে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত, তার লক্ষ্য স্থির করা। শিক্ষার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, কীভাবে তা নির্বাচন করা উচিত, সে বিষয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।

শিক্ষার জন্য এককভাবে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ খুবই কঠিন এবং তা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। বৈচিত্র্যকে তাই শিক্ষার লক্ষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন মনীষীদের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের আলোচনা থেকে দেখা যায়, তাঁরা শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে, মানবজীবনের কোনো না কোনো একটি দিকের উৎকর্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ, তাঁরা শিক্ষার লক্ষ্যকে মানুষের জীবনের এক-একটি দিকের আলোকে বিশেষিত করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সেই দৃষ্টিভঙ্গির দরুন শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনায় সাধারণ কয়েক শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রবণতা বর্তমানেও আছে।

৩.৭.১.ক. শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্য (Vocational aim of education) ঃ

প্রাচীন জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সরল ও সহজ। বয়সকালে জীবনধারণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিশুকে জটিল কোনো কৌশল আয়ত্ত করতে হত না। খাদ্য সংগ্রহ ও বাসস্থান রচনাকে কেন্দ্র করে, তাদের সামান্য কিছু সরল আচরণ আয়ত্ত করতে হত। ফলে, ওইসব জনগোষ্ঠীতে শিক্ষা ছিল নিতান্তই অনিয়ম তান্ত্রিক (Informal)। কিন্তু বিবর্তনের ধারায় মনুষ্যসমাজে অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা সংযোজনের ফলে এবং মনুষ্য চাহিদার পৃথকীকরণের দরুন, জীবনযাত্রার প্রকৃতি ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল। এই অবস্থায়, শিক্ষাকেও সুসংগঠিত একটি নিয়ন্ত্রিত রূপ (formal structure) দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। পিতামাতা বা পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব হল না, শিশুর আচরণকে প্রত্যাশিত নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা; সম্ভব হল না, তাঁদের পক্ষে শিশুকে জটিল জীবন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উপযোগী করে তৈরি করে দেওয়া। গোষ্ঠীপতিগণ তথা সমাজপতিগণ অনুভব করলেন, শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে, শিক্ষাকে সুসংগঠিত করতে হবে। শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলার গুরুতর দায়িত্ব শিক্ষাকেই পৃথকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এই সুসংগঠিত শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে, শিশুকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে, শিক্ষাকে সুসংগঠিত করতে হবে। শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলার গুরুতর দায়িত্ব শিক্ষাকেই পৃথকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এই সুসংগঠিত শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে, শিশুকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো বৃত্তির (Vocation) জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা তার জীবনের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। অর্থনৈতিক তাৎপর্যে, শিক্ষার এই বৃত্তিমূলক লক্ষ্যের মূল কথা হল শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিকে উপার্জনক্ষম করে তুলতে হবে। ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনও (মুদালিয়র, ১৯৫২) তাঁদের প্রতিবেদনে শিক্ষার এই লক্ষ্যকে আংশিকভাবে সমর্থন করে বলেছেন - 'যে জ্ঞান মানুষকে তার জীবিকা অর্জনে সহায়তা করে না, তার কোনো মূল্যই ব্যক্তিজীবনে থাকতে পারে না'। অর্থাৎ, শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীকে এমন কতকগুলি কর্মকৌশল ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা যেগুলির দ্বারা সে তার জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এককভাবে এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদগণ মনে করেন, বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের প্রয়াসকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচন করলে, মানুষের জীবনের অনেক সমস্যার সমাধানই সহজে করা সম্ভব হবে।

৩.৭.১.খ. শিক্ষার কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য (Cultural aim of education) ঃ

সমাজবিজ্ঞানীগণ বলেছেন, কৃষ্টি (Cultural) হল মানবপ্রকৃতির এমন একটি দিক যাকে অনুশীলনের মাধ্যমে পরিণতির বা পরিপক্কতার স্তরে উন্নীত করা যায়। বিশিষ্ট দার্শনিক জন ডিউই বলেছেন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে সমাজের সাধারণ কার্যাবলির সঙ্গে একাত্মবোধের অনুভব এবং অনুশীলনই হল কৃষ্টি (Cultivation of powerto join freely and fully in shered or common activities)। এককথায়, কৃষ্টি হল, জগতে যা কিছু ভালো বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলির চর্চা বা অনুশীলন। মনুষ্যসমাজের বহু উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা, সংস্কার, রীতিনীতি বা প্রথা তার সাংস্কৃতিক ধারার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। একেই সাধারণ ভাষায় বলা হয় কৃষ্টি। শিক্ষাবিদ ওটাওয়ে (Otta-way) কৃষ্টির সংজ্ঞায় বলেছেন, ''The culture of society means the total way of life of a society''। কোনো কোনো শিক্ষাবিদ মনে করেন, প্রত্যেক মানবশিশুকে তার সমাজের অতীত সংস্কৃতির ধারায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে সে মানব-অভিজ্ঞতার মূল এবং সুন্দর অংশটিকে হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারে এবং আচরণে গ্রহণ করতে পারে। তাঁরা মনে করেন, চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুকে, তার সমাজ-সংস্কৃতির অনুকূল আচরণধারা সম্পাদনের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়। উপযুক্ত শিক্ষা এই অনুশীলনের সুযোগ দান করতে পারে। সুতরাং, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজ-কৃষ্টির অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুকে কৃষ্টিবান হয়ে উঠতে সহায়তা করা। শিক্ষার এই জাতীয় লক্ষ্যকে বলা হয় কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য। এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদগণ মনে করেন, প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি তিনিই যাঁর ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি (Personality traits) সামাজিক ও নৈতিক মূল্যায়নে উন্নত পর্যায়ের, যাঁর মধ্যে সৌন্দর্য বোধের (Aesthetic appreciation) সার্থক বিকাশ ঘটেছে এবং যিনি সমাজের সঙ্গে একাত্মভাবে পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সক্ষম। সুতরাং, কৃষ্টিমূলক বিকাশকে যদি শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচন করা যায়, তবেই তার মাধ্যমে ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সংযোজন সম্ভব হবে। এটি হল শিক্ষার কৃষ্টিগত লক্ষ্যের মূল তাৎপর্য।

৩.৭.১.গ. শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্য (Moral aim of education) ঃ

অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন, ব্যক্তির নৈতিক মান (Moral standards) উন্নত করা বা আদর্শ চরিত্র গঠন করাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁরা মনে করেন, শিশু জন্মসূত্রে যে দেহমনের আধিকারী হয়, তাকেই বিকশিত করার দায়িত্ব শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। এখন, শিশুর দৈহিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপ যা পরবর্তীকালে বিকশিক হয়, তার সবটুকুই প্রায় স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে সে থাকে। এই ব্যাপারে বিশেষ কোনো শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, শিশুর মানসিক বিকাশ এবং মুল্যবোধের বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে হয় না। আর আংশিকভাবে হলেও সে ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করা যায় না। নৈতিক জীবনের বিকাশ ও চরিত্রগঠনের কাজ সম্পূর্ণভাবে শিশুর জীবনপরিবেশের প্রভাবের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। পরিকল্পিত শিক্ষাকেই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে পরিকল্পিতভাবে শিশুর মধ্যে আদর্শমূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং তাকে সুচরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠতে সহায়তা করা। একেই বলা হয় শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্য (Moral aim of education)। শিক্ষার এই নৈতিক লক্ষ্যের বিশেষ প্রবক্তা ছিলেন

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ফ্রেডরিক হার্বার্ট (Herbert)। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে তিনি এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছেন, ''The one and the whole work of education which is a long and complex training, may be summed up in the concept morality"। দার্শনিক লক (Locke) বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য চরিত্র গঠন হওয়া উচিত। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায়ও এই আদর্শের উল্লেখ পাওয়া যায়, গুরু শিষ্যের কথোপকথনের মধ্যে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদিভূমি গ্রিসদেশেও শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা ছিল। বিশিষ্ট গ্রিকদার্শনিক প্লেটোর (Plato) শিক্ষা-সম্পর্কিত মতবাদে এই আদর্শের সমর্থন মেলে। তিনি বলেছেন, যা কিছু ব্যক্তির নৈতিক গুণাবলি বিকাশকে ব্যাহত করে, সে রকম কোনো অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করা চলবে না (Noting should be admitted in education which does not conduct to promotion of virute)। মাহাত্মা গান্ধির শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে এই নৈতিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দেখা যায়।

শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্যের মূল বক্তব্য হল, শিক্ষাক্ষেত্রে সকল রকম প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হবে, শিশুর বা শিক্ষার্থীর মধ্যে উপযুক্ত মুল্যবোধ জাগ্রত করে তার চরিত্রের ভিত্তিকে দৃঢ় করা। অর্থাৎ, সহজভাবে বলা যায়, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করাই হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

৩.৭.১.ঘ. শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য (Spiritual Aim of Education) ঃ

ভাববাদী (Idealist) চিন্তাবিদগণের মতে ব্যক্তিজীবনের উদ্দেশ্য হল বিশ্বব্রহ্মান্ডে যে একক শক্তি বিরাজমান, তাকে উপলব্ধি করা। তাঁরা বস্তুজগতের সকল রকম বন্ধনকে অগ্রাহ্য করতে মানুষকে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতে ঋষিদের মনে এই ধারনাই দৃঢ়বদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সেই আদর্শ বর্তমানে প্রায় লোপ পেয়েছে - কতকাংশে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে এবং কতকাংশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে। তবে আধুনিককালেও অনেক শিক্ষাবিদ, মানুষের জীনের এই দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি উন্মেষ করাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ, এই ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশসাধন করা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ''A poet's School"-এ তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বলেছেন, ''আমি একান্তভাবে দুটি জিনিসিকে মিলিত করার আকাঙ্ক্ষা করেছি, প্রাচ্য সাধকের অন্তর্ময় দৃষ্টি, যার দ্বারা মনের নির্জনে সে দেখা পায় বিশ্ব আত্মার, আর সেবাকর্মে সেই ধ্যানেরই বহিঃপ্রকাশ যা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা সংকোচের জড়তার মধ্য থেকে জাগিয়ে তোলে সম্পদকে, সৌন্দর্যকে, কল্যাণকে"। স্বামী বিবেকানন্দ শিশুর মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য শিক্ষাকে পরিকল্পিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''Mine also is that infinite ocean of life, of power, of spirituality as yours. Therefore, my brethren, teach the life saving great ennobling, grand doctrine to you children even from their very birth." আধুনিককালের বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনও একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য জাতীয় কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি নয় বা বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধ জাগ্রত করা নয়। তার মতে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল, 'অন্তরের মধ্যে বুদ্ধির অগম্য যে সত্তা বর্তমান, তাকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করা' (Making the individual feel that he has within himself something deeper than intellectm cakk ut spirit if you like)। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (কোঠারি) প্রতিবেদনেও এই দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা

হয়েছে। "In the development that we envisage in the future, we hope that the persuit of mere material affluence and power would be subordinated to that ofhigher values and the fulfilment of the individual. The concept of the mingling of science and spirituality is of special significance for Indian education."। বিভিন্ন চিন্তাবিদগণের বক্তব্য থেকে একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁরা প্রত্যেক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ও উন্নত ধরনের জীবনাদর্শ গঠনের দায়িত্ব শিক্ষার উপর অর্পণ করার পক্ষপাতী। অর্থাৎ, তাঁদের মতে, শিক্ষার একমাত্র চরম লক্ষ্য হবে, শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশে সহায়তা করা।

৩.৭.১.ঙ. শিক্ষার অভিযোজনমূলক লক্ষ্য (Adjustment aim of Education) ঃ

অনেক শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদ শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে, জীববিদ্যার তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রয়োগে প্রয়াসী হয়েছেন। জীবকুলের মৌলিক ধর্ম হল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজনের প্রয়াস। বিবর্তনবাদের (Theory of evolution) মূলে আছে, দুটি নীতি। একটি হল অভিযোজন প্রক্রিয়া (Adjustement process) এবং অপরটি হল প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি (Principle of natural selection)। বিবর্তনবাদে বলা হয়েছে, যে প্রাণী বিবর্তনের স্তরে যত উন্নত, সেই প্রাণী তত সার্থকভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে পারে। যে সমস্ত প্রাণীর অস্তিত্ব পৃথিবীর বুকে এক সময় ছিল অথচ বর্তমান বিলুপ্ত হয়েছে, তারা বাস্তবে তাদের জীবন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে সহায়তা করে। তাই তাঁরা মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার উপযোগী করে প্রস্তুতকরে দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন পরিবেশের সকল উপাদানের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে, সে ব্যাপারে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়াই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার এই লক্ষ্যকে বলা হয় অভিযোজনমূলক লক্ষ্য। চ্যাপমান এবং কাউন্ট (Champman & Count) বলেছেন, "Education as a social process is nothing more than an economical method of assisting as initially ill-adapted individual, during the short period of single life to cope with the ever increasing complexities of the world" অর্থাৎ, শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে তার জীবনের চির পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধানের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

৩.৭.১.চ. শিক্ষার সমন্বয়ী লক্ষ্য (Synthesize aim of education) ঃ

শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা থেকে একটি কথাই স্পষ্টভাবে করা যায় যে তাদের কোনোটি এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকটি শিক্ষার লক্ষ্যেরই কিছু আদর্শগত দিকও আছে। তাই তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো একটিকে যেমন এককভাবে গ্রহণ করা যায় না, তেমনি কোনোটিকেই সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা যায় না। উল্লিখিত শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে, তাদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি হল এই যে, শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিকল্যাণমুখী হওয়া উচিত। জীবিকা অর্জনের দক্ষতা অর্জন, চরিত্র গঠন, আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়ন, সবকিছুই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ, ব্যক্তিকল্যাণ যে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত একথা প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষার লক্ষ্যে স্বীকার করা হয়েছে। তাই ব্যবহারিক দিক থেকে উপযোগী একটি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গেলে, উল্লিখিত লক্ষ্যগুলির প্রত্যেকটিরই গুরুত্বপূর্ণ অংশকে গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তিকল্যাণ যে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত একথা প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষার লক্ষ্যে

স্বীকার করা হয়েছে। তাই ব্যবহারিক দিক থেকে উপযোগী একটি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গেলে, উল্লিখিত লক্ষ্যগুলির প্রত্যেকটিরই গুরুত্বপূর্ণ অংশকে গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তিকে কর্মজীবনে স্বনির্ভর করে দেওয়া, তার বৌদ্ধিক উন্নতিসাধন করা, তাকে সমাজজীবনের যোগ্য করে গড়ে তোলা, তাকে আদর্শ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠতে সহায়তা করা এবং তার আচরণে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন উপযোগী নমনীয়তা সঞ্চার করা, সবগুলিই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ আদর্শ ব্যক্তিজীবন এদের মধ্যে কোনো একটি গুণকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। ব্যক্তিজীবনের সার্বিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার এই জাতীয় লক্ষ্যই কাম্য। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) শিক্ষার এই জাতীয় মিশ্র লক্ষ্যকে বলেছেন, 'পরিপূর্ণ জীবনযাপনের' (Complete living) লক্ষ্য। তাঁর মতে, ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্পেনসার তাঁর এই মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''Education must tell us in what way to treat the body, in what way to manage the affairs, in what way to bring up iur familites, in what way to behave as a citizen, in what way to utilize those resources of happiness which nature supplies, how to use all facilities to great advantage of ourselves and others''। অর্থাৎ, এককথায় বলা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে তার জীবন পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত যথাসময়ে গ্রহণ করতে পারে, সেই অনুযায়ী সকল রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনে তাকে সহায়তা করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৩.৭.২ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Individualistic & Socialistic Aims of Education)ঃ

চিন্তাবিদগণের দ্বারা শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের সচেতন প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার বহু পূর্বে মানব সমাজে যখন শিক্ষার লক্ষ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব হয়নি, সেই সময় থেকেই দেখা গেছে, শিক্ষা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীতে দুটি ভিন্নমুখী উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। কোনো কোনো প্রাচীন সমাজে শিক্ষা পরিকল্পিত হয় ব্যক্তিকল্যাণের উদ্দেশ্যে; আবার কোনো কোনো সমাজে, সমাজ কল্যানের উদ্দেশ্যে। শুধুমাত্র শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ব্যাপারে নয়, শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কী হবে, তার কাজ কী হবে, এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে, এরমক দুটি ভিন্নমুখী মতবাদ প্রচার করেছেন। এই দুই পরস্পর বিপরীত মতবাদের একটিকে বলা হয় ব্যক্তির তান্ত্রিক মতবাদ (Individualistic view) এবং অপরটিকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Socialistic view)। ইতিপূর্বে শিক্ষার লক্ষ্যগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিকে এই দুই মতবাদের যে কোনো একটি অন্তর্ভূক্ত করা যায়। যেমন শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্য ব্যক্তিতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। অন্যদিকে শিক্ষার কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এই দু-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তীকালে প্রধানত দুটি দার্শনিক মতবাদ দ্বারা সমর্থিত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) দ্বারা এবং সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ভাববাদী দর্শন (Idealism) দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। পরবর্তীকালে, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদগণ তাঁদের নিজেদের সমর্থনে, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদির উন্নত তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক জ্ঞান সংগ্রহ করছেন এবং সেগুলিকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। তাদের যুক্তির ধারা পৃথকভাবে অনুশীলন করলে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রবণতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে এবং আধুনিককালের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে, তা নির্ধারণের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

৩.৭.২.ক. শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য (Individualistic aims of education) ঃ

ব্যক্তিতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ব্যক্তিজীবনের উন্নতিসাধন হওয়া উচিত। একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিই সমাজে তার নিজের যোগ্যতা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার উপর অর্পিত সকল রকম দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং, এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বলেন, পরিবেশের বা সমাজের প্রভাব নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির নিজস্ব দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ইত্যাদি সম্ভাবনাগুলির বাস্তবায়নে সহায়তা করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। যে ব্যক্তির জীবনে এই ধরনের সামগ্রিক সার্থকতা এসেছে, তাকেই প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হিসাবে বিবেচনা করা হবে। একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বলেছেন, ''It is the function of education ti develop the ideal prizeman''। শিক্ষার লক্ষ্যসংক্রান্ত এই মতবাদকে বলা হয় ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ। এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদদের কাছে ব্যক্তির চাহিদা সমাজের চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং, আদর্শ প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষায় ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধারণা বা মতবাদ বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন -

১) জীববিজ্ঞানীদের (Bioligists) অভিমত অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষ একেকটি একক সত্তা। প্রত্যেক শিশু তার নিজস্ব পৃথক সত্তা হিসাবে জন্মগ্রহণ করে; প্রত্যেক শিশুর বৈশিষ্ট্য অন্য সকল শিশু থেকে পৃথক। প্রত্যেকেই তার জীবন নতুন এবং পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে। একজন শিশুর চোখের মণির রঙ যেমন বদল করা যায় না, তেমনি তার অন্যান্য প্রকৃতিও পরিবর্তন করা যায় না। শিশুর এই স্বকীয়তাকে বজায় রাখার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। অধ্যাপক থমসন (Thompson) বলেছেন, শিক্ষা ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করে তাকে জীবন সংগ্রামে টিকিয়ে রাখে। ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে বলে, সমাজের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায়। ব্যক্তির জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়। প্রথমে ব্যক্তি পরে সমাজ। সুতরাং, শিক্ষার লক্ষ্য মুখ্য কর্তা বা ব্যক্তির স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ণীত হওয়া উচিত।

২) প্রকৃতিবাদী দার্শনিকগণ (Naturalist) এই মতবাদ প্রচার করেছেন যে, মানুষের সমাজ একটি কলুষিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং, শিক্ষার মাধ্যমে যদি ব্যক্তির, বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিকের বিকাশসাধন করতে হয় তবে তার প্রচেষ্টা সমাজ প্রভাবের বাইরেই করতে হবে। সমাজের সংস্পর্শে এসেই ব্যক্তিজীবন কলুষিত হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর জনজাগরণের নেতা রুশো বলেছেন - ''Every thing is good as it comes from the hands of author of nature but everything degenerates in the hands of man. God makes all thing good. Man meddles them and they become evil''। সুতরাং, ব্যক্তি এবং সমাজ দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণা। তাই মানুষকে একক ব্যক্তি হিসাবে এবং ব্যক্তিকে সামাজিক জীব হিসাবে একই সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায় না। যেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য মহৎ হওয়া উচিত, সেহেতু ব্যক্তিই তার কাছে প্রাধান্য পাবে।

৩) মনোবিদ্যার (Psychology) বিকাশও ব্যক্তিতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে সমর্থন এনে দিয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের (Individual difference) নীতি আধুনিক মনোবিদ্যার একটি সর্বসম্মত নীতি। মনোবিদগণ এই নীতিতে বলেছেন, এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা। দৈহিক, মানসিক উভয় দিক থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদগণ মনোবিদ্যার এই নীতিকে নিজেদের মতবাদের সমর্থন হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিকই হওয়া

উচিত। কারণ, প্রত্যেক শিশু তার একান্ত নিজস্ব স্বতন্ত্র সম্ভাবনা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। শিক্ষার লক্ষ্য হবে, শিশুর সেই স্বাতন্ত্র্যের ধারাকে বজায় রেখে তার জীবন বিকাশে সহায়তা করা।

৪) ভাববাদী (Idealism) দার্শনিকদের তাত্ত্বিক ধারণার মধ্য থেকে ব্যক্তিতান্ত্রিকবাদী চিন্তাবিদগণ তাঁদের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহ করেছেন। ভাববাদীদের মতানুযায়ী প্রত্যেক মানুষই পরমাত্মার অংশ; তার মধ্যে পরম ব্রহ্ম বিদ্যমান। যেমন, বিবেকানন্দ বলেছেন, ''Man is potentiall devine''। শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষের এই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তার বিকাশসাধন করা। এইভাবে বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ টমাস সিল্ড বলেছেন, জৈবিকসত্তাসম্পন্ন শিশুকে ঈশ্বরের সন্তানে পরিবর্তিত করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য (Educatio aims at transforming a child of flesh into a child of god.)। শিক্ষা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক বোধের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে না। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই পরমাত্মায় (Absolute) শামিল করা।

৫) আবার প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের (Pragmatists) মতে, যুগে যুগে মানব সভ্যতার যে বিকাশ ঘটেছে তার মূলে আছে বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের অবদান। তাঁদের এই ধারনা অনুযায়ী, নিউটন, আইনস্টাইন প্রভৃতির মতো বৈজ্ঞানিক, কবির, রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো ধর্মীয় গুরু, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মতো সমাজ সংস্কারক যদি পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত না হতেন, তাহলে মানুষের সমাজের এত উন্নতি হত না। আধুনিককালে যদিও প্রয়োগবাদী শিক্ষাদার্শনিক, শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, তবুও প্রারম্ভিক পর্যায়ে লক্ষ করা যায়, তাদের পক্ষপাত ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের প্রতিই ছিল। আর সেই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বাস করা হত, ব্যক্তি বিশেষে উন্নতিসাধন করতে না পারলে, সমাজের উন্নতি করা সম্ভব নয়। ব্যক্তির মাধ্যমেই সমাজের উন্নতি হবে। সুতরাং, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তির বা শিশুর উন্নতিসাধন করা।

শিক্ষার এই ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এইসব যুক্তি একপক্ষীয়। ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদগণ তাঁদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে, অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধারণাগুলিকে সংকীর্ণ তাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন। চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদকে যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, তার মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে, এবং তা কখনওই আদর্শ-শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হতে পারে না। এই মতবাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির উল্লেখ করলে, এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

প্রথমত, একথা সকল শিক্ষাবিদ স্বীকার করবেন যে অত্যধিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপরায়ণ করে তুলবে। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে অনেক সদগুণ সংযোজিত হয়, যেগুলি ব্যক্তির পক্ষে একক বিচ্ছিন্ন জীবনে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের সপক্ষে প্রকৃতিবাদের (Naturalism) যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তার অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ ব্যক্তিজীবনের সুস্থ এবং স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে। বিশেষভাবে প্রকৃতিবাদে ব্যক্তিকে যে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা নৈতিক শিক্ষার (Moral education) ক্ষেত্রে চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা আনতে পারে। শিক্ষার্থীর বর্তমান জীবন পরিস্থিতিতে সেই আশঙ্কাই বেশি।

দ্বিতীয়ত, জীববিজ্ঞানের (Biology) যে নীতিকে ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে, তাকে কু-প্রয়োগ বা আংশিক প্রয়োগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্যেক মানুষই এক-একটি সত্তা এবং স্ব-স্বাধীন (Autonomous) জৈবিক একক (Biological unit) এ কথা জীববিজ্ঞাণীগণ প্রচার করলেও, মানুষের ব্যক্তিগত গুণাবলি নির্ধারণে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের গুরুত্বকে তাঁরা কখনওই অস্বীকার করেননি। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection), তাও যে জীবন পরিবেশ নির্ভর, সে কথা অস্বীকার করলে, ওই নীতির ভুল ব্যাখ্যা করা হবে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হতে পারে না। এই বিষয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তিরজীবন পরিবেশকেও (Environment) বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের সপক্ষে প্রয়োগবাদীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, মহৎ বা উন্নত ব্যক্তিদের আবির্ভাব ও অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানবসভ্যতা ব্যক্তিজীবনের প্রচেষ্টাই গড়ে উঠেছে; সুতরাং, শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিকেই পরিচর্যা করা। কিন্তু একটুতে গভীরভাবে বিচার করলে বলা যায়, যে সকল মনীষী সভ্যতার অগ্রগতিতে সহায়তা করেছেন, তাঁরা কেউই সমাজ প্রভাব মুক্ত ছিলেন না। তাঁরা সমাজের অতীত সংস্কৃতির সার্থক অধিকারী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই সমাজ কল্যাণসাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের এই সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠার পিছনে ব্যক্তিতান্ত্রিক মানসিকতার কোনো ভূমিকা ছিল না। আর তা থাকলে তাঁরা কোনোদিন মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে উৎসাহী হতে পারতেন না।

চতুর্থত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individuality) যে জীবজগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু, শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির সেই স্বাতন্ত্র্যকে সমাযোপযোগী রূপ দেওয়া। বিশিষ্ট মনোবিদ রস (Ross) বলেছেন "By individuality we have in mind, ideal not yet attained, the attainment of which is the end not only of eduaction but of life." সুতরাং, মনোবিদ্যার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতির বিশুদ্ধ প্রয়োগ, শিক্ষার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষাই এমন এক প্রক্রিয়া বা ব্যক্তির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিকাশে সহায়তা করতে পারে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত স্বাতন্ত্র্য নয়, পরিণত বিচারবুদ্ধির আলোকে বিকশিত স্বাতন্ত্র্যই ব্যক্তিজীবনে কাম্য। আর তার বিকাশ সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব।

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের অনেক দোষত্রুটি আছে, শিক্ষার যে কোনো লক্ষ্য নির্বাচন করাই হোক না তার মূল তাৎপর্য ব্যক্তির জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার বাইরে কিছু হতে পারে না। শিক্ষার চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য সে ব্যাপারে সার্বিকভাবে সহায়তা করতে পারে না। বরং এই ধরনের শিক্ষার লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনের স্বাভাবিক সুষম বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে। তার চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য বর্তমানে শিক্ষাবিদগণের দ্বারা পূর্ণ সমর্থন লাভ করেনি।

৩.৭.২.খ. শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য (Socialistic aims of education) :

ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের ঠিক এক বিপরীত মতবাদ, শিক্ষার লক্ষ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদদের মধ্যে দেখা গেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধারণভাবে বলা হয় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Socialistic view point)। এই মতবাদে যাঁরা আস্থা প্রকাশ করেন, তাঁরা বলেন, মানুষের একক জীবন একসময় অসহ্য হয়ে উঠেছিল বলেই তারা একদিন সমাজ গড়ে তুলেছিল। যেদিন থেকে মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে, সেদিন

থেকে সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়নি। ব্যক্তিসত্তার সকল রকম নিরাপত্তা সমাজজীবনের নিরাপত্তার উপর নির্ভর করে। তাই সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষারও লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজের কল্যাণ-সাধন হলে স্বাভাবিকভাবে বক্যক্তিজীবনও পরিপুষ্ট হবে। তার কারণ, ব্যক্তি সমাজেরই একক সত্তা। সুতরাং, শিক্ষাকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে। যার মাধ্যমে সমাজজীবনের সামগ্রিক কল্যাণ-সাধিত হবে। শিক্ষার এই সমাজতান্ত্রিক মতবাদ জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hagel)-এর রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের (Political theory) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

সমাজবিজ্ঞানের (Sociology) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদগণ বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সিদ্ধান্তের উপর এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেন। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ যেদিন সহমতের ফলে সমাজ গড়ে তুলেছিল, সেদিন থেকে সমাজের মধ্যে জীবনযাপনের জন্য কিছু নিয়মাবলিও সৃষ্টি করেছিল। দল বা সমষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই জাতীয় নিয়ম বা অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রত্যেক সমাজেরই এরকম কিছু নিয়ম থাকে। সেইসব নিয়ম লিখিত বা অলিখিত দু-ধরনের হতে পারে। আবার, সমাজ অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ যাতে ওইসব নিয়মশৃঙ্খলা অনুসরণ করে, সে বিষয়ে তদারকি করার জন্য সমাজের মধ্যেই কিছু সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এই সংস্থাগুলি নিজ নিজ কৌশল প্রয়োগ করে সমাজ অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; যে সংস্থাগুলি সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত তাদের সমাজবিজ্ঞানীগণ নাম দিয়েছেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্থা (Institution of social control) এবং যে কৌশলগুলির দ্বারা ওই সংস্থাগুলি, মানুষের আচরণকে সমাজ অনুকূল করার চেষ্টা করে তাদের বলেছেন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কৌশল (Means of social control)। সমাজবিজ্ঞানের এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সমর্থক শিক্ষাবিদটগণ বলেছেন, প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষালয়গুলি এক-একটি সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং শিক্ষা হল কৌশল যার মাধ্যমে সেগুলি ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, এই ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা হল এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কৌশল। অর্থাৎ, শিক্ষার লক্ষ্য সামাজিক চাহিদাকেন্দ্রিক। সমাজের চাহিদা মেটানোর জন্যই শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত সামাজিক কল্যাণসাধন করা। যেমন, শিক্ষাবিদ রোজেনক্রানস (Rosemkrans) বলেছেন, ''ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রক্রিয়াই হল শিক্ষা (Education is the process by which the individual man elevates himself to the social)''। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ দার্শনিক জন ডিউই আধুনিক সমন্বয়ী মতবাদের প্রবক্তা হলেও অনেক ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার এই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে সমর্থন করেছেন। তিনি এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, ''All education proceeds by participation of the individual in the social consciousness of the race.''।

শিক্ষার এই ধরনের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও একক ধরনের এই জাতীয় চরম দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করার কিছু অসুবিধা আছে। কারণ, শিক্ষার এই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের যথেষ্ট ত্রুটি আছে এবং তার সে ত্রুটিগুলি সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে কলুষিত করতে পারে এমনকি সমাজের কল্যাণকেও অপূর্ণ রাখতে পারে। আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার এই লক্ষ্যের যে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি তাই বিচার করার প্রয়োজন।

১) শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য স্থাপনের যাঁরা পক্ষপাতী তাঁরা সমাজের চাহিদার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন ব্যক্তি চাহিদাকে সমপূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু, মনোবিদগণ মনুষ্য প্রকৃতি অনুশীলনের ভিত্তিতে

এই সিদ্ধানে উপনীত হয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির তার একান্তই নিজস্ব কতকগুলি জৈব মানসিক প্রবণতার অধিকারী। তার সেই ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ ও চাহিদাগুলিকে অগ্রাহ্য করে, তাকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করলে সমাজকল্যাণ সাধিত হওয়া তো দূরের কথা, সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা ও আলোডনেরই সৃষ্টি হবে। সুতরাং, শিক্ষার এই ধরনের সমাজ কল্যাণমূলক লক্ষ্যে ব্যক্তির নিজস্বতাকে অস্বীকার করে আদৌ পৌঁছানো সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ।

২) শিক্ষার এই মতবাদ অনুযায়ী সকল ব্যক্তিকে সমাজাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে গতানুগতিক প্রথায় শিক্ষা দিয়ে একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, ব্যক্তির নিজস্ব সৃজন প্রতিভাকে (Creative avility) বিকশিত করা সম্ভব হবে না। সমাজবিজ্ঞানীগণ নিজেরাই স্বীকার করেছেন, যে পর্যন্ত না সামাজিক ব্যক্তি সৃজনাত্মকভাবে সামাজিক ক্রিয়ার অংশগ্রহণ করতে পারছে, যে পর্যন্ত সামাজিক অগ্রগতি (Social progress) কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং, তাঁদেরই যুক্তির সূত্র ধরে বলা যায়, শিক্ষার চরম সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সামাজিক অগ্রগতির প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে সমাজকে স্থবির করে দেবে।

৩) আধুনিক সমাজব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল দেশেই শিক্ষার বেশির ভাগ দায়িত্ব রাষ্ট্র (State) বা সংগঠিত সমাজই গ্রহণ করে থাকে। আবার রাষ্ট্রনায়কগণ রাষ্ট্র পরিচালনর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমাজদর্শন (Social philosophy) অনুসরণ করে থাকেন। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপরিচালিত শিক্ষার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রনায়কদের বা শাসকগোষ্ঠীর মতাদর্শের দ্বারাই নির্ণীত হয়, তা তাঁরা একনায়কতন্ত্রে বা গণতন্ত্রে যে কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী হোক না কেন। সুতরাং, এই জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যে একটি বিশেষ মতাদর্শ আরোপের সুযোগ থেকে যায়। আর এই আরোপিত মতাদর্শ সমাজ অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে কল্যাণময় হয়ে উঠবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে, শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে একটি আদর্শ ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারে না। সমাজকল্যাণের লক্ষ্যাভিমুখী শিক্ষা ব্যক্তি-কল্যাণকেই শুধু উপেক্ষা করে তা নয়, সামাজিক কল্যাণেও আসে না। কারণ, এই জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে সমাজজীবনের গতানুগতিকতা কে বজায় থাকতে পারে, সামাজিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয় আর যে সমাজের অগ্রগতি নেই, সে সমাজ মৃত। তাই শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের মতো চরম সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যও বর্জনীয়।

৩.৭.২.গ. ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সমন্বয় (Synthesis of Individualistie & Socialistic ideals) ঃ

শিক্ষাদর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সময়ে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদগণ ব্যক্তিতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক, যে কোনো একটি মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। গ্রিসের নগররাষ্ট্র এথেন্সে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিতান্ত্রিক। প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার লক্ষ্যও ছিল চরমভাবে ব্যক্তিতান্ত্রিক। এইসব প্রাচীন সভ্যতায়, ব্যক্তিমনকে শুদ্ধ জ্ঞান সমৃদ্ধ করে, তার আত্মোপলব্ধির (Self-realisation) মাধ্যমে জীবনের উন্নতিসাধন করাই ছিল শিক্ষার মূল লক্ষ্য। আবার, প্রাচীন স্পার্টা রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে। রাষ্ট্ররক্ষা ও রাজ্যসীমা বৃদ্ধির জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ সামরিক বাহিনীর; তাই তাদের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সৈনিক

তৈরি করা। প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামাজিক উন্নতির জন্য সব বিষয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ছিল। এমনিভাবে বিভিন্ন প্রাচীন সমাজের বা রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে দুটি বিপরীত ধর্মী মতাদর্শের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি পরবর্তীকালেও তাদের বিচ্ছিন্ন প্রভাব দীর্ঘদিন লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদগণ এবং দার্শনিকগণ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই দুটি বিপরীতধর্মী মতাদর্শের কোনি একটির দ্বারা এককভাবে প্রভাবিত হননি, বরং বলা যায়, তাঁরা এই দুটি মতাদর্শের চরমভাবকে বর্জনই করেছেন। কারণ, তাঁরা এই সত্যটি উপলব্ধি করেছে যে, চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যক্তিকে স্বার্থপরায়ণ এবং আত্মকেন্দ্রিক করে তুলবে; আর চরম সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব যে গুনাবলি আছে, সেগুলির সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। তাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে পৃথিবীর সকল দেশের প্রায় সকল শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাদার্শনিক চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকেন।

১) আধুনিককালে শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদগণ মনে করে, বাস্তবে শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের মধ্যে বিরোধের কোনো অবকাশ নেই। আসলে তাদের মধ্যে যে আপত বিরোধ সৃষ্টি হয়, তার মূল কারণ কিন্তু ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে মানুষের আংশিক বা অসম্পূর্ণ ধারণা। মানুষের জীবনের দুটি দিকই বাস্তব। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা (Need), অনুরাগ (Interest), বিশেষ ক্ষমতা (Abilities), ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি সবকিছু থাকে। এটিই তার ব্যক্তিগত দিক। কিন্তু, একই সঙ্গে তার জীবনের আর একটি দিকও আছে। কোনো ব্যক্তিই একক বা নিঃসঙ্গ নয়। সে সমাজ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে এবং সমাজ পরিবেশের মধ্যেই বৃদ্ধিলাভ করে। এটিই তার জীবনের সামাজিকতার দিক। সে সমাজের বৃহত্তর অঙ্গেরই একটি একক সত্তা। শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলি, ব্যক্তিজীবনের বিকাশের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। অন্যদিকে শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলি সমাজ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে বড়ো করে দেখেছে। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের একান্ত নিজস্ব দিক এবং তার সামাজিক দিক তার অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কযুক্ত। কোনো একটি বাদ দিয়ে, তার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তাই আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, ব্যক্তিজীবনের এই দুটি দিকের মধ্যে কোনো একটির গুরুত্ব কম নয়। তারা পরস্পর বিরোধী তো নয়ই; বরং পরস্পর নির্ভরশীল। এই কারণে শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে দুটি মতাদর্শের সার্থক সমন্বয় ঘটানো একান্তভাবে প্রয়োজন।

২) ব্যক্তি তার নিজস্ব কতকগুলি চাহিদা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে একথা ঠিক। পরবর্তীতে তার একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তার মধ্যে আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিও সঞ্চারিত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, প্রত্যেক মানবশিশু জন্মাবস্থায় একান্তই অসহায় থাকে। তার জীবনধারণের জন্য এবং জন্মগত সম্ভাবনাগুলি বিকশিত করার জন্য বয়স্কদের বা বৃহত্তর অর্থে সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন। সমাজে পরিবেশের মধ্যে বা পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে সে যদি আশ্রয় না পায়, তাহলে বিকাশ তো দূরের কথা, তার অস্তিত্ব বজায় রাখাই সম্ভব নয়। শিক্ষার লক্ষ্যকে যদি ব্যক্তিতান্ত্রিক মতাদর্শ মেনে নিয়ে একমাত্র ব্যক্তি কল্যাণকেই ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও বলতে হয় সেই ব্যক্তিকল্যাণ সমাজ পরিবেশের বাইরে হতে পারে না। জীবধর্মের নিয়মই হল - তার বিকাশ হয় নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ার মধ্যে। বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য দরকার হয় উপযুক্ত পরিমাণ বায়ু, জল ও তাপ। তেমনি ব্যক্তিজীবনের সম্ভাবনাগুলি

বিকাশের জন্যও দরকার যথার্থ পরিবেশের। সেই পরিবেশগত উপাদান জোগায় সমাজ। তাই ব্যক্তিজীবন সমাজ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন কোনো ধারণা নয়, তার উপর নির্ভরশীল। 'ব্যক্তি তার জীবন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আহার সংগ্রহ করে সমাজ থেকে' - দার্শনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষাবিদ রেমন্ট (Raymount) বলেছেন, ''The isolated individual is a figment of the imagination'' রবীন্দ্রনাথও তাঁর শান্তিনিকেতন-এ বলেছেন, ''মানুষের কাছে কেবল জগৎ-প্রকৃতি নয়, সমাজ প্রকৃতি বলে আর একটা আশ্রয় আছে, মানুষকে একই সঙ্গে দুই ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য যে তারই সামঞ্জস্যের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়''। শিক্ষাই এই সামঞ্জস্য সাধনায় ব্যক্তিকে সহায়তা করতে পারে।

৩) আবার, সামজজীবনের দিক থেকে বিচার করলেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। ব্যক্তি ছাড়া সমাজের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কতকগুলি সচেতন এবং সক্রিয় ব্যক্তির সমবায়ই হল সমাজ। সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে। এই ব্যক্তির বিশেষ অনুভূতি অন্যান্যদের মধ্যে মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেকটি ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া, সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতি হতে পারে না। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যত উন্নত হবে, সমাজও ততই উন্নত হবে। প্রয়োগবাদী দর্শনে (Pragnatic Philosophy) যে দাবি করা হয়েছে, মনুষ্য সমাজের উন্নতির জন্য কীর্তিমান ব্যক্তিরাই দায়ী, একথা অনেকাংশে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তবে বর্তমানে পৃথিবীতে যে সকল সমাজ উন্নয়নের শিখরে উঠেছে, তাদের মূলে আছে সমাজ অন্তর্গত ব্যক্তিদেরই প্রচেষ্টা। সুতরাং, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সমাজকল্যাণের জন্য ব্যক্তিকল্যাণ একান্তভাবে প্রয়োজন। অর্থাৎ, সমাজজীবন, ব্যক্তিজীবনের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদগণের বিশ্লেষণ থেকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে, ব্যক্তিজীবনের বিকাশ যেমন সমাজজীবনের উপর নির্ভরশীল, তেমনি সমাজজীবনের উন্নয়নও ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যের কল্যাণ সম্ভব নয়। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ তখনই সম্ভব হবে, যদি সে অনুকূল সমাজ পরিবেশের উদ্দীপনা লাভ কর; আবার সমাজের চরম উন্নতি তখনই সাধিত হবে যখন সমাজ অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকশিত হয়ে উঠবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাস্ক (Rusk) বলেছেন, ''Individuality is of no value and personality is a meaningless term apart from the social environmenr in which they are developed and made mainfest. Self-relization can be achiveved only through social service and the social ideas of real value can come into begon only through free individuals who have developed valuable individuality''। মানুষের জীবনের এই দুটি দিকের কথা সমান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার জন্য এমন লক্ষ্য স্থির করেন, যার মাধ্যমে ব্যক্তিকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ উভয়ই সাধিত হয়। আধুনিক চিন্তাবিদও শিক্ষাবিদগণের দ্বারা নির্ধারিত এরকম কয়েকটি শিক্ষার লক্ষ্যের উল্লেখ করলে, এই সমন্বয়ী প্রবণতাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন -

১) জন ডিউই বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির সেই সমস্ত সম্ভাবনা বা ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা, যেগুলির সহায়তায় সে তার জীবন পরিবেশের সকল উপাদানকে আয়ত্তের মধ্যে এনে পরিপূর্ণভাবে

জীবনের দায়িত্ব পালন করতে পারে (Education is development of all those capacities in the individual which will enable him to control him to control his environment and fulfil his reponsibilities.)। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে তিনি দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন - একটি হল ব্যক্তির বিকাশ এবং অপরটি হল তার দায়িত্ব সম্পাদন। দায়িত্ব সম্পাদন বলতে তিনি বিশেষভাবে সামাজিক যোগ্যতা অর্জন করাকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, ডিউইর মতানুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর বিকাশ বা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং তাকে সামাজিক সকল রকম দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে প্রস্তুত করে দেওয়া। শেষক্ত পর্যায়ের ফলস্বরূপ স্বাভাবিকভাবে সামাজিক কল্যাণসাধিত হবে, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। সুতরাং, শিক্ষার এই আধুনিক লক্ষ্য, ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

২) স্যার পার্শি নান (Nunn) আধুনিককালের আর এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তিনিও শিক্ষার লক্ষ্য স্থাপনে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি মানুষের জীবনের এই ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিকের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, ''ব্যক্তির যে আচরণকে আপাত স্পষ্টভাবে সামাজিক আচরণ বলে মনে হয় তার মূলেও একটি অহংভাব কাজ করে। আবার যে ব্যক্তিকে তাঁর নিজগুণের জন্য আপাতভাবে সৃজনশীল মনে হয়, তাঁকেও সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাঁর সমাজ পরিবেশকে জানার দরকার (The most clearly 'social' conduct implies a strong 'self behind it. The most original personality is unintelligible apart from the social medium in which it grows.)। এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নান (Nunn) শিক্ষার লক্ষ্য হিসাব যা স্থির করেছেন, তাতে ব্যক্তির বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও সামাজিক প্রভাবের গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয়নি। তিনি বলেছেন ''Education efforts must be limited to seciringfor everyone the conditions under which individuality is most ocmpletely developed, - that is to enable him to make his original contribution to the variegated whole of human life as fully as truly characteristic as his nature permits.'' শিক্ষার লক্ষ্য হবে, ব্যক্তির জন্য এমন এক পরিবেশ রচনা করা যার মধ্যে সে তার স্বাতন্ত্র্যকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশের সুযোগ পেয়ে তার সাধ্যমত সামাজিক জীবন নিজস্ব স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে। এই বক্তব্যের মধ্যে দুটি শব্দ-কন্ডিশন (Condition) এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individuality) বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি এখানে 'কন্ডিশন' বলতে যে জীবন পরিবেশ বা সমাজ পরিবেশকে বোঝাতে চেয়েছেন, তা তাঁর পরবর্তী বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে। তাছাড়া, তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত অন্যান্য বিভিন্ন আলোচনায় তিনি প্রতিটি শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলি বিকাশের সঙ্গে তাদের সামাজিক গুণাবলি বিকাশেরও সুযোগ পায়। অর্থাৎ, তাঁর মতে শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হলেও তার বিকাশ সামাজিক পটভূমিতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইভাবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হলেও তার বিকাশ সামাজিক পটভূমিতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইভাবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে অধ্যাপক নান, ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেছেন।

৩) স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনায় শিক্ষার তাৎপর্য ও লক্ষ্য হিসাবে যে সকল মন্তব্য করেছেন, তাতে লক্ষ্য করা যায় তিনি ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সমন্বয়সাধন করেছেন। তিনি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে তার সমাজচেতনার

সমন্বয় করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''The end of all education, all training should be man making'' অর্থাৎ, শিক্ষার লক্ষ্য মুষ্যত্বের বিকাশ (Man making)। তিনি বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য, শুধু শিক্ষার্থীর সামনে কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করা নয় বা তাকে কতকগুলি তথ্য হজম করানো হয়। শিক্ষার্থীর শক্তিকে যথার্থভাবে সামাজিক কল্যাণের উপযোগী করে বিকশিত করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ, মনুষত্ব বিকাশের শিক্ষা বলতে তিনি ব্যক্তিকল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণকে একত্রে বোঝাতে চেয়েছেন।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে যে কয়েকটি লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হল সেগুলির প্রত্যেকটিতে ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনিভাবে আরো বহু আধুনিক শিক্ষাবিদ দ্বারা প্রস্তাবিত শিক্ষার লক্ষ্যগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তাতে এই আলোচনা দীর্ঘতম হবে মাত্র। কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একই সমন্বয়ী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, এই সমন্বয়ীধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুখ্য প্রবণতা। এই প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বলা যায়, শিক্ষার্থীর সকলরকম সম্ভাবনা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির সমাজ-কল্যাণ অভিমুখী বিকাশে সহায়তা করাই হবে সাধারণভাবে আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য (The aim of education in genera; is to help pupil to develop his possibilities and characteristics directed towards social welfare.)। এই সাধারণ নীতি অনুসরণ করে, যে কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ, নিজ নিজ রাষ্ট্রের বা সমাজের প্রত্যাশিত কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের শিক্ষার লক্ষ্যকে বিশেষিত করতে সক্ষম হবেন।

৩.৭.২.ঘ. জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮) ঃ

জাতীয় শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার পর জাতীয় সরকার ১৯৬৮ সালে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশ করেন। ভারতীয় পার্লিয়ামেণ্ট অনুমোদিত এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে, 'ভারতের জন্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যার লক্ষ্য হবে' - ১) ভারতীয় সমাজকে সংবিধান বর্ণিত ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা দানের নীতির ভিত্তিতে আকাঙ্ক্ষিত নতুন সমাজে রূপান্তরিত করা (Accelerate the transformation of existing social system into a new one, base on the principles of Justice, Equality, Liberty and Dignity of individual, enshrined in the constitution of India)। ২) প্রত্যেক শিশুনাগরিকে পর্যাপ্ত এবং সমসুযোগ প্রদান করে, তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা বিকাশে সহায়তা করা (Provide adequate and equal opportunity to every child and help him to develop his personality to the fullest)। ৩) দেশের ভাবী নাগরিকদের জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা (Make the rising generation conscious of the fundamental unity of the country) এবং ৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মনে নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা (Emphasise Science and Technology and the cultivaton of moral, social and spiritual values)। এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে গৃহীত ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্যগুলি, শিক্ষা কমিশন নির্ধারিত লক্ষ্যেরই অনুরূপ। তবে শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে এই লক্ষ্যগুলিকে যত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই শিক্ষানীতির ভাষায় সেই স্পষ্ট তার অভাব দেখা যায়।

গতিশীল সমাজে শিক্ষাও গতিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই জাতীয় সরকার ১৯৬৮ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তার মূল্যায়নের প্রয়াসে ১৯৮৫ সালে

'Chalange of Education : Policy perspective' নামে একটি আলোচনাপত্র প্রকাশ করেন। এই আলোচনাপত্রে, ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মূলত যে সমস্ত সমস্যা থেকে গেছে, সেগুলি তুলে ধরা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এই আলোচনাপত্রের উপর দেশের অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এইসব অভিমতের ভিত্তিতে এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থার মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার ১৯৮৬ সালে নতুন এক শিক্ষানীতি (National policy of Education, 1986) ঘোষণা করেন। এই শিক্ষানীতির সঙ্গে পূর্ববর্তী জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) মৌলিক কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তবে ওই নতুন শিক্ষানীতিতে, পূর্ববর্তী শিক্ষানীতি অনুযায়ী যে সমস্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি রচনার ক্ষেত্রেও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শে জাতীয় সরকার ভারতের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির (Socio-economic condition) পর্যালোচনা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এক সংকট মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অত্যধিক তত্ত্ব নির্ভরতা এবং বৃদ্ধির হার কোনোটিই, আধুনিক ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপযোগী নয়। তাই এই শিক্ষানীতি পূর্ববর্তী জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত সকল লক্ষ্যগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করেও জাতীয় সরকার শিক্ষাকে রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক চাহিদার উপযোগী করে তোলার উপর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে - ''Eduction is a unique investment in the present and the furture. This cardinal principle is the key to the national policy on Education.'' অর্থাৎ, 'শিক্ষা' বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় সমাজের জন্য এক ধরনের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ। সুতরাং, যে কোনো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন বিনিয়োগকারী সংস্থার কিছু মুনাফার প্রত্যাশা থাকে, তেমনি শিক্ষার কাছেও ভারতীয় সমাজের কিছু প্রত্যাশা আছে। এই প্রত্যাশা হল, প্রয়োজনানুযায়ী বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত মানবসম্পদ সৃষ্টি। অর্থাৎ, সংক্ষেপে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল - ভারতীয় সমাজের চাহিদা অনুযায়ী মানবসম্পদের বিকাশ (Human resource development)।

ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্যের বিবর্তন-সম্পর্কিত এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে, বর্তমানকাল পর্যন্ত এই বিবর্তনের ধারা অব্যাহত থেকে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে গতি সঞ্চার করে চলেছে। শিক্ষার এই লক্ষ্যের বিবর্তন ভারতীয় সমাজে কখনও স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছে আবার কখনও বহিঃআরোপিত বলের (Imposed external force) প্রভাবে ঘটেছে। যখনই ভারতীয় শিক্ষা, বহিঃআরোপিত লক্ষ্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, তখনই শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে সামগ্রিক বিশৃঙ্খলা। কিন্তু ভারতীয় সমাজ খুব অল্প সময়কালের মধ্যেই এক বিশৃঙ্খলাকে দূর করতে সক্ষম হয়েছে, শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে। বিবর্তনের এই ধারায় বিশেষভাবে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রায় প্রতি পর্যায়েই শিক্ষার লক্ষ্য স্থাপন করতে গিয়ে, চিন্তাবিদগণ ব্যক্তিকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণের আদর্শের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেও গেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে, ভারতীয় শিক্ষার যে লক্ষ্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে আবার, আর্থসামাজিক চাহিদার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদার সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। তাই আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্যের বিবর্তন সকল পর্যায়েই সমন্বয়ের পথে হয়েছে এবং সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে, এমন এক সম্পদসৃষ্টির কাজে কেন্দ্রীভূত হয়েছে যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের দিকে কাম্য। এটি হল মানবীয় ও সামাজিক গুণে সমৃদ্ধ মানবসম্পদ।

৩.৭.৩ শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি (Objectives of Education) ঃ

শিক্ষা, প্রথাগত বা অপ্রথাগত যে কোনো রূপেই সংঘটিত হোক না কেন, তা যে চেষ্টিত প্রক্রিয়া, এ বিষয়ে আধুনিক চিন্তাবিদদের মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আর একথাও সত্য যে মানুষের যে কোনো সচেতন চেষ্টিত প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার মূলে, তার কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে সকল চিন্তাবিদ শিক্ষা প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক ও আদর্শগত দিকটিকে প্রাধান্য দিতে চান, তাঁরা বিশেষভাবে শিক্ষার চরম লক্ষ্য (Ultimate aim of education) কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, যে কোনো দেশে বা সমাজে প্রথাগত শিক্ষার লক্ষ্যগুলি সমাজ-মুখ্যদের দ্বারা অথবা দার্শনিকদের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যেহেতু বিভিন্ন সমাজের আর্দশ ভিন্ন এবং বিভিন্ন দার্শনিকদের জীবনাদর্শ ভিন্ন সেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। আবার, যেহেতু জীবনাদর্শগুলি খুবই ব্যাপক সেহেতু, শিক্ষার লক্ষ্যগুলিও হয় খুবই ব্যাপক। আর এই শিক্ষার লক্ষ্যগুলি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে তাদের দৈনন্দিন কাজে সব সময় উৎসাহিত করতে পারে না। এই কারনে আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার কিছু বস্তুধর্মী লক্ষ্য নির্ধারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এই বস্তুধর্মী শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে বলা হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objective of education)। বর্তমান অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্যগুলি কী সে বিষয়ে আলোচনা করা হল।

সাধারণভাবে বলা যায়, শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষার্থীর জীবনের কোনো একটি দিকের বা সামগ্রিকভাবে জীবনের উন্নতি বা অগ্রগতি হয়। শিক্ষার্থীর এই অগ্রগতিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে তার শিখন (Learning)। মনোবিদগণ বলেছেন, শিখন একধরনের ব্যক্তিনির্ভর চেষ্টিত মানসিক প্রক্রিয়া। স্বাভাবিকভাবে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার পর, কিছু ফল শিক্ষার্থী লাভ করে। শিক্ষাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষার সহায়ক প্রক্রিয়া হিসাবে শিখনলব্ধ ফলগুলিও (Learning outcomes) উন্নত পর্যায়ের হওয়া বাঞ্চনীয়। অর্থাৎ, শিখনের ফলগুলি অগ্রমুখী। এইভাবে শিখন প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে অগ্রমুখী ফল পাওয়া যায় তাদেরই শিক্ষাবিজ্ঞানে বলা হয় শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি (Educational objectives)। শিক্ষাবিদগণ বলেছেন - "Educational objectives are goals towards which pupils progress"। অর্থাৎ, শিখনের প্রভাবে শিক্ষার্থীর যে সকল লক্ষ্যাভিমুখী অগ্রগতি হয়, সেগুলিই হল শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি। সুতরাং, শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কতকগুলি শিখন ফলশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়। তাই অনেক শিক্ষাবিদ সামগ্রিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, নির্দেশ করার জন্য এগুলিকে শিখনের উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণনা করে থাকেন।

শিক্ষাবিজ্ঞানে, 'শিক্ষার লক্ষ্য' এবং 'শিক্ষার উদ্দেশ্য' এই দুটি ধারনাই ব্যবহার করায়, অনেক সময় তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তাই শিখন উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচান প্রসঙ্গে তাদের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যের ধারণাগত পার্থক্য কোথায় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা যেহেতু সচেতন চেষ্টিত প্রক্রিয়া, সেহেতু তার লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। এই কারণে শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদগণ শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করেন। এই লক্ষ্য (Aim) সামগ্রিকভাবে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। অন্যদিকে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি শিখন প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হওয়ায়, এগুলি বিশেষ শিখনপ্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। সুতরাং, সাধারণভাবে বলা যায় শিখনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে সেগুলিকে লক্ষ্য বলা হয়, সেগুলিকেই শিখন পরবর্তীকালে উদ্দেশ্য বলা হয়। আবার শিক্ষার লক্ষ্যগুলি হয় সাধারণধর্মী। কারণ শিক্ষার

লক্ষ্য বিশেষভাবে সামগ্রিক শিক্ষাকর্মসূচির দিক নির্ধারণ করে থাকে। অন্যদিকে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বিশেষ শিখন (Learning) বা শিক্ষণ (Teaching) প্রচেষ্টার দিকে নির্ধারণ করে থাকে। তাই এই উদ্দেশ্যগুলি বিশেষধর্মী ও সংকীর্ণ। এই দিকে থেকে বিচার করে বলা যায়, শিক্ষার এক একটি লক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করলে তার অনেকগুলি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা সম্ভব। শিক্ষার লক্ষ্যগুলি সাধারণত নির্ধারণ করে থাকেন শিক্ষাদার্শনিক অথবা, শিক্ষাবিদগণ। ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ যে আদর্শগুলি একান্তভাবে কাম্য, সেগুলিকে প্রস্ফুটিত করে তোলার ব্যাপারেই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেই কাজ করে থাকেন এমন ব্যক্তিগণ যাঁরা শিক্ষণের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন। অন্যদিকে, শিক্ষণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ, শিক্ষকগণ শিক্ষণ পরিস্থিতির বা শিখন পরিস্থিতির প্রত্যাশিত ফলাফল গুলিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত করেন। ফলে, শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতি নির্দেশ করতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে এগুলি আচরণধর্মী। শিখনের প্রভাবে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, শিখনের ফলস্বরূপ কতকগুলি আচরণগত পরিবর্তন শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা যায়। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি, শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যাশিত আচরণগত পরিবর্তনের ভিত্তিতেই স্থাপন করা হয়। এই কারণে, শিখন উদ্দেশ্যগুলি একদিকে যেমন শিখনকৌশল নির্বাচনে সহায়তা করে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়নে সহায়তা করে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যের পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্যের (Objective of Education) বা শিখন উদ্দেশ্যের (Learning objective) যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হল - (১) শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি এক একটি শিখন-ফলশ্রুতি (Learning outcome) ;(২) শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যাশিত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুধর্মী (Objective in terms of pupils behaviours); (৩) শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বিশেষধর্মী (Specific); (৪) শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি, শিক্ষার লক্ষ্যের পথে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির নির্দেশক। সুতরাং, শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি হল, শিখন-শিক্ষণ পরিস্থিতির অন্তর্গত এমন কতকগুলি বিশেষধর্মি আচরণগত শিখন-ফলশ্রুতি যেগুলি শিক্ষার লক্ষ্যমুখী অগ্রগতিকে নিশ্চিত করে (Educational objectives are specific behavioural learning outcomes in teaching learning situation and which ensure progress towards goals of education)।

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও শিক্ষার লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষাবিদগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে থাকেন এবং সেগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে থাকেন। যেমন - তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলেন, তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য (Immediate objective) এবং চরম উদ্দেশ্য (Ultimate objective) বা সাধারণধর্মী উদ্দেশ্য (General objective) এবং বিশেষধর্মী উদ্দেশ্য (Specific objective) ইত্যাদি। অপরদিকে, মনোবিদগণ মনে করেন, শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি (Objectives of education) যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে শিখনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেহেতু বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষার্থীকে ভিন্ন ভিন্ন শিখনকৌশল প্রয়োগ করতে হয়। বিপরীতক্রমে, বিভিন্ন ধরনের শিখনকৌশল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, আধুনিককালে মনোবিদগণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের ভিত্তিকে কেন্দ্র করে শিখনকেও বিভিন্ন প্রকারের বলেছেন। যেমন - বৌদ্ধিক শিখন (Cognitive Learning), বা জ্ঞানমূলক শিখন, দক্ষতার শিখন (Skill learning), প্রক্ষোভমূলক শিখন

(Affective learning) ইত্যাদি। UNESCO-র আন্তর্জাতিক কমিশন (1996) একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার উপর ''Learning : The Treasure''-এই শিরোনামে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যার সভাপতি ছিলেন Jecques Delors; সেখানে বলা হলো শিক্ষা চারটি স্তম্ভের (Four Pillars) উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে এবং শিক্ষার জীবনব্যাপী এক প্রক্রিয়া। এই চারটি স্তম্ভ হলো - ১) জ্ঞানার্জনের জন্য শিখন (Learning to know) ২) কর্মসম্পাদনের শিখন (Learning to do) ৩) যূথবদ্ধভাবে বাস করার শিখন (Learning to live to gether) ৪) মানুষ হওয়ার শিখন (Learning to know) বা 'জ্ঞানার্জনের শিখন' হিসাবে অভিহিত করেন। এই চার প্রকারের শিখনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে পরবর্তী অংশে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১। জ্ঞানার্জনের জন্য শিখন (Learning to know) ঃ

বর্তমানে প্রথাগত শিক্ষার (Formal education) একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা অথবা বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে তাকে সহায়তা করা। শিখন প্রক্রিয়াই তাকে এ বিষয়ে সহায়তা করে। যে কোনো ব্যক্তি শিখনের সময় তার জীবনপরিবেশের কোনো একটি অংশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। আর ওই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ সে তার জীবনপরিবেশের ওই অংশটিকে প্রকৃতভাবে জানতে পারে বা সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এখানে পরিবেশের অংশ বলতে শুধুমাত্র বস্তুগত উদ্দীপকের কথাই বলা হচ্ছে না; পরিবেশ বিমূর্ত ধারণাভিত্তিকও হতে পারে এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েও ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করতে পারে। মনোবিদগণ মনে করে, শিখনের মাধ্যমে এমন কতকগুলি মানসিক বৈশিষ্ট্যকে সক্রিয় করে তোলা যায় যে, তাদের দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন বা অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়। তাই জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়াকে তাঁরা এক প্রকারের শিখনকৌশল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, যে শিখনপ্রক্রিয়া শিক্ষার্থীকে বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে 'সহায়তা করে বা বিশ্বজগৎ' সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে এবং তার মানসিক বিকাশে সহায়তা করে, তাই হল জ্ঞানার্জনমূলক শিখন (Cognitive Learning)। শিক্ষাগত দিক থেকে যে শিখনপ্রক্রিয়া শিক্ষার্থীকে বিশ্বজগতের যে কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে, তাই হল 'জ্ঞানার্জনের শিখন' (Learning to know)। জ্ঞানের (Knowledge) কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলির জন্য তাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। জ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

(১) জ্ঞান ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করে, তার ব্যক্তিসত্তাকে মজবত করে। কোনো বিশেষ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানার্জন করলে, যে কোনো পরিস্থিতিতে সে বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তি তার মতামত নির্ভরতার সঙ্গে স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে।

(২) জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিকে তার স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখতে সহায়তা করে। কারণ, দেখা গেছে জ্ঞানের প্রসার (Motivational aspect) ব্যক্তিভেদে পৃথক হয়। একই বিষয়বস্তু পাঠ করে বা একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে দুজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য থাকে, আর সেই কারণে তাদের জ্ঞানের তারতম্য হয়। শিক্ষার লক্ষ্য হল প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, সেহেতু তা শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কারণে জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

(৩) জ্ঞানের একটি প্রেষণামূলক দিক (Expericence) আছে। মনোবিদগণ লক্ষ্য করেছেন, জ্ঞানমূলক শিখনের সময়ে, শিক্ষার্থী যখন কোনো বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করে, তখন সে বিষয়ে আরও বেশি জানার জন্য তার মনে আগ্রহের সঞ্চার হয়। আর এই আগ্রহের দরুন, তার জ্ঞানের গভীরতা বাড়তে থাকে। ফলে জ্ঞানমূলক শিখন, শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান আহরণের স্পৃহাকে সজীব রেখে শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া তার জীবনব্যাপী চলতে থাকে। এই কারণে, ব্যক্তিজীবনে শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে চলমান রাখার জন্য শিক্ষার একটি উদ্দেস্য হিসেবে জ্ঞানার্জনকে গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) জ্ঞান অভিজ্ঞতা (Expericence) নির্ভর। ব্যক্তি অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় পদ্ধতি অর্জন করতে পারে। সেই কারণে জ্ঞানও প্রত্যক্ষভাবে উদ্দীপক পরিস্থিতির উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আসেত পারে অথবা, পরোক্ষভাবে বিকল্প উদ্দীপনার মধ্য দিয়েও আসতে পারে। যদিও প্রত্যক্ষ জ্ঞানই (Direct knowledge) শিক্ষাগত দিক থেকে বেশি কার্যকরী, তবুও পরোক্ষা জ্ঞানে ভূমিকা সেখানে কম নয়। কারণ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। অথচ শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিকবিকাশ, যা শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য, তা নির্ভর করে তর জ্ঞানের প্রসরের উপর। পরোক্ষ জ্ঞানার্জনের কৌশল শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জ্ঞানার্জন প্রসঙ্গে শিক্ষার্থী এই পরোক্ষ কৌশল আয়ত্ত করতে পারে বলে, একে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়েছে।

(৫) মনোবিদগণ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন, জ্ঞানের সামান্যীকরণ (Generaliztion) সম্ভব। অর্থাৎ, বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন বিষয়ে বা একই বিষয়ে আহরিত জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। প্রকৃত সে জ্ঞানার্জনে শিখনের সর্বশেষ পর্যায়ের এই সমন্বয়ের ফলেই ধারণা (Concept) বা সাধারণ নীতি (General principle) গঠিত হয়। এই ধরনের সমন্বয়ে ফলে জ্ঞান সংরক্ষণের কাজ সহজ হয়। এই সংরক্ষিত জ্ঞানই শিক্ষার্থীকে পরবর্তীকালে সামাজিক দিক থেকেও উপযোগী করে তোলে। তাই শিক্ষার ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যকে সার্থক করে তোলার জন্য জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

(৬) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে জ্ঞানের সঞ্চালন (Transfer of knowledge) সম্ভব। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অর্জিত জ্ঞান পরবর্তীকালে অন্য কোনো অভিজ্ঞতার অর্জনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। এর ফলে শিখন অনেক সহজ হয়। অর্থাৎ, জ্ঞান শিক্ষার বিষয়বস্তু (Subject matter) এবং শিখন সহায়ক কৌশল উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়ে শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। এই কারণেও জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

(৭) এক কথায়, শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনবিকাশে সহায়তা করা। শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যম শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সেই লক্ষ্যাভিমুখী হচ্ছে কী না, তা মধ্যে বিচার করে দেখার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মূল্যায়ন (Evaluation), সুষ্ঠু শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার জন্য প্রয়োজন। অপরদিকে, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রসার শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ, যে কোনো বিষয়ের জ্ঞানের একটি বস্তুগত ভিত্তি (Objective basisi) থাকে। তাই জ্ঞানকে, নৈর্ব্যক্তিক কৌশলে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। জ্ঞানমূলক শিখন ফলশ্রুতিকে নৈর্ব্যক্তিক কৌশলে পরিমাপযোগ্য বলেই, জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে 'জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষর উদ্দেশ্য' সামগ্রিকভাবে শিক্ষার অনেকগুলি মূল লক্ষ্যকে চরিতার্থ করতে সহায়তা করে। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পিত শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার এই জ্ঞানর্জনের উদ্দেশ্যে পৌঁছানো অনেক সহজ হয়। কারণ, শিখনের সাহায্যে শিক্ষার্থীর এমন কতকগুলি মানসিক বৈশিষ্ট্যকে সক্রিয় করে তোলা যায় যে, সেগুলির দ্বারা জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করা সম্ভব। তাই গতানুগতিক শিক্ষায় এই দিকটির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে একথা স্মরণ রাখার দরকার যে শিক্ষার মাধ্যমে যদি শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ও ভাষাভিত্তিক জ্ঞান (Theoretical and verbal) আহরণে সহায়তা করা হয় এবং শিখনকে যদি শুধুমাত্র সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ শিক্ষার লক্ষ্যই সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। এই কারণে, আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ, জ্ঞানার্জনের জন্য প্রযুক্ত শিখনকৌশলকে শুধুমাত্র জ্ঞানাহরণের জন্য ব্যবহার করার পক্ষপাতী নন। তাঁরা শিখনকে জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা থাকেন। শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যদি মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রাসারণের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করে থাকেন। শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যদি মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের কাজে উৎসাহিত হয় তবেই সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নের দিক মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের কাজে উৎসাহিত হয় তবেই সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নের দিক থেকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

২। কর্মসম্পাদনের জন্য শিখন (Learning to do) ঃ

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of education) হল একই সঙ্গে ব্যক্তিকল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। শিক্ষা তার ব্যক্তিকল্যাণের এবং সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছাতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষাবিদগণ বলেছেন, শিক্ষা যদি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি বিকাশে সহায়তা করতে পারে, শিক্ষা যদি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সমাজের সকল ব্যক্তির সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করার প্রশিক্ষণ দিতে পারে, তবে তার মাধ্যমে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকল্যাণ সম্ভব। অন্যদিকে, শিক্ষা যদি উন্নয়নমুখী সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় এবং শিক্ষা যদি সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে সকল নাগরিকের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিন্ত করতে পারে, তবেই তার মাধ্যমে সার্বিক সামাজিক কল্যাণ সম্ভব। আধুনিক শিক্ষার এই সার্বিক লক্ষ্য এবং তার আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিক্ষার মাধ্যমে যে সকল বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর মধ্যে এবং সমাজজীবনে প্রত্যাশা করা হয় তার ভিতর একটি হল - শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা বা সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা। চিন্তাবিদগণ মনে করে, প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি করে, পরোক্ষভাবে সামাজিক উৎপাদনও বৃদ্ধি করা যায়, অর্থাৎ প্রথাগত শিক্ষায়, শিখনের মাধ্যমে যদি শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়, তবেই আধুনিক শিক্ষার ব্যক্তিগত সামাজিক কল্যাণমূলক একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য চরিতার্থ করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, মনোবিদদের ধারনা অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তির বিশেষক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনের দক্ষতা, শিখনের দ্বারা বা বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দ্বারা বিকাশ করা সম্ভব। অর্থাৎ কর্মদক্ষতাকে বা শুধুই দক্ষতাকে (Skill) তাঁরা শিখনের একটি ফলশ্রুতি (Learning outcome) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মনোবিদগণের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ 'দক্ষতার শিখন' (Skill learning) বা কর্মসম্পাদনের জন্য 'শিখন' কে (Learning to do) শিক্ষার একটি বিশেষধর্মী উদ্দেশ্য হিসেবে নির্বাচন করেছেন। শিখনের প্রভাবে শিক্ষার্থীর কতকগুলি প্রত্যক্ষণমূলক সঞ্চালনকর্মের (Perceptual-motor activity) ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই জাতীয়

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কর্মেন্দ্রিয় বা পেশির (Muscle) সক্রিয়তাই প্রধান। এই জাতীয় কর্মেন্দ্রিয় গুলির সমন্বয়মূলক কাজকে সাধারণভাবে বলা হয়, 'দক্ষতামূলক কাজ' (Skilled activity)। আর যে বিশেষ ধরনের শিখন কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থী এই কর্মদক্ষতা অর্জন করে, তাকেই মনোবৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় 'দক্ষতার শিখন' (Skill learning) বা 'কর্মসম্পাদনের জন্য শিখন' (Learning to do)।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করা। তার এই সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে দৈহিক বিকাশও (Physical development) অন্তর্ভুক্ত। কর্মসম্পাদনের শিখনের মধ্য দিয়ে, শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অঙ্গসঞ্চালনের সুযোগ পায়। আর এই নিয়মিত অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশ হয়। অর্থাৎ এই ধরনের শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতি দিক নির্দেশ করে। এই কারণেই একে বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করা। তার এই সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে দৈহিক বিকাশও (Physical development) অন্তর্ভুক্ত। কর্মসম্পাদনের শিখনের মধ্য দিয়ে, শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অঙ্গসঞ্চালনের সুযোগ পায়। আর এই নিয়মিত অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশ হয়। অর্থাৎ এই ধরনের শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতি দিক নির্দেশ করে। এই কারণেই একে বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কর্মসম্পাদনের শিখন (Learning for doing) শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশেও সহায়তা করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যে সংস্কারগত প্রবণতাগুলি থাকে, সেগুলিকে এই জাতীয় শিখনের মাধ্যমে সার্থকভাবে উদগমন (Sublimation) করা যায় এবং সেগুলির বিকাশ সাধনে সহায়তা করা যায়। যেমন শিক্ষার্থী তার জন্মগত কৌতূহল প্রবণতা (Curiosity), নির্মাণ প্রবণতা (Constructions), সংগ্রহ করার প্রবণতা (Acquisition) ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে চরিতার্থ করতে পারে। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় কর্মসম্পাদনের শিখনকে অন্তর্ভুক্ত করে, শিক্ষার্থীকে তার মানসিক বিকাশ উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। তাই এই প্রকার শিখনকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মসম্পাদনের শিখন শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশেও সহায়তা করে। এই প্রকারের শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পায় এবং তার দরুন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পাদন করতে পারে। এই জাতীয় অনিয়ন্ত্রিত স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার সুযোগ পাওয়ার দরুন কর্মসম্পাদনমূলক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভিক পরিণমন দ্রুত আসতে থাকে।

শিক্ষার জ্ঞানমূলক বিকাশ বা বৌদ্ধিক বিকাশ কর্মসম্পাদনের শিখনের মাধ্যমে সম্ভব। আধুনিককালে, শিক্ষাবিদগণ তাই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণের নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই নীতি অনুযায়ী, বিশেষ কোনো সামাজিক উপযোগিতামূলক কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন প্রথাগত পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান আহরণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, কর্মসম্পাদনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। এই কারণে কর্মসম্পাদনের জন্য শিখনকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কর্মসম্পাদনের শিখন, শিক্ষার্থীকে সামাজিক দিক থেকেও যথেষ্ট উপযোগী করে তোলে বাতার সামাজিক বিকাশেও সহায়তা করে। প্রথাগত শিক্ষাকালের মধ্যে শিক্ষার্থী এই ধরনের শিখনের সুযোগ লাভ করে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা অর্জন করতে পারে। এই দক্ষতার উপর ভিত্তি করে এ পরবর্তীকালে তার জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই জাতীয় শিখনকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করলে, সমাজও উপকৃত হয়; সমাজের উন্নয়ন হয় কারণ, এই শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলে সমাজের মধ্যে এমন সব দক্ষ কর্মীর সৃষ্টি হয় যারা বিভিন্নভাবে সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারবে।

দক্ষতার শিখন কেবলমাত্র দৈহিক কর্মসম্পাদনের জন্যই প্রয়োজন তা নয়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক শিখনেও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যেমন, সমস্যামূলক ভাষাভিত্তিক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, পরবর্তীকালে তার প্রচেষ্টাকে সহজ করে তোলে। যে কোনো ধরনের সমস্যা সমাধানের কৌশল যখন শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়োগ করতে পারে, তখন তার শ্রমের লাঘব হয়। তাছাড়া পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই কর্মসম্পাদনের বা সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়ে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই কারণেও এই জাতীয় শিখন ফলশ্রুতিকে (Learning outcome) শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

দক্ষতার শিখন বা কর্মসম্পাদনের জন্য শিখনের উল্লিখিত শিক্ষাগত গুরুত্বগুলির কথা বিবেচনা করে, আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য একে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নির্বাচন করেছেন। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যখন তার জীবিকা অর্জনের জন্য বিশেষ ধর্মীকর্ম (Specialized activity) সম্পাদন করতে হয়, তখন ব্যক্তিগত দিক থেকেও এই ধরনের শিখনের প্রয়োজনীয়তাকে আর অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক দিক থেকে এই শিক্ষাগত উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তাকে আর অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক দিক থেকে এই শিক্ষাগত উদ্দেশ্যের পর প্রয়োজনীয়তা কম নয়। কারণ কর্ম সম্পাদনে দক্ষ একজন নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে তার সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, কর্মসম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নির্বাচন করায় আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণমুখী হয়ে উঠেছে।

৩। যুথবদ্ধতার শিখন (Learning to live to sether) ঃ

ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের ধারণার মধ্যে যে বিভিন্ন দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাদের মধ্যে তার সামাজিক বিকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকাশের দিকগুলির সমন্বয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হলেও শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশের দিকটিকে অবহেলা করা হয়নি। ব্যক্তিকল্যাণ এবং সামাজিক কল্যাণে শিক্ষার এই আধুনিক লক্ষ্য কেবলমাত্র ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর সামাজিকতা শিখনের মাধ্যমে সাধিত হতে পারে। মানব শিশু একটি সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু জন্মমুহূর্তে তার মধ্যে কোনো সামাজিক বৈশিষ্ট্য থাকে না। অর্থাৎ, সদ্যোজাত শিশুকে একটি সামাজিক জীব হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। কিন্তু সমাজের স্বার্থে পরবর্তীকালে তার সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে ওঠা বা সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করা একান্তভাবে প্রয়োজন। সমাজ কৃষ্টির সংরক্ষণ (Preseration of Culture), সমাজ জীবনের স্থায়িত্ব, সমাজের অগ্রগতি এ সব কিছুই নির্ভর করে সমাজের

সদস্যগণ কতটুকু সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করতে পেয়েছে তার উপর। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষাকে অনেকাংশে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তাই শিশুকে সামাজিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করায় সহায়তা করাকে আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন (মুদালিয়ার 1952) তাঁদের প্রতিবেদনে এই দিকটির গুরুত্ব প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন - 'যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে মিলেমিশে সম্ভ্রমের সঙ্গে বসবাসের উপযোগী বৈশিষ্ট্য অর্জনে সহায়তা করে না, তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না' (No education is worth the name which does not iculcate the qualities necessary for living graciously, harmoniously and effciently with one's fellow men)। এখন, সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন যেহেতু শিক্ষানির্ভর এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশে সহায়তা করা যেহেতু প্রথাগত শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য সেহেতু এগুলি শিখনযোগ্য, এ বিশ্বাস আধুনিককালে মনোবিদ ও শিক্ষাবিদগণের। মনোবিদগণ বলেছেন জন্মের পর থেকে মানবশিশু ব্যক্তিসত্তার (Personality) বিকাশ শুরু হয়। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যাবলির সঙ্গে পরিবেশের উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে স্বাভাবিক নিয়মে ঘটতে থাকে। কিন্তু বিকাশের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যায় এবং সমাজমুখী করা যায় পরিকল্পিত শিখনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, শিখনের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার তথা সামাজিকতার বিকাশ সম্ভব। এখন যে কোনো শিখন প্রচেষ্টার যেহেতু কিছু আচরণগত ফলশ্রুতি (Behavioural learning outcome) থাকে, সেহেতু সেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতিকে পরিমাপ করা সম্ভব হয়। তাই মনোবিদগণ, সামাজিকতার শিখনকে এক প্রকারের শিখন (Type of Learning) হিসাবে বিবেচনা করেন। অপরদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষাবিদগণ এই প্রকার শিখনের ফলশ্রুতিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবেই বিবেচনা করেন।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে সফল করে তুলতে হলে প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা একান্তভাবে কাম্য। চিন্তাবিদগণ মনে করেন, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সফলতা বিশেষভাবে নির্ভর করে, নাগরিকদের পারস্পরিক সহনশীলতার উপর। যেখানে এই সহনশীলতার অভাব সেখানেই বিরোধ, সেখানেই অশান্তি। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা যেহেতু নাগরিকতার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে, সেহেতু আধুনিক শিক্ষাবিদগণ 'যূথবদ্ধভাবে বাস করার' প্রশিক্ষণকে শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে নির্বাচন করেছেন। তাঁরা মনে করেন, প্রথাগত বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে, সামাজিকতা বিকাশের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করলে, শিক্ষার্থীদের সামাজিক জীবনের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হয়। তাই এই বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষামূলক কর্মসূচি রচনা করলে, শিক্ষার সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

৪। মানুষ হওয়ার শিক্ষা (Learning to be) ঃ

বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে মানবসভ্যতার সকল দিকে এত দ্রুত ও বিস্তৃত পরিবর্তন ঘটে চলেছে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলির সঙ্গে যথাযথভাবে অভিযোজন করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এই পরিবর্তনের বিস্তৃতি এতই বেশি যে সমগ্র মানবসমাজ হতচকিত। এই পরিবর্তনের মূলে আছে বিজ্ঞানের প্রযুক্তির উন্নতি। প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞানের এই সম্প্রসারণ একদিকে যেমন মানুষের আশীর্বাদ হিসাবে এসেছে, তেমনি অন্যদিকে তার জীবন পরিস্থিতিতে জটিলতারও সৃষ্টি করেছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবিরত দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে সাধারণ করতে গিয়ে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কারের

প্রভাব, সমাজজীবনের উপরও এসে পড়েছে। এদের প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রার রীতির মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। আর ওইসব পরিবর্তন সমাজের কৃষ্টিগত সংকট (Cultural crisis) দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ, মানুষের জ্ঞানের বিস্তার এক দিকে যেমন তার সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে তার জীবনে মানসিক ও কৃষ্টিগত সংকটের সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যৎ জীবন পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তিবিগ্যার অনুপ্রবেশের দরুন কৃষ্টিগত পশ্চাদবর্তিতার (Cultural lag) অনুভূতি ব্যক্তিজীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। চিন্তাবিদগণ মনে করেন, এর থেকে মানবসমাজকে মুক্তি দিতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। কারণ, কেবলমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে এই সংকটকাল অতিক্রম করার মতো প্রশিক্ষণ দিতে পারে। তাই শিক্ষাবিদগণ, আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে গিয়ে 'মানুষ হওয়ার শিক্ষা'র (Learning to be) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

'মানুষ হওয়ার শিক্ষা' কথাটি আধুনিক নয়। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে পূর্ব চিন্তাবিদগণ ও শিক্ষাবিদগণ 'মানুষ হওয়া' বলতে চারিত্রিক বা নৈতিক বিকাশের কথাই বোঝাতেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই চারিত্রিক বিকাশের শিক্ষাকেই 'মানুষ হওয়ার শিক্ষা' নামে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন - ''The end of all education, all training should be man-making. The end of all traning is to make the man grow.'' আর এই মানুষ হওয়ার 'শিক্ষার' যে লক্ষণগুলি তিনি নির্দেশ করেছিলেন, সেগুলি সবই শিক্ষার্থীর চারিত্রিক এবং নৈতিক। 'মানুষ হওয়ার শিক্ষা' ও 'চারিত্রিক বিকাশের শিক্ষার' মধ্যেকার এই ধারণাগত সাদৃশ্যের কোনো পরিবর্তন বর্তমানে না ঘটলেও ওই ধারণার বিস্তৃতি ঘটেছে। 'মানুষ হওয়ার শিক্ষা'র ধারণার এই বিস্তৃতি, আধুনিক মানুষের মানসিক ও কৃষ্টিগত সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭১ সালে ইউনেসকো (UNESCO), পৃথিবীর সকল দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন (International Education Commission) নিয়োগ করেন। এই কমিশনের রিপোর্ট '' (মানুষ হওয়ার শিক্ষা) এই নামে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ কমিশন 'মানুষ হওয়ার শিক্ষা'-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নির্বাচন করেছেন। কমিশন বলেছেন ''We should no longer assiduously acquire knowledge once for all, but learn how to build up a continually evolving body of knowledge all through life - 'Learn to be'.'' অর্থাৎ, ''শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনের জন্য এককালীন কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করা নয়; শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, কীভাবে ক্রম বিবর্তমান জ্ঞান জীবনব্যাপী শিখনে (Life long learning) অনুপ্রাণিত করা। অর্থাৎ, এই অর্থে 'মানুষ হওয়ার শিখন'-এর প্রকৃত তাৎপর্য হল 'প্রকৃত শিক্ষার্থী হওয়ার শিখন' (Learning to be a learner)। মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, যার ফলে মনুষ্যসমাজ নতুন নতুন সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হচ্ছে, সেগুলিকে শেখার মতো মানসিক প্রশিক্ষণ দেওয়াই হবে আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে একথা স্মরণ রাখার দরকার যে, শিক্ষার এই উদ্দেশ্য বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচিকে (Adult Education Programme) ইঙ্গিত করে না। এটি প্রথাগত শিক্ষারই (Formal education) একটি উদ্দেশ্য। প্রথাগত শিক্ষার মধ্যেই, শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎকালের জ্ঞান আহরণে সক্ষম করে তুলতে হবে।

এই আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মানুষ হওয়ার শিক্ষা বা আধুনিক অর্থে চারিত্রিক বিকাশের মূল কথা হল, শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনস্পৃহা সঞ্চার করা, শিক্ষার লক্ষ্য কতকগুলি নির্দিষ্ট জ্ঞানের সামগ্রি শিক্ষার্থীদের

সামনে উপস্থাপন করা নয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীকে জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের বা জ্ঞানার্জনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। আর সে কাজ সম্ভব, শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানের স্পৃহা সঞ্চার করার মাধ্যমে। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে প্রকৃত 'মানুষ হওয়ার শিখন' অথবা 'শিক্ষার্থী হওয়ার জন্য শিখন' আধুনিক যুগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যের তাৎপর্য ব্যক্ত করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন (UNESCO, 1971) বলেছেন - ''Education from now one can no longer be defined in relation to the fixed content which has to be assimilated, but must be conceived of as a process in the human being, who thereby learns to express himself, to communicate and to question the world, through his various experiences, and increasingly all the time to fulfil himself."

৩.৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক (Relation between Education & other subjects)

বর্তমানে মানুষের শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ও অনুশীলন করার প্রবণতা শিক্ষাবিদগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। আর তাঁদের এই প্রবণতা থাকে উদ্ভব হয়েছে শিক্ষাবিজ্ঞানের। আধুনিক এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু (Subject matter) এবং অনুশীলন পদ্ধতি (Method) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি একটি বিশুদ্ধ ও নিরপেক্ষ সামাজিক বিজ্ঞান (Social science) হিসেবে বিকাশলাভ করেনি। মানবসভ্যতা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছে যে শিক্ষা মানুষের জীবনের এমন একটি প্রক্রিয়া যে, সেটি তার জীবনের সকল দিককেই প্রভাবিত করে। আধুনিককালে অনেকে মনে করেন, মানুষের মনে বস্তুধর্মী বৈজ্ঞানিক চেতনার (Scientific consciousness) বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষা এরকম কোনো বিশেষধর্মী সংকীর্ণ প্রক্রিয়া নয়। জীবনের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলাই শিক্ষার কাজ। শিক্ষাকে এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় বলেই, শিক্ষাবিজ্ঞানে, দর্শনশাস্ত্র থেকে শুরু করে সকল রকমের বস্তুধর্মী ও সামাজিক বিজ্ঞানের তথ্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শিক্ষা সম্পর্কে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির বিকাশে সহায়তা করেছে, তেমনি সে নিজেও তাদের যুক্তিনির্ভর প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে।

৩.৮.১ শিক্ষা ও দর্শন (Education and philosophy) ঃ

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের মনকে যে জিজ্ঞাসা আলোড়িত করে আসছে সেগুলি হল - কোথা থেকে এলাম; কেনইবা এলাম। মানুষের মনের এই মৌলিক জিজ্ঞাসাগুলি থেকে সৃষ্টি হয়েছে দর্শনশাস্ত্রের (philosophy)। দর্শন হল বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান। বাংলা 'দর্শন' শব্দটি দৃশ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হল দেখা। অর্থাৎ, ব্যাপক তাৎপর্যে মানুষ তার বহিরেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্পর্কে যে জ্ঞান আহরণ করে তাই হল দর্শন (philosophy)। ইংরেজি 'philosophy' শব্দটিও দুটি মূল গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্ট - philos এবং Sophia। ফিলস (philos) শব্দের অর্থ হল 'ভালোবাসা' (Love) বা আকর্ষণ এবং সফিয়া (Sophia) শব্দের অর্থ হল জ্ঞান। অর্থাৎ ইংরেজি ফিলজফি (philosophy) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল - 'জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা বা আসক্তি, (Love for wisdom)। এর উদ্দেশ্য হল চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান করা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রেমন্ট (Raymont) বলেছেন. ''philosophy is an unceasing effort to discover the general truth that lies behind the particular facts, to discover also the realities that lies

behind appearence."। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (Plato) বলেছেন, যে ব্যক্তির সকল প্রকারের জ্ঞানের প্রতি আসক্তি আছে এবং যাঁর জ্ঞানপিপাসা কোনো দিনই পরিতৃপ্ত হয় না, তিনিই প্রকৃত অর্থে দার্শনিক (He who has a taste for every sort of knowledge and is anxious to learn and is never satisfied may be just termed as philosophy.)। অনেকে এরকম ধারণা পোষণ করেন যে, যেহেতু দার্শনিকগণের এই জ্ঞান আহরণের স্পৃহা মূলত তাত্ত্বিক বিচারকেন্দ্রিক, সেহেতু দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক খুবই কম। তাঁরা মনে করেন, দৈনন্দিন জীবনে ঘটমান উপাদানগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন কাল্পনিক রহস্যাবৃত ঘটনাবলি সম্পর্কে আলোচনা করাই দর্শনের কাজ এবং ওই সকল আধিভৌতিক বিষয়ই দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য তা নয়। জীবন কী; মনুষ্য জীবনের উৎস কোথায়; জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, এরকম কতকগুলি প্রশ্ন দার্শনিকগণের মূল জিজ্ঞাসা। আর এই সকল প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়েই দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি। ফলে জীবনের মূল উৎস এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করাকে দর্শনশাস্ত্র তার কর্তব্য হিসেবে স্থির করেছে। এই বিশ্বব্রহ্মান্ড এবং মানুষ সম্পর্কেই তার আগ্রহ। যে কোনো একক ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয় করা এবং বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সম্পর্কে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দর্শনের কাজ। এই দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে প্রথাগত বিজ্ঞানগুলির (Science) সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের পদ্ধতিগত পার্থক্য (Methodological difference) থাকলেও, বিষয়বস্তুগত পার্থক্য নেই। বরং দর্শনশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের উৎস ও অনুপ্রেরণা বলা যায়। ডঃ রাধাকৃষ্ণান, ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাতে মন্তব্য করেছেন, ''In India philosophy stood on its own legs and all other studies looked to it for inspiration and support. It is master science guiding other sciences, without which they become empty and foolish." তাই ব্যাপক তাৎপর্যে দর্শনশাস্ত্রে মানুষের জীবন এবং অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং, কার্যকরী অর্থে মানুষের জীবন এবং তার অভিজ্ঞতাবলি সম্পর্কে ব্যাপক তাৎপর্যবহ সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনার যে ক্ষেত্র তাই হল দর্শনশাস্ত্র।

অন্যদিকে, আধুনিক অর্থে শিক্ষা হল শিশুর বা ব্যক্তির জীবনবিকাশের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার প্রক্রিয়া। জন্মমুহূর্তে শিশু থাকে অপরিপক্ক বা অপরিণত। তবে প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কতকগুলি সম্ভাবনা বা ক্ষমতা থাকে যেগুলি বিকাশযোগ্য। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর ওই জন্মগত সম্ভাবনার বিকাশে সহায়তা করা হয় তাকেই শিক্ষা (Education) বলা হয়। অর্থাৎ, শিক্ষা ব্যক্তিজীবনে এক প্রকারের জীবনদায়ী প্রক্রিয়া। মানুষের জীবনধারণের জন্য আলো, বায়ু, জল, খাদ্য আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন। মানুষের জীবনীশক্তি বজায় রাখার জন্য তার পক্ষে কতকগুলি জৈবিক ক্রিয়া (Organic process) সম্পাদন করা একান্তভাবে প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত জীববিজ্ঞানীগণ বহুপূর্বে গ্রহণ করেছেন।

সাধারণ জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি যেখানে ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন, সেখানে তার জৈবিক শক্তির সম্প্রসারণের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। একথা আধুনিক জীববিজ্ঞানীগণও স্বীকার করে থাকেন। ব্যক্তির এই সম্ভাবনাগুলির সম্প্রসারণের ফলেই তার জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশ হয়। তাই শিক্ষাও ব্যক্তির জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষার মাধ্যমে যেহেতু ব্যক্তিজীবনের সম্প্রসারণ ঘটে, সেহেতু আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানীগণ শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (Life-long process) হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। আবার কোনো কোনো শিক্ষাবিজ্ঞানী

একে জীবনযাপনের সমতুল প্রক্রিয়া হিসেবেও বর্ণনা করেছেন এবং সেই জৈবনিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য জীববিদ্যা (Biology) এবং মনোবিদ্যার (Psychology) সিদ্ধান্তগুলিকে ব্যবহার করেছেন। জীববিজ্ঞানীগণ এবং মনোবিজ্ঞানীগণ বলেছেন, ব্যক্তিজীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে, পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়ে শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, শিক্ষাও একই নিয়মে ঘটে থাকে। অর্থাৎ পরিবর্তনশীল জীবন পরিবেশে নিজের আচরণধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে অভিযোজন করতে পারাই হল শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ এই জৈবিক অভিযোজনের প্রক্রিয়াকে অনেক ব্যাপক অর্থে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। উন্নত পর্যায়ের প্রাণী হিসেবে মানুষের জৈবিক ছাড়াও আরও বিভিন্ন রকমের চাহিদা আছে। তাই তার জীবন অভিযোজনের প্রকৃতি কেবলমাত্র জৈবিক চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। তার মধ্যে মানসিক ও সামাজিক চাহিদা (Psychological and social need) সৃষ্টি হয়; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলিও (Moral and spiritual need) তার জীবনের কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে, এই মানসিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলো মানুষের সামাজিক অভিযোজনমূলক আচরণের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ব্যক্তি যখন তার এই চাহিদাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোজনমূলক প্রচেষ্টা করে তখন তার সেই প্রচেষ্টা বা জীবন উদ্দেশ্যমুখী হয়ে পড়ে। সুতরাং, শিক্ষাকে পরিকল্পিত রূপ দেওয়ার সময়, স্বাভাবিকভাবে মনুষ্যজীবনের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। অন্যদিকে মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে দর্শনশাস্ত্রেই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। সুতরাং, একথা বলা অনুচিত হবে না যে, জীবন (Life), শিক্ষা (Education) এবং দর্শন (Philosophy) পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সংযোগে আবদ্ধ। দর্শন জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে; আর মনুষ্যসমাজের শিক্ষার উদ্ভব হয়েছে ব্যক্তিজীবনের সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য। সুতরাং, এই যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শিক্ষা এবং দর্শন ব্যক্তিজীবনের মাধ্যমেই পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। এই কারণেই জীবনদর্শনগুলি (Philosophy of life), শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে শিক্ষাদর্শনে (Educational philosophies) রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনদর্শন তথা শিক্ষাদর্শন, জীবনের তথা শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে দেয়, আর শিক্ষাপরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে একটি জীবনদর্শন কাজ করে। চিন্তাবিদগণ বলেছেন, শিক্ষন ও দর্শনের এই সযুজ্যের মূল কারণ হল তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক পরিপূরক ধর্ম।

৩.৮.২ শিক্ষা বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Education and Psychology) ঃ

আধুনিক শিক্ষার বিকাশে যে সকল বিজ্ঞান বিশেষভাবে সহায়তা করেছে, সেগুলির মধ্যে মনোবিদ্যার অবদানই সর্বাপেক্ষা বেশি। দীর্ঘদিন পূর্বে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পেস্তালাৎসি শিক্ষাকে মনোবিদ্যাসম্মত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (I wish to psychologize education)। পেস্তালাৎসি তাঁর জীবদ্দশায় নিজ প্রচেষ্টায় নিজের ইচ্ছা পূরণ করে যেতে পারেন নি। তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু নিজের চিন্তাধারার ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে বহু পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের সংঘাত থাকায় তাঁর সেই একক চেষ্টা সফল হয়নি। অন্যদিকে শিক্ষার বর্তমান অবস্থার প্রতি নজর দিলে প্রথমেই বলতে হয়, শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভবনের (Psychologization) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। দৃঢ় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পেস্তালাৎসি যা পারেন নি, পরবর্তীকালে অন্যান্য শিক্ষাবিদগণ তা করতে সক্ষম হয়েছেন। মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাবে আধুনিক শিক্ষা তার বিভিন্ন আঙ্গিকে এবং সামগ্রিক কাঠামোর তাত্ত্বিক দৃঢ়তায় নবরূপ গ্রহণ করেছে।

আধুনিক মনোবিদ্যা (Psychology) অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানের শাখা হলেও এই বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচিতি তুলনামূলকভাবে কম। তাই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখনও সাধারণ মানুষের মনে অনেক বিভ্রান্তি আছে। দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) দীর্ঘদিন পূর্বে মনোবিদ্যাকে মানুষের আত্মা সম্পর্কিত (Science of soul) বিজ্ঞান হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। ইংরাজি 'সাইকোলজি' (Psychology) শব্দটি ওই হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল। Psycho যার অর্থ 'আত্মা' এবং Logic যার অর্থ 'বিজ্ঞান' এই দুটি সমবায়ে বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার নামকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির প্রাচীন নাম অপরিবর্তিত থাকিলেও তার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটেছে। অ্যারিস্টটলের পরবর্তীকালে দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের ভাবনায় 'সাইকোলজি' বা মনোবিদ্যা 'মানব মনের অনুশীলনকারী বিজ্ঞানে' (Science of mind) রূপান্তরিত হয়। আরও পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের 'চেতনার অনুশীলনকারী বিজ্ঞান' (Science of Consciousness) হিসাবে মনোবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চিন্তাবিদগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ওই সময়ে চিন্তাবিদগণ বললেন, মানুষের মনের প্রধান ধর্ম হল চেতনা (Consciousness)। সুতরাং, ওই চেতনার গতি ও প্রকৃতিকে অনুশীলন করাই হবে মনোবিদ্যার মুখ্য কাজ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 'মনোবিদ্যা' তার ওই তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে আসতে থাকে। ওই শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ ভাগে জার্মানির লাইপজিগ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভ্যুন্ডে (W. Wundt)-র প্রচেষ্টা মনোবিদ্যার প্রথম পরীক্ষাগার গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ, মনোবিদ্যা অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের রূপ গ্রহণ করায় চেষ্টিত ছিল। তখনও পর্যন্ত কিন্তু মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু (Subject matter) কী হবে, সে সম্পর্কে মতবিরোধের মীমাংসা হয়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'মনোবিদ্যার' বিষয়বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন, আমেরিকান মনোবিদ জে. বি. ওয়াটসন (J. B. Watson)। তিনি বললেন, মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হবে 'মানুষের আচরণ'। তিনি বলেছিলেন বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যাকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে তার অনুশীলনের বিষয়বস্তু এমন হওয়ার দরকার যেটিকে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে (Objectively) বিচার করা সম্ভব হবে। মানুষের আচরণকেই বাইরে থেকে অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। তাই তিনি মনোবিদ্যাকে 'আচরণ বিজ্ঞান' হিসাবে বর্ণনা করলেন (Psychology is the science of behaviour)। ওয়াটসনের এই মতবাদ প্রকল্পিত হওয়ার পর সমসায়নিক অনেক মনোবিদ তাঁর বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। তবে ওই সব সমালোচনায় তাঁর বিশেষভাবে ওয়াটসনের আচরণ সংক্রান্ত ধারণার এবং তাঁর অনুশীলনের পদ্ধতির দিকেই সন্দেহের তির নিক্ষেপ করেছিলেন। ম্যাকডুগাল, উডওয়ার্থ, নান প্রমুখ মনোবিদগণ তাঁদের সমালোচনায় 'আচরণকে' শুদ্ধ জৈবিক ক্রিয়া হিসাবে বিচার না করে, তার তাৎপর্যকে বিচার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অর্থাৎ 'আচরণ' (Behaviour) যে মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হতে পারে, এ বিষয়ে তাঁরা দ্বিমত ছিলেন না। অর্থাৎ ওয়াটসনের কাল থেকে 'আচরণকে' আর মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হতে পারে, এ বিষয়ে তাঁরা দ্বিমত ছিলেন না। অর্থাৎ ওয়াটসনের কাল থেকে 'আচরণকে' আর মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হিসাবে ত্যাগ করা হয়নি। তাই আধুনিক সময়ে মনোবিদ্যা, মানুষের আচরণ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত।

মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলন করার এবং শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে মনোবিদগণ 'শিক্ষা মনোবিদ্যা' নামে মনোবিদ্যার একটি পৃথক শাখার সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষা মনোবিদ্যা, প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যারই একটি বিশেষ ক্ষেত্র, যার মধ্যে মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণ সম্পর্কে আলোচনা

করা হয়, এবং মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। আধুনিক তাৎপর্যে, শিক্ষা হল মানুষের জীবনকাল ব্যাপ্ত একটি প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে শিক্ষা করতে থাকে। তাই শিক্ষা মনোবিদ্যা কী তা উল্লেখ করতে গিয়ে জাড (Judd) বলেছেন - ''Educational psychology may be defined as the science which describes and explains the changes that take place in individuals as they pass through various stage of development from birth to Maturity''। আপাতভাবে এই শিক্ষা মনোবিদ্যাকে শিখন (Learning) এবং শিক্ষণ (Teaching) প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করতে দেখা যায়। তাই অনেক মনোবিদ একে 'শিখন ও শিক্ষণ সম্পর্কিত মনোবিদ্যা' (Psychology of teaching and learning) বলে থাকেন। শিক্ষা মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু (Subject matter) তার বর্তমান অবস্থায় শুধুমাত্র শিখন (Learning) এবং শিক্ষণের (Teaching) মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে কি না, তা প্রশ্নাতীত নয়; কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই, এই শিক্ষা মনোবিদ্যার মধ্যে শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির বেশির ভাগ উপাদানকে খুঁজে পাওয়া যায়।

৩.৮.৩ শিক্ষা ও জীববিদ্যা (Education and Biology) ঃ

উপনিষদে বলা হয়েছে, দেহমনের শুদ্ধ বিকাশই পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকগণও দেহমনের সুষম বিকাশের প্রক্রিয়াকেই 'প্রকৃত শিক্ষা' হিসাবে বিবেচনা করতেন। দার্শনিক প্লেটো (Plato) বলেছিলেন - ''Education is the creation of sound mind in a sound body.''। আধুনিককালে, মহাত্মাগান্ধিও বলেছেন, ''By education, I mean an alround drawing out of the best in child and man-body, mind and spirit''। এমনিভাবে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন চিন্তাবিদগণের বক্তব্য বিচার করলে দেখা যায়, তাঁরা শিশুর বা ব্যক্তির দেহমনের বিকাশের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই শিশুর এই দেহমনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব শিক্ষার উপরই অর্পণ করেছেন। এই তাত্ত্বিক ধারণার সূত্র ধরে পরবর্তীকালে চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে মানুষের জৈবিক উপাদানগুলি (Bilogical elements) এবং জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি (Biological process) তার জীবনের বহুমুখী বিকাশে সহায়তা করে। তাই দেখা যায়, বিশেষজ্ঞগণ আধুনিককালে বিজ্ঞানের সকল শাখার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণলব্ধ সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্যকে জৈবিক প্রক্রিয়ার (Life-process) পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার চেষ্টা করে থাকেন। এমনকি, অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন ভৌতবিজ্ঞানেরও পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের জৈবিক ভিত্তি (Biological basis) সম্পর্কে আলোচনা ওই বিজ্ঞানগুলির আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিক্ষাবিজ্ঞানও, আধুনিক অর্থে একটি সামাজিক বিজ্ঞান (Social science)। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্যও সেগুলির জৈবিক ভিত্তি সম্পর্কে জানা একান্তভাবে প্রয়োজন। যে সকল জৈবিক প্রক্রিয়া ও জৈবিক উপাদান বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক দিককে প্রভাবিত করে থাকে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১) মিথষ্ক্রিয়া (Interaction) এবং ২) বৃদ্ধি ও বিকাশের (Growth and development) প্রক্রিয়া, এছাড়া জৈবিক উপাদান (organic elements) যেমন - কোশ, স্নায়ুতন্ত্র, গ্রন্থিতন্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধিতে সহায়তা করে। এইসব জৈবিক উপাদানগুলি শিক্ষাগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেগুলি সম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত ধারণা আধুনিক শিক্ষাকে তাত্ত্বিক এবং

ব্যবহারিক উভয়দিক থেকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। জীববিজ্ঞানীদের দ্বারা উল্লিখিত প্রাণীর কোশদেহের বৈশিষ্ট্যাবলি, আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে কৌশলগুলি অবলম্বন করা হয়, সেগুলি সম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত ধারণা আধুনিক শিক্ষাকে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়দিক থেকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। জীববিজ্ঞানীদের দ্বারা উল্লিখিত প্রাণীর কোশদেহের বৈশিষ্ট্যাবলি, আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে, বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ দান করেছে এবং শিক্ষার কতকগুলি বাস্তব সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেছে। শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার সংরক্ষণে (Retention) এবং পুনরুস্থাপনে (Reproduction) শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে কৌশলগুলি অবলম্বন করা হয়, সেগুলি বিশেষভাবে দেহকোশের ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শিক্ষাবিদগণ বিশ্বাস করেন শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কোশগুলিকে সঠিকভাবে সক্রিয় করে তুলতে পারলে, তার পক্ষে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্রেক উভয়ই সম্ভব হয়। স্মৃতি (Memory) ও বিস্মৃতি (Forgetting) সম্পর্কিত বহু তত্ত্ব এই জৈবিক সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিক শিক্ষা ও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া, আধুনিক কম্পিউটারভিত্তিক শিক্ষার (Computer based education) মৌলিক নীতিও মস্তিষ্কেরও কোশে অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনুসরণে গড়ে উঠেছে। আবার, জীববিজ্ঞানে যাকে বিশুদ্ধ প্রতিক্রিয়া বলা হয়, তাকেই শিক্ষাবিজ্ঞানে বলা হয় আচরণ (Behaviour)। আর নৈর্ব্যক্তিক বিচারে শিক্ষার্থীর আচরণের উন্নয়ন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষাবিজ্ঞানিগণ আধুনিককালে এই সিদ্ধান্তে উপনীয় হয়েছেন যে, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তার উন্নতি তার আচরণের মধ্যেই প্রকাশ পায়। আর এই আচরণের উন্নতি সম্ভব শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে। জীববিদ্যায় বলা হয়েছে, অভিজ্ঞতা অর্জনের মূলে কাজ করে দেহের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি (Sense organs)। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, আধুনিক শিক্ষায়, শিক্ষাবিদগণ, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে, ইন্দ্রিয়-প্রশিক্ষণের (Sense-training) উপর সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাছাড়া, বিমূর্ত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে (Abstract learning material) শিক্ষার্থীর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলার জন্য আধুনিক শিক্ষায় যে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণাদি (Teaching aids) ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে, তাও মূলত উল্লিখিত জৈবিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। সবশেষে, মানুষের জীবনে তার দেহ অভ্যন্তরিস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থির গুরুত্ব সম্পর্কিত জীববিজ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে। আর তার ফলশ্রুতি হিসাবে শারীর শিক্ষা (Physical education)। আধুনিক শিক্ষায় গুরুত্ব লাভ করেছে।

৩.৮.৪. শিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞান (Education and Sociology) ঃ

আধুনিক শিক্ষা যে কেবলমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনাদর্শের স্বার্থে প্রথাগতভাবে কোনো দর্শনতত্ত্বের (Philosophy) উপর প্রতিষ্ঠিত তা বলা যায় না। আধুনিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তার সমন্বয়ধর্মিতা। বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় ঘটেছে শিক্ষাচিন্তার মধ্যে। শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে যেমন বিভিন্ন জীবনাদর্শের সমন্বয় ঘটেছে, তেমনি বিভিন্ন বস্তুনির্ভর ও সামাজিক বিজ্ঞানের (Social science) সমন্বয় ঘটেছে, তাই আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ কোনোটিকে উপেক্ষা করেনি। বর্তমানে শিক্ষার মূল দুটি কাজ হল, ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে ব্যক্তিকল্যাণ সাধন করা এবং সামাজিক রীতিনীতি সংরক্ষণে ও সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়তা করে সামাজিককল্যাণ সাধন করা। দর্শনের বিভিন্ন শাখা সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষার অভিমুখিতা নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানের, বিশেষভাবে বিভিন্ন সামাজিক

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সমন্বয়ে ঘটেছে, তাই আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ কোনোটিকে উপেক্ষা করেনি। বর্তমানে শিক্ষার মূল দুটি কাজ হল, ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে ব্যক্তিকল্যাণ সাধন করা এবং সামাজিক রীতিনীতি সংরক্ষণে ও সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়তা করে সামাজিককল্যাণ সাধন করা। দর্শনের বিভিন্ন শাখা সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষার অভিমুখিতা নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানের, বিশেষভাবে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষার কৌশলগুলি রচনা করেছে। এই কারণেই আধুনিক কালে শিক্ষাকে এক প্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিকভাবে, সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞানগুলি আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন নীতি ও ব্যবহারিক কৌশল নির্ধারণে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমানে শিক্ষার এই তাত্ত্বিকও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যার (Sociology) যে প্রভাব এসে পড়েছে তাকেই বলা হয় শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Sociological Foundation of education)। আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলির বিশ্লেষণ থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেগুলির নির্ধারণে সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার আধুনিক লক্ষ্য নির্ণয়ে সহায়তা করেছে; শিক্ষার বিষয়বস্তু তথা পাঠ্যক্রম নির্বাচনের নীতি নির্ধারণে দিক নির্দেশ করেছে। শিক্ষার প্রায়োগিক দিকে সমাজবিজ্ঞান উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি রচনায়ও বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। তাই আধুনিক শিক্ষার প্রকৃতি বিচার করতে গেলে, তার সমাজবৈজ্ঞানিক উপাদানগুলি বিচার করা একান্তভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তিকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ উভয়ই আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যক্তি এবং সমাজ এই উভয় সত্তার কল্যাণের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান সংযুক্ত। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মধ্যে যেমন তার সামাজিক বিকাশের (Social development) দিক অন্তর্ভুক্ত তেমনি সামাজিক উন্নয়ন বা অগ্রগতি ব্যক্তির কর্মদক্ষতা এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিও সমাজের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দরুন শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। তাই আধুনিক কালে, শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভূত কোনো সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সমাজবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষের চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন হয়ে চলেছে তার প্রভাবে সমাজাদর্শ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। আর সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব শিক্ষার উপর প্রতিফলিত হয়ে তাকে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত হতে সহায়তা করেছে। মনুষ্যসমাজের এই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তির ধারা অনুশীলন করলে দেখা যায়, কোনো-কোনো সময়ে পরস্পরবিরোধী ভাবনার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। সেই সংঘাতের প্রতিফলনও সমসাময়িক শিক্ষার উপর এসে পড়েছে। কিন্তু, বর্তমান শতাব্দীতে এসে মানুষের চিন্তাজগতের সেই সংঘাতের অনেকাংশে অবসান হয়েছে বলা যায়। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার (Child centric education) যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে সকল রকম পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার সমন্বয় করা সম্ভব হয়েছে। তাই আধুনিককালের শিক্ষাকে সমন্বয়ী শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। এই সমন্বয়িত শিক্ষানীতিতে মনোবিদ্যা, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির মতো বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ধারণাগুলি প্রায়োগিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সমাজবিজ্ঞানও এই প্রবণতার বহির্ভূক্ত নয়। সমাজবিজ্ঞান আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিয়েছে এবং তার অন্তর্নিহিত বহু নীতি নির্ধারণে সহায়তা করেছে। সমাজবিজ্ঞানের এই প্রভাবকে সঠিক উপলব্ধি করতে হলে আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

৩.৮.৫. শিক্ষা ও অর্থনীতি (Education and Economics) ঃ

আধুনিক শিক্ষা একটি সমন্বয়িত জ্ঞানের ক্ষেত্র (Integrated area of knowledge)। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে, আধুনিক শিক্ষা তার বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন, মনোবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, সর্বোপরি, আধুনিক প্রয়োগবাদী দর্শনের সমন্বয়ে যে শিক্ষানীতি আধুনিককালে গড়ে উঠেছে, তাতে শিক্ষার তাৎপর্য দুটি দিক থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। একটি হল তার ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দিক এবং অপরটি হল সমাজকেন্দ্রিকতার দিক। তবে শিক্ষার এই দুটি দিকের মধ্যেও আধুনিককালে সার্থক সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। শিক্ষার এই সমন্বয়ী ধারণায় সামাজিক দিকের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে, শিক্ষাবিদগণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সমাজজীবনে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলাকেই শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে নির্বান করলেন। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক সামর্থ্যকে (Social effciency) বাড়িতে তুলতে হবে। আর শিক্ষার্থীর এই সামর্থ্য বাড়িয়ে তুলতে হলে, শিক্ষাকে যে সমাজ-অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, এই সত্য আধুনিক শিক্ষাবিদগণ উপলব্ধি করলেন। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির (Economic theory) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ফলে আধুনিক শিক্ষা অনেকাংশে অর্থনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে অর্থনীতি-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি বিষয়বস্তুরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে, বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, তার অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক মানুষকে অনেক বেশি জটিল জীবন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং তার চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য অনেক বেশি জটিল দক্ষতা প্রয়োগ করতে হচ্ছে। আর এইসব দক্ষতাগুলি আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রথাগত শিক্ষার (Formal education) ফলে, জাতীয় অর্থনীতি ক্রমশ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ছে। অবশ্য এটিকে একেবারে আধুনিকপ্রবণতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ, অনেক প্রাচীন অর্থনীতিবিদ শিক্ষা ও অর্থনীতির সম্পর্কের কথা পূর্বেও উল্লেখ করেছেন। অর্থনীতির (Economics) বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করলে, এই সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে। আমরা জানি, অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হল মানুষের চাহিদা (Human want/need)। এই চাহিদা মানুষের জন্মগত বা অর্জিত দুই হতে পারে। মানুষের জন্মগত চাহিদাগুলি জৈবিক শিক্ষার মাধ্যমে সেগুলির উদগমন সম্ভব, তাই তার সঙ্গে তার অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বর্তমান। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা মানুষের মধ্যে যেমন নতুন-নতুন চাহিদার সৃষ্টি করা যায়, তেমনি শিক্ষার দ্বারাই আবার সেই চাহিদাগুলিকে উপযুক্তভাবে পরিতৃপ্ত করে প্রশমিত করা যায়। সুতরাং, অর্থনীতিতে যখন মানুষের চাহিদার প্রকৃত বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তখন তাকে অবশ্য শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। আর তা না জানলে, মানুষের চাহিদার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানা হবে না। তাই বিষয়বস্তুর দিক থেকে, অর্থনীতি ও শিক্ষাবিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৩.৮.৬. শিক্ষা ও ইতিহাস (Education and History) ঃ

শিক্ষাবিজ্ঞানের উৎপত্তি বেশি দিনের ঘটনা নয়। কিন্তু এই বিজ্ঞানের প্রভাব বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর পড়েছে। শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষিত সিদ্ধান্তগুলির ওপর ভিত্তি করেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আধুনিক শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছে। আধুনিককালে সব চিন্তাবিদ একথা স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষা বিজ্ঞান সম্মতই হওয়া উচিত। কিন্তু কোনো দেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি

করতে হলে শুধুমাত্র শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। কারণ, যে কোনো দেশে শিক্ষাব্যবস্থা সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। আদি ব্যবস্থা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে আধুনিককালে নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। আর এই বিবর্তনের ধারায় সে গ্রহণ করেছে নতুন তত্ত্ব, নতুন সিদ্ধান্ত। তাই নতুন বা আধুনিককে বুঝতে হলে, তার বিবর্তনের ধারাটি অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। এই কথাটি আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রেও আবশ্যিক। কারণ, ভারতীয় জনপদ ও ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীন জনপদ ও সভ্যতাগুলির মধ্যে একটি। তাছাড়া, একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সমকালীন অন্যান সভ্যতার থেকে ছিল উন্নত। আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা সেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতারই উত্তরাধিকারী, যেখানে শিক্ষাকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এফ. ডব্লিউ. টমাস (F. W. Thomas) বলেছেন, "Education is no exotic in India. There is no country where the love of learning had so early and origin or has exercised so lasting and powerful an influence".

একথা সম্পূর্ণভাবে সত্য যে, আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা, তার প্রাচীন অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অভিব্যক্তির নিয়মে গড়ে ওঠেনি। কারণ ভারতীয় সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত কৃষ্টির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন সময়ে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে; তার স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি এতই সজীব এবং চলমান যে, তা অচিরেই এই সাময়িক অবস্থাকে কাটিয়ে উঠেছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তার নিজস্ব খাতে আবার প্রবাহিত হয়েছে। তাই 'আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা' বলতে শিক্ষাবিদগণ যে শিক্ষাব্যবস্থাকে নির্দেশ করেন, সেখানেও কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বর্তমান। অর্থাৎ, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, জীবন অভিজ্ঞতার জালকে পরিস্রুত হয়ে আধুনিক কালে নিজগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই আধুনিক শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণে এই মূল্যায়ন সহায়তা করবে।

৩.৮.৭. শিক্ষাবিজ্ঞানে ও বিশুদ্ধবিজ্ঞান (Education and Pure science) ঃ

ভৌত বিজ্ঞান, গনিত প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সব বিজ্ঞারেন সাহায্যেই মানুষ পার্থিব ও অপার্থিব জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে; ব্যক্তি নিরপেক্ষ পরিমানসূচক, যুক্তি ও বিচারমূলক, নির্ভুল, নিশ্চিত সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর এই শিক্ষাবিজ্ঞানই এই শাস্ত্রগুলিকে গতিবান করে তোলে, সক্রিয় করে তোলে, শিক্ষার্থীকে যুক্তিবান করে তোলে, নিখুঁত ও যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। তাই এদের গবেষনালব্ধ ফলাফলকে দেশ ও জাতির কল্যানে কাজে লাগাতে হলে অবশ্যই এই বিজ্ঞানগুলিকে শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে মেলবন্ধন করা আবশ্যক।

বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষার্থীর মধ্যে চিন্তা, ধৈর্য্য, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে যা শিক্ষার্থীকে সমস্যা সমাধানে দক্ষ করে তোলে; কোনো ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে উৎসাহিত করে। শিক্ষার্থীর সহনশীলতা, অধ্যাবসায় ও সৃজনশীলতাকে বৃদ্ধি করে। ফলস্বরূপ শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজকে সহজ করে তোলে।

৩.৮.৮. শিক্ষাবিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান (Education and Social Sciences) ঃ

সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার গঠনতন্ত্র, নাগরিকত্ত্ব, নিয়মনীতি সবই একটি জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুস্থ জীবনযাপনে সহায়তা করে। কোনো দেশের ভৌগলিক অবস্থান, তার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু সবই সেই দেশের

মানুষের জীবন যাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে; উপযুক্ত অভিযোজন কৌশল রপ্ত করতে বাধ্য করায়। মানুষের অভিব্যক্তি, সমাজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা ব্যক্তিকে তার শক্তি সামর্থ্যকে যাচাই করতে সাহায্য করে। শিক্ষাবিজ্ঞান এই সকল উপাদানেরই চর্চা করে, অনুশীলন করে, ব্যক্তির সুষম বিকাশ ঘটায়, শিল্প সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। পরিবর্তিত পরিবেশে ব্যক্তি সার্থক অভিযোজনের কৌশলগুলি শিক্ষাবিজ্ঞানের মাধ্যমেই রপ্ত করে থাকে। শিক্ষাবিজ্ঞান এই সকল উপাদানেরই চর্চা করে, অনুশীলন করে, ব্যক্তির সুষম বিকাশ ঘটায়, শিল্প সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। পরিবর্তিত পরিবেশে ব্যক্তি সার্থক অভিযোজনের কৌশলগুলি শিক্ষাবিজ্ঞানের মাধ্যমেই রপ্ত করে থাকে। তাই সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

৩.৮.৯. শিক্ষাবিজ্ঞান ও সাহিত্য (Education and literature) ঃ

মানুষের মনে সৌন্দর্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের। মহাকাব্যের যুগ, প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ প্রতি যুগেই আমরা এই সাহিত্য সৃষ্টির সন্ধান পাই। কাব্য, ব্যকরণ, গল্প গাথা, পুরান প্রভৃতি থেকে আমরা সেই সময়কার শিক্ষণধারা, পঠন-পাঠন, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষালয়, সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে নানান তথ্য পাই। শুধু তাই নয়, মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে। কাব্য সাহিত্যপাঠ করা এবং তার রসোপলব্ধির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ব্যক্তির সৌন্দর্য সম্ভোগের চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে, অপর দিকে তেমনি তাদের মধ্যে উন্নত ও পরিমার্জিত রুচিবোধের সৃষ্টি হয় এবং চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটে। এই সাহিত্যই আমাদের যুগে যুগে উৎকর্ষতা বাড়িয়েছে। শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞানভান্ডারকে আরো পরিপুষ্ট করেছে।

৩.৮.১০. শিক্ষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান (Education and Technology) ঃ

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সভ্যতার যুগে, আমরা চাই আর না চাই, আমাদের জীবযাত্রার ক্ষেত্রে কারগরিবিদ্যার (Technology) প্রভাব এসে পড়েছে। রেডিও টেলিভিশন অনুরূপভাবে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে নয়, দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক মানুষকে যত রকম কাজ করতে হয়, তার সব ক্ষেত্রে কারিগরিবিদ্যা অনুপ্রবেশ করেছে। মানুষের জীবনে এই কারিগরিবিদ্যার প্রভাব ভাল কি খারাপ, সেটা বিতর্কিত বিষয়। তবে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষ যে কারিগরিবিদ্যার প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না, সেটা এখন বাস্তব সত্য। শিক্ষাবিজ্ঞানও এর প্রভাব মুক্ত নয়। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণযন্ত্র (Teaching machine), রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই যান্ত্রিক কৌশলগুলি সামগ্রিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করছে। শিখন ও শিক্ষণের (Learning & Teaching) ক্ষেত্রে এইসব যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহারের প্রবণতা থেকে শিক্ষামূলক কারিগরিবিদ্যার (Eduactional technology) উদ্ভব। অর্থাৎ, শিক্ষা প্রক্রিয়ার যান্ত্রিকীকরণ হল শিক্ষামূলক কারগরিবিদ্যা। শিক্ষাক্ষেত্রে এই যান্ত্রিক কলা-কৌশল প্রয়োগ সাধারণত তিন স্তরে করা হয়ে থাকে। টেপ রেকর্ডার, ভিডিও টেপ, চলচ্চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের (preservation of knowledge) জন্য। রেডিও, প্রজেক্টার ইত্যাদির মত যান্ত্রিক কৌশল শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের (transmission of knowledge) জন্য ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক কৌশল ব্যবহার করা হয় শিক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, এক কথায় বিভিন্ন ধরনের কারিগরি

কৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানের সংরক্ষণ, জ্ঞানের সঞ্চালন এবং জ্ঞানের প্রসারের জন্য ব্যবহার করার রীতি বর্তমানে প্রচলিত হয়েছে। তাই এই প্রয়োগবিধিকে অনেক মনে করেন, শিক্ষামূলক কারিগরিবিদ্যা। অর্থাৎ এই অর্থে শিক্ষামূলক কারিগরিবিদ্যা হল শিক্ষায় ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহ (technology in education)। অর্থাৎ শিক্ষামূলক কারিগরির প্রকৃত অর্থ হল শিক্ষা ও প্রযুক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার সমন্বয়ে রচিত শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণাবলি।

৩.৮.১১. শিক্ষাবিজ্ঞান ও রাশিবিজ্ঞান (Education and Statistics) ঃ

মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে, পরিমাপের (Measurement) প্রয়োজনীয়তাও আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তাই অনয়ন্ত্রিত বা নিয়ন্ত্রিত (Informal and formal) সবরকমের শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ধরনের পরিমাপ কৌশলের (Measuring techniques) প্রয়োগ দেখা যায়। শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিমাপ কৌশলের বিবর্তনের ইতিহাস তাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাবিদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাগত অভীক্ষা (Educational test), মনোবৈজ্ঞানিক অভীজ্ঞা (Psychological test) এবং অন্যান্য কৌশল (Other techniques) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর এই সব কৌশল প্রয়োগের ফলাফল হিসেবে, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাকে সাংখ্যমানে (Numerical value) পরিবেশন করা হয়। এই কাজে সাহায্য করছে গণিতের একটি বিশেষ শাখা যার নাম হল 'রাশিবিজ্ঞান' বা Statistics।

ইংরেজি 'Statistics' (স্ট্যাটিসটিকস) শব্দ নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণ প্রচলিত অর্থে 'স্ট্যাটিসটিকস' বলতে কতকগুলি সাংখ্যমান বা পরিসংখ্যানকে বোঝায়। অর্থাৎ কতকগুলি নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করে এবং বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করে, বিশেষ বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে সাংখ্যমানগুলি নির্ণয় করা হয় তাদের বলা হয় স্ট্যাটিসটিকস (Statistics)। এটি মূলত একটি প্রয়োগমূলক-বিজ্ঞান (Applied Science)। প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান হিসেবেই রাশিবিজ্ঞান, শিক্ষাগত ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। একজন বিশিষ্ট রাশিবৈজ্ঞানিক (Statistician) বলেছেন "Statistics is the science of organising, describing and analysing bodies of quantitative data"। অর্থাৎ, এই ধারণার অনুসরণে বলা যায়, যে বিজ্ঞানে বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা ঘটনাকে অথবা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোনো বিশেষ বস্তুকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা রাশিতথ্য সংকলন করার ও তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করার বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাকেই বলা হয় রাশিবিজ্ঞান (Statistics)।

মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে, মনের ভাব সহজ ও সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করার জন্যই এক সময় সাংখ্য সংকেতের (Symbol) প্রবর্তন করেছিলেন। তাই বর্তমানকালেও, যেকোনো যুক্তিপূর্ণ তথ্যাবলিকে সহজ ও সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করার জন্য সাংখ্য সংকেত ব্যবহার করা হয়। রাশিবিজ্ঞানে যেহেতু সাংখ্যতথ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেহেতু বস্তুজগতের যেকোনো তথ্য যথাযোগ্যভাবে পরিবেশন করার জন্য রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে আর অস্বীকার করা যায় না। রাশিবিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া আধুনিক কোনো বিজ্ঞানেরই বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। শিক্ষাবিজ্ঞানে, মনোবিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদির মতো সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) ক্ষেত্রেও প্রাপ্ত তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য বর্তমানে রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের কথা বাদ দিলেও শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগ বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৯ সারাংশ (Summary)

- শিক্ষা বলতে কোনো একটি সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে সীমিত আকারের প্রশিক্ষণকে বোঝায় না। ব্যক্তির জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ও উন্নয়ন ঘটমান তাই হল শিক্ষা।
- আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শিক্ষা হল একটি সামাজিক পরক্রিয়া এবং সেই সামাজিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় সামাজিক বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে, তাই শিক্ষা বিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান।
- শিক্ষাবিজ্ঞানের কর্মপরিধি ব্যাপক ও বহুল পরিমানে বিস্তৃত। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যক্রম, বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষার্থী পাঠ্যক্রম ছাড়াও মানবজীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই সেখানে শিক্ষা বিজ্ঞানে ছোঁয়া নেই। অর্থাৎ ব্যক্তির সুষম বিকাশের প্রতিটি উপাদানকে নিয়েই শিক্ষাবিজ্ঞান আলোচনা করে।
- শিক্ষার্থীর সকল রকম সম্ভাবনা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির সমাজকল্যান অভিমুখী বিকাশে সহায়তা করাই হল আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য।
- UNESCO নির্ধারিত শিক্ষার চারটি মূল উদ্দেশ্য হল —
  ১। জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষা
  ২। কর্মসম্পাদনের জন্য শিক্ষা
  ৩। যূথবদ্ধতার শিক্ষা
  ৪। মানুষ হওয়ার শিক্ষা

সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্র, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, কারিগরি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রাশিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

৩.১০. প্রশ্নাবলি (Questionnaire)

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি ঃ

১। শিক্ষা কী? শিক্ষা সম্পর্কে সংকীর্ণ ও ব্যাপক ধারণা বিবৃত করুন। এই ধারণা মধ্যে কোনটি আপনার কাছে গ্রহণীয় এবং কেন?

২। শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য বলতে কী বোঝায়? সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩। শিক্ষার কার্যাবলির শ্রেণিবিভাগ করুন। শিক্ষার মুখ্য কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

৪। শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য বলতে কী বোঝায়? আপনি কোন মতের সমর্থক এবং কেন?

৫। শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৬। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে কী বোঝায়? জ্ঞানমূলক শিখনের উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা করুন।

৭। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার চারটি স্তম্ভের নাম লিখুন। যুথবদ্ধতার শিখন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি ঃ

১। 'Education' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখুন।

২। 'Educare' শব্দের অর্থ কী?

৩। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কাকে বলে?

৪। জানার জন্য শিক্ষা (Learning to know) বলতে কী বোঝেন?

৫। জাতীয় শিক্ষানীতি (1968) অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য কী হওয়া উচিৎ?

৬। শিক্ষার লক্ষ্যও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জি (Refernece)

১। শিক্ষার দার্শনিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি - সুশীল রায় ও ড. সনৎ কুমার ঘোষ।

২। Theory and principles of education - J. C. Agarwal.

৩। Philosophical and Sociological Prespectives on Education - J. C. Agarwal.

৪। Principles and practices of Education. - B. R. Purkait.

৫। Philosophical based of educations - R. R. Rusk.

৬। Report of the UNESCO Commission on Education for the twenty first Century (1993-96) Detors Commission.

একক - ৪

শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল

Teaching Methods & Strategies

৪.১ **ভূমিকা** (Introduction)

৪.২ **উদ্দেশ্য** (Objectives)

৪.৩ **আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of good teaching methods)

৪.৪ **বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল** (Different types of Teaching Methods and Strategies)

৪.৫ **সারাংশ** (Summary)

৪.৬ **প্রশ্নাবলী** (Questionnaire)

৪.৭ **গ্রন্থপঞ্জি** (References)

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

পদ্ধতিবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি গতানুগতিক প্রাচীন শিক্ষণ পদ্ধতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। আধুনিককালে শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching method) সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষণ পদ্ধতি বলতে আমরা শুধুমাত্র শিক্ষকের প্রচেষ্টাকে বোঝাই না। শিক্ষক, শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ও বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যমুখী সার্থক সমন্বয়ই হল পদ্ধতি। পদ্ধতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানের তাৎপর্যেরও আধুনিককালে পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষক গতানুগতিক পদ্ধতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও তাঁর এই সক্রিয়তার তাৎপর্যের পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর এই সক্রিয়তা শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার আনুপাতিক হওয়া উচিত। অন্য দিকে বিষয়বস্তুর নির্বাচন, বিষয়বস্তুর বিন্যাস, সবকিছুই শিক্ষার্থী ও উদ্দেশ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী আধুনিক শিক্ষণে পরিবর্তনশীল। এক কথায়, সম্পূর্ণভাবে শিক্ষণ পদ্ধতি গতিধর্মী হয়েছে। এই কারণে, আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিগুলিকে শিক্ষণের গতিশীল পদ্ধতি (Dynamic method of Teaching) বলা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষার উদ্দেশ্য সামাজিকব্যবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। গতিশীল এই পদ্ধতির সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে ডি-গারমো (De Garmo) বলেছেন, "The method in the subject (matter) at any stage exactly fits a corresponding stage of development in the child." অর্থাৎ, আধুনিক যেকোনো আদর্শ পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর জীবনবিকাশের এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের সামঞ্জস্য বজায় রেখে গড়ে ওঠে। এই ধরনের গতিশীল পদ্ধতিতে যেহেতু শিক্ষার্থীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সক্রিয়তার ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেহেতু এখানে মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন নীতিও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

ফলে, আধুনিক গতিশীল পদ্ধতিগুলি মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা জানি, শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিকতারই পরিচায়ক। এই কারণে অনেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলিকে প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতি (Progressive method of Teaching) নামে অভিহিত করেছেন। তবে 'গতিশীল' পদ্ধতির দ্বারা আমরা দু'ধরনের পদ্ধতিকে বোঝাই না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত যেকোনো প্রগতিশীল পদ্ধতিই গতিধর্মী (Dynamic)। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা এরকম কয়েকটি প্রগতিশীল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব। তবে, তার পূর্বে এইসব প্রগতিশীল পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা যাক।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)ঃ

(১) শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

(২) আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা গঠন করা।

(৩) বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি যেমন সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, আবিষ্কার পদ্ধতি, বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানা।

(৪) আরোহী, অবরোহী কৌশল, প্রতিবিম্বিত শিক্ষণ, সংশোধনমূলক শিক্ষণ, মাচান নির্মাণ, মগজ ধোলাই, প্রভৃতি শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া।

৪.৩ আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলী (Characteristics of Good Teaching Method) ঃ

শিক্ষণের জন্য শ্রেণীকক্ষে আমাদের যথাযোগ্য পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। যথাযোগ্য পদ্ধতি নির্বাচন শিক্ষকের শিক্ষণ পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও নিজস্ব প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষক যখন পরিস্থিতির প্রাথমিক মূল্যায়ন করবেন এবং নিজের প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করবেন, তখন তাঁর কতকগুলি দিকের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। এই অর্থে, আধুনিক শিক্ষাবিদগণ আদর্শ পদ্ধতি বা প্রগতিশীল পদ্ধতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠ পরিচালনার সময় শিক্ষক যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে নজর রেখে তাঁর পদ্ধতি নির্বাচন করেন, তাহলে তিনি সামগ্রিকভাবে শিক্ষণে সফলতা লাভ করবেন। যেকোনো আদর্শ পদ্ধতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বাঞ্ছনীয়।

(১) সক্রিয়তা ঃ প্রগতিশীল আদর্শ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা থাকা উচিত। গতানুগতিক শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের নীরব শ্রোতার ভূমিকায় বসানো হত। তারা অন্ধভাবে শিক্ষক অনুসরণ করত। কিন্তু, আধুনিককালে, শিক্ষাবিদরা বলেছেন, শিশুকে নিষ্ক্রিয় রেখে শিক্ষণের কাজ পরিচালনা করা যায় না। আত্মসক্রিয়তাই (Self activity) শিক্ষণের আদর্শ পদ্ধতি। সুতরাং যে শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি সক্রিয়া করে তুলতে পারে, তাকেই আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(২) জীবনকেন্দ্রিকতা ঃ আধুনিক শিক্ষা শুধুমাত্র শিশুকেন্দ্রিক নয়, জীবনকেন্দ্রিক বটে। তাই শিক্ষণ পদ্ধতিও শিক্ষার্থীর জীবনকেন্দ্রিক হওয়া দরকার। বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে না পারলে, পাঠ্য বিষয়বস্তুকে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন

করতে না পারলে, তাদের প্রকৃত তাৎপর্য শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারবে না। এই কারণে, যেকোনো আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে জীবন অভিজ্ঞতার সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলার জন্য যে কৌশল ব্যবহার করবেন বা যেসব কর্ম নির্বাচন করবেন, তা যদি তিনি দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্র থেকে বেছে নিতে পারেন, তাহলে পদ্ধতির এই আদর্শগত দিক বজায় রাখা সম্ভব হবে। তাহলে আমরা একথা বলতে পারি, জীবনকেন্দ্রিক কর্মভিত্তিক পদ্ধতিই প্রগতিশীল পদ্ধতি।

(৩) **উদ্দেশ্যমুখীনতা ঃ** যেকোনো ধরনের শিক্ষণ প্রচেষ্টারই উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষণের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো বিষয়বস্তুকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছি, আমাদের শিক্ষণকেও সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। যে শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌঁছোতে সহায়তা করে না, সে পদ্ধতিকে আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তাই আদর্শ পদ্ধতির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার উদ্দেশ্যমুখীনতা। আদর্শ পদ্ধতি শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষণে সহায়তা করবে।

(৪) **অনুরাগ-সহায়ক ঃ** আধুনিক শিক্ষাবিদ এবং মনোবিদগণ স্বীকার করেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা অনেকাংশে তার অনুরাগের (Interest) ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ তার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষণ পদ্ধতি এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। অন্যভাবে বিচার করে বলা যায়, যেকোনো আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতিতে এমন কতকগুলি উপাদান থাকার দরকার, যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর মধ্যে যথাযোগ্য অনুরাগ সৃষ্টি করা যায়। অনুরাগ সৃষ্টির বিভিন্ন ধরনের কৌশল আছে। সেই কৌশলগুলি কিছু কিছু যাতে পদ্ধতি মধ্যে সন্নিবেশিত করা যায়, সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য। খুব সাধারণভাবে, পূর্বজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ের প্রতি অনুরাগ দেখা দেয়। যে পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের অগ্রগতির হার পর্যবেক্ষণ করতে পারে, সে পদ্ধতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারে।

(৫) **প্রেষণা-সৃষ্টির ক্ষমতা ঃ** প্রেষণা (Motivation) শিক্ষণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আধুনিককালে মনোবিদগণ মনে করেন, প্রেষণা ছাড়া আত্মসক্রিয়তা আসতে পারে না। তাই আত্মসক্রিয়তা যেখানে শিক্ষণের মূল নীতি, শিক্ষার্থীর প্রেষণা সেখানে একান্তভাবে প্রয়োজন। তাছাড়া, শিক্ষাকে বর্তমানে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের সীমিতকালের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। তাই বিদ্যালয়ের প্রভাবমুক্ত জীবনে শিক্ষার্থীরা যাতে আত্মসক্রিয়তার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, তার ব্যবস্থা শিক্ষার মধ্যে থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। জীবনব্যাপী শিক্ষার এই প্রস্তুতি আমরা বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য প্রেষণা সৃষ্টির মাধ্যমে করে দিতে পারি। তাই শিক্ষণ পদ্ধতি এমন হওয়া দরকার যা শিক্ষার্থীর মধে দীর্ঘস্থায়ী প্রেষণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই প্রেষণা বর্তমানে শিক্ষণে যেমন সহায়তা করবে, তেমনি অন্যদিকে বৃহত্তর জীবনে আত্মশিক্ষণে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই প্রেষণা সৃষ্টির ক্ষমতাকে আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৬) **শিক্ষণ কৌশলের সমন্বয় ঃ** শিক্ষণ পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষণ কৌশল (Teaching techniques)। শিক্ষণ কৌশলগুলি বিভিন্ন ধরনের আছে। যেমন — আলোচনা, বিবৃতি, বর্ণনা, মূর্তন, প্রশ্ন ইত্যাদি। এই কৌশলগুলির সবগুলি সমস্তক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শিক্ষণ পরিস্থিতির প্রকৃতি অনুযায়ী যথাযোগ্য কৌশল নির্বাচন করা শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যেকোনো পদ্ধতিতে শিক্ষক এক বা একাধিক কৌশল প্রয়োগ করেন। যে শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিক্ষণ উপযোগী কৌশলের সার্থক সমন্বয় হবে, তাকেই আমরা আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করব।

(৭) **অনুবন্ধ ঃ** অনুবন্ধের নীতি (Principle of Co-relation) আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে যে যান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা আনা হয়েছে, তা বিষয়বস্তুর একক জ্ঞান আহরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, এই কারণে, শিক্ষার্থীর মনধর্মের কথা বিবেচনা করে এবং জ্ঞানের বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতার কথা চিন্তা করে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষণের মাধ্যমে বিষয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের কথা বলেছেন। তাই তাঁরা মনে করেন, যে শিক্ষণ পদ্ধতি বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে অনুবদ্ধ স্থাপন করতে পারে, তাই হল প্রগতিশীল পদ্ধতি। অর্থাৎ, যে পদ্ধতিতে শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়সংক্রান্ত জ্ঞানকে এক সূত্রে আবদ্ধ করতে পারবেন, তাকেই বলা হবে আদর্শ পদ্ধতি। এই অনুবদ্ধ একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে হতে পারে, বা বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে হতে পারে, যা পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে জীবন পরিস্থিতিতে হতে পারে।

(৮) **পরিবর্তনশীলতা ঃ** আদর্শ পদ্ধতি কোনো সময় অনমনীয় (Rigid) বা অপরিবর্তনীয় হয় না। শ্রেণীকক্ষের অবস্থার বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হয়। কিন্তু শিক্ষক যদি এই পরিবর্তনের কথা বিবেচনা না করে ছকে বাঁধা নিয়ম অনুসারে শিক্ষণ পরিচালনা করেন, তাহলে তার দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীদের কখনই সার্থকভাবে সহায়তা করতে পারবেন না। বরং এই ধরনের পদ্ধতি যা বস্তব পরিবর্তনশীল অবস্থাকে অস্বীকার করে, তা শিক্ষণের ক্ষেত্রে আরও নানারকমের সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই শিক্ষণ পদ্ধতির কোনো রকম অনমনীয়ভাব থাকা উচিত নয়। নমনীয়তা বা পরিবর্তনশীল আদর্শ, শিক্ষণ পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য।

(৯) **নির্ণায়ক ক্ষমতা ঃ** শিক্ষণের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণে সহায়তা করা নয়; তাদের শিক্ষণের বিশেষ সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি নির্ধারণ করাও শিক্ষণের উদ্দেশ্য। যে শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নির্ধারম করতে পারে না, সে পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে খুব বেশি কার্যকরী হয় না। কারণ, শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য যোগ্য সংশোধনমূলক শিক্ষণের (Remedical Teaching) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির নির্ণায়ক ক্ষমতা (Diagnostic efficiency) থাকা উচিত। এই বৈশিষ্ট্য ছাড়া শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে গতানুগতিক হয়ে পড়ে।

(১০) **অনুশীলন ঃ** অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে, শিক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণে সহায়তা করা। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর বোধগম্যতায় সহায়তা করলেই যথেষ্ট। কিন্তু, আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, শিক্ষণের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি বা বোধগম্যতার বিকাশ নয়। তাঁরা মনে করেন, যে জ্ঞানের কোনো প্রয়োগ নেই তার মূল্য ব্যক্তিজীবনে নেই। সুতরাং, শিক্ষণের

মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষমতাও বাড়াতে হবে। এই জন্য চাই পরিমিত অনুশীলনের সুযোগ। তাই আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যাতে জ্ঞানের চর্চা করতে পারে, তার সুযোগ থাকা উচিত।

(১১) বিষয়বস্তুর মনোবৈজ্ঞানিক বিন্যাস ঃ বিষয়বস্তুও পদ্ধতির একটি উপাদান। আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতিতে উপস্থাপন যথাযোগ্য ক্রমে হওয়া উচিত। শিক্ষণের সময় বিষয়বস্তুর বিন্যাস এবং উপস্থাপন উভয়ই শিশুমনের উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রগতিশীল পদ্ধতিতে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও উপস্থাপন করা হয়। তাই বলা যেতে পারে, আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল বিষয়বস্তুর মনোবৈজ্ঞানিক বিন্যাস ও উপস্থাপন। অবশ্য একথাও ঠিক, শুধুমাত্র মনোবৈজ্ঞানিক উপস্থাপনের দ্বারা শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে চরিতার্থ হয় না। কারণ, মনোবৈজ্ঞানিক সংগঠন শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধাজনক হলেও বিষয়বস্তুর সঠিক আয়ত্তীকরণে সবসময় সহায়তা করে না। এর জন্য দরকার যৌক্তিক বিন্যাস (Logical organisation)। তাই আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর মনোবৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক বিন্যাসের (Psychological and Logical) সার্থক সমন্বয় হওয়া উচিত।

(১২) শিক্ষণের প্রভাব ঃ আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করে তুলবে। গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই ধরনের নির্ভরশীলতা শিক্ষার্থীর পরবর্তীকালে স্বাধীনভাবে জ্ঞান আহরণের ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেয়। এই কারণে, শিক্ষণে শিক্ষকের ওপর নির্ভরতা যাতে হ্রাস পায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। শিক্ষকের এই প্রভাব কমানো সম্ভব হবে, যদি শিক্ষণ পদ্ধতিতে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবকে কমানো যায়। তাই আদর্শ পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রভাব হবে ন্যূনতম।

(১৩) খেলাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে, শিক্ষণ পরিচালনা করার চেষ্টা করলে সম্পূর্ণ শিক্ষণ পরিস্থিতিই যান্ত্রিক হয়ে পড়বে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দিয়ে শিক্ষণকে আনন্দদায়ক করতে হলে, শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে খেলার (Play) বৈশিষ্ট্যগুলি সংযোজিত করতে হবে। অর্থাৎ, খেলাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতিকে আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কারণ এই ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি একদিকে শিক্ষার্থীদের আনন্দায়ক অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা দেয়; অন্য দিকে তাদের সৃজনাত্মক কাজে উৎসাহিত করে।

(১৪) পরীক্ষামূলক মনোভাব ঃ শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষণে শুধুমাত্র সহায়তা করে না, শিক্ষকের পেশাগত উন্নতিতেও সহায়তা করে। যে শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষককে আত্মপ্রচেষ্টার মূল্যায়নে অনুপ্রাণিত করে না, তাকে আদর্শ পদ্ধতি বলা যায় না। তাই যেকোনো শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষকের পরীক্ষামূলক মনোভাব (experimental attitude) প্রকাশ পাওয়া উচিত। এই পরীক্ষামূলক মনোভাব তাঁর আত্মবিকাশে সহায়তা করবে, তাঁকে আত্মসচেতন করে তুলবে এবং শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নীতকরণে সহায়তা করবে। সুতরাং, যেকোনো আদর্শ পদ্ধতি পরীক্ষামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১৫) ব্যক্তিগত বৈষম্য ঃ আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিকে (principle of individual difference) পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজস্ব মানসিক বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের ধারা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করবে। তাই পদ্ধতিও তাদের প্রত্যেকের উপযোগী হওয়া উচিত।

শিক্ষণের মধ্যে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজস্ব নিয়মে বিকাশের সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই ব্যক্তিগত বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও তার যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ আধুনিক আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য।

(১৬) মূর্তন ঃ আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে বিষয়বস্তুর বিমূর্ততাকে দূর করার জন্য মূর্তনের সাহায্য নেওয়া হয়। যে পদ্ধতি যত সার্থকভাবে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর সামনে মূর্ত আকারে উপস্থিত করতে পারবে, সেই পদ্ধতি তত বেশি কার্যকর হবে। তাই মূর্তনকে (Concretization) আধুনিক পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

(১৭) সামাজিক পরিবেশ ঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য সামাজিক বিকাশও। তাই শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক না করে সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলী অর্জনে সহায়তা করা শিক্ষণের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক গুণ সঞ্চারিত করার জন্য শিক্ষণ পদ্ধতিও সামাজিক পরিবেশে পরিচালিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি সামাজিক পরিবেশে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং ব্যক্তির সামাজিক বিকাশে তার পরোক্ষ প্রভাব থাকা উচিত। আধুনিক বিভিন্ন ধরনের দলগত শিক্ষণ পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্য আছে।

আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা স্মরণ রেখে এখনে কয়েকটি আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। ডাল্টন পরিকল্পনা (Dalton Plan), উইনেটকা পদ্ধতি(Winnetka Method), প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project Method), সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Method), বুনিয়াদি শিক্ষণ পদ্ধতি (Basic Method) প্রোগ্রাম পদ্ধতি (Programmed instruction) ইত্যাদি কয়েকটি পদ্ধতিকে আমরা প্রতিনিধিস্থানীয় প্রগতিশীল পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছি। তবে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার, এই সকল পদ্ধতির কোনো একটির মধ্যে আদর্শ শিক্ষণের সমস্তগুলির বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে, তাদরেও ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। বিস্তারিত আলোচনাকালে এইগুলি পরিস্ফুটিত হবে।

৪.৪ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল (Different types of Teaching Methods and Strategies)

৪.৪ ক. শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Method)

৪.৪. ক. ১. সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Method)

ভূমিকা ঃ সমস্যা (Problem) মানসিক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম। বর্তমানে সমস্যা সমাধানকে এক ধরনের শিক্ষণ কৌশল (Learning technique) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আবার, যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সমবেত প্রচেষ্টায় শিক্ষামূলক কোনো অসুবিধা দূর করে তাকেই সাধারণ অর্থে বলা হয় শিক্ষামূলক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া (Educational problem solving)। এই বিশেষ কৌশলকে শিক্ষণের সামগ্রিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার রীতি দীর্ঘদিন প্রচলিত আছে। সক্রেটিসের শিক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা লক্ষ করি, তিনি সমস্যা সৃষ্টির পর পর্যায়ক্রমে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তার সমাধানে অগ্রসর হতেন। অর্থাৎ, মৌলিক সমস্যা সমাধানের কৌশলই ছিল তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির মূল ভিত্তি। এই কৌশলকেই আধুনিক আবিষ্কারক পদ্ধতিরও (Heuristic Method) ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যার সর্বজনীন গুরুত্ব সম্পর্কে জর্জ জনসন

(George Johnson) বলেছেন— "The best way to train the mind is to confront it with real problems and to give it the opportunity and freedom to solve them." বহু প্রাচীনকাল থেকে 'সমস্যা সমাধানের' কাজের শিক্ষামূলক উপযোগিতার কথা স্বীকার করা হলেও এবং তাকে শিক্ষণ কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হলেও, স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Method) হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞানে তার স্বীকৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে মিলেছে। আধুনিক সমস্যা সমাধান পদ্ধতির মূল ভিত্তি হল জন ডিউই-এর চিন্তন সংক্রান্ত নীতি। এই নীতি সম্পর্কে আলোচনা করলে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে।

সমস্যা ও চিন্তন ঃ জন ডিউই বলেছেন, চিন্তন হঠাৎ সংঘটিত হয় না বা শুধুমাত্র বস্তুধর্মী সংবেদন (Sensation) চিন্তন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। আবার কোনো কিছুর অবর্তমানেও চিন্তন হয় না, চিন্তন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য কোনো কিছু থাকার প্রয়োজন। জীবনের সব কিছু ঘটনা যখন স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হয় বা জীবনের সমস্ত চাহিদার পরিতৃপ্তি যখন সহজে স্বাভাবিক নিয়মে করা যায়, তখন চিন্তনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, কোনো কারণে জৈবিক অবস্থা বা পরিবেশের যদি পরিবর্তন হয়, তাহলেই ব্যক্তি চিন্তিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যে পর্যন্ত দৈনন্দিন ঘটনাসমূহ স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত হয়, সে পর্যন্ত আমাদের চিন্তনের কোনো প্রয়োজন হয় না। জীবনের সমস্ত চাহিদা যদি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেটানো সম্ভব হয়, তাহলে কোনো সমস্যাই থাকে না, চিন্তনেরও প্রয়োজন হয় না। সুতরাং, যে পরিস্থিতিই জীবনের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়, তাই চিন্তন প্রক্রিয়াকে শুরু করতে পারে। অন্যদিকে যেকোনো পরিবর্তনশীল অবস্থাই ব্যক্তির জীবনের গতানুগতিক ভারসাম্য (Equilibrium) নষ্ট করে। ফলে, এই পরিস্থিতিই তার কাছে সমস্যা (Problem)। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার বা জীবনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন কৌশল উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় এবং চিন্তন প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়। সুতরাং, ডিউই-এর মতে, চিন্তনের মূল উৎস হল সমস্যা। ডিউই আরও বলেছেন, সমস্যামূলক চিন্তনে ব্যক্তি প্রথমত সমস্যাটির প্রকৃতি অনুধাবন করার চেষ্টা করে; সমস্যামূলক পরিস্থিতিটি বিশ্লেষণ করে। এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াটি নির্বাচন করা, যার সাহায্যে পরিস্থিতিতে সার্থক অভিযোজন করা সম্ভব হবে। পরবর্তী স্তরে ব্যক্তি কতকগুলি প্রকল্প (Hypothesis) গ্রহণ করে। এরপর এই প্রকল্পগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সমস্যাটি সমাধানে অগ্রসর হয়। এই অনুমানের মধ্যে যেটি সমস্যাটির সমাধানে সহায়তা করে বা জীবনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়, সেই আচরণটিকে ব্যক্তির সমস্যার সমাধান হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ, ব্যক্তির আচরণ বা সক্রিয়তা তার চিন্তনের রীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। "Thinking is the function of activity." সুতরাং, এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সমস্যা, কাজ বা সক্রিয়তা এবং চিন্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমস্যামূলক পরিস্থিতি ব্যক্তিজীবনের স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে চিন্তন প্রক্রিয়া শুরু করে এবং তার ফলে ব্যক্তির মধ্যে আচরণগত সক্রিয়তা দেখা দেয়।

শিক্ষা ও সমস্যা ঃ শিক্ষাগত দিক থেকে এই সমস্যা সমাধান ডিউই-এর শিক্ষাদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডিউই বলেছেন, শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত জীবন সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং এই সমস্যা সমাধানের প্রত্যক্ষই অভিজ্ঞতা থেকে তাদের শিক্ষা হয়। "Life is a byproduct of activities and

education is born out of these activities." সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। অন্যদিকে আমরা দেখেছি, শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা তার জীবনসমস্যার ওপর নির্ভরশীল। তাই শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করার জন্য তাকে প্রকৃত সমস্যার সম্মুখীন করতে হবে। শিক্ষা এবং সমস্যা সমাধানের (Problem solving) এই পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির (Problem Method) সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, ডিউই (Dewey) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আধুনিক সমস্যা সমাধান শিক্ষণ পদ্ধতির (Problem Method of teaching) উদ্ভাবনে সহায়তা করেছেন।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির স্বরূপ (Nature of Problem Method)

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির মূল কথা হল বিষয়বস্তুর সমস্যামূলক উপস্থাপন। শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক চিন্তন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করতে হলে পাঠ্য বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে একটি সমস্যার আকারে উপস্থাপিত করতে হবে। বসিং বলেছেন - "The Problem Method consists of organisation of the school work. In such a way as to present to the mind of the learner a genuine problem that challenges him to sustained effort to achieve its solution on a mental plane." । সমস্যা সমাধান পদ্ধতির এই সংজ্ঞা থেকে আমরা তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। প্রথমত, এই পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর বিশেষ ধরনের বিন্যাস প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন হবে সমস্যার আকারে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলেই শিক্ষণ হয় না। সমস্যাটি এমন হওরয়া উচিত যা শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থাকে সক্রিয় করে তুলতে পারে। অর্থাৎ, সমস্যা জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত হলেই, তবে তা শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে পারে। চতুর্থত, সমস্যাটির সমাধান শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, কোনো প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়। এখানেই সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সঙ্গে প্রোজেক্ট পদ্ধতির পার্থক্য। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যার আকারে উপস্থাপন করা হয়, তাকেই বলা হয় সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। এই সমস্যার সমাধান শিক্ষার্থীর মানসিক সক্রিয়তার মানসিক স্তরেই সম্পন্ন হয়।

সমস্যা পদ্ধতির পরিচালনা (Organisation of Problem Method)

সমস্যা সমাধান একটি জটিল প্রক্রিয়া; আবার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই পদ্ধতি জন ডিউই-এর (Dewey) চিন্তনের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জন ডিউই বলেছেন, সৃজনমূলক চিন্তনের পাঁচটি স্তর আছে। এখন যেহেতু সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে সমস্যার মানসিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেহেতু ডিউই-এর নীতির ওপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতি রচিত হয়েছে। ডিউই-এর সৃজনাত্মক চিন্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সমতা রেখে বসিং এবং মার্টিন (Bossing & Martin) সমস্যা সমাধান পদ্ধতি পরিচালনার পাঁচটি স্তরের কথা বলেছেন। যেমন - ১) অসুবিধা নির্ধারণ (Recognising the difficulty), ২) অসুবিধাটিকে সমস্যার আকারে উপস্থাপন বা সমস্যা নির্ধারণ (Defining the Problem); ৩) সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা (Attacking the Problem) ; ৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Drawing Conclusion) এবং ৫) সিদ্ধান্তের প্রয়োগ (Implementing Conclusion)। বহু শিক্ষাবিদ সমস্যা সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তার পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের স্তর নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু বসিং এবং মার্টিন প্রস্তাবিত এই পরিচালন পদ্ধতি সর্বাঙ্গসুন্দর, এ হিসেবে আমরা এর সম্পর্কেই আলোচনা করব।

(১) অসুবিধা নির্ধারণ ঃ ডিউই বলেছেন, সৃজনাত্মক চিন্তা বিশেষ মানসিক অসুবিধা সম্পর্কে আত্মচিন্তা থেকে শুরু হয়। আধুনিক শিক্ষাবিদরা বলেছেন, সমস্যাকে যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হয়, তাহলে সেই সমস্যাও শিক্ষার্থীর আত্মচিন্তা থেকে সৃষ্টি হওয়া উচিত। তাই, সমস্যা সমাধান পদ্ধতির প্রথম পর্যায় হল—শিক্ষার্থীকে তার সেই বিশেষ অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন করা, যেটির সুষ্ঠু সমাধানের মাধ্যমে তাকে শিক্ষণমূলক অভিতা দেওয়া হবে। সেই সমস্যার সঙ্গে শিক্ষার্থীই যদি তাদাত্ম্য স্থাপন করতে না পারে, তাহলে সমস্যা সমাধান সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক হয়ে পড়বে। তাই সমস্যা সবসময় শিক্ষার্থীর অনুভূত চাহিদা বা অভাব থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসা উচিত। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভাববোধ বা অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন। বিশেষ ধরনের পরিস্থিতিতে তারা কী কী অসুবিধা অনুভব করে, তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্বাচন করবেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি নিম্নলিখিত ক্রমে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণে অগ্রসর হবেন -

(১) শিক্ষার্থীদের অসুবিধা বা অভাববোধের সাধারণ ক্ষেত্র নির্ধারণ।

(২) অভিজ্ঞতার বিস্তৃত ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অসুবিধা বা অভাব ঠিক কোন দিক থেকে আসছে, তা নির্ধারণ (Discover the particular aspects that are disturbing)।

(৩) সর্বশেষে, অভাববোধের প্রকৃতি নির্ধারণ (Determining the nature of difficulty)। অর্থাৎ এই অভাব কোনো বিশেষ শিক্ষার্থীদের, কী সমগ্র শ্রেণীর তা বিচার করা প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে শিক্ষক সমগ্র শ্রেণীর জন্য একটি সমস্যা নির্ধারণ করবেন। এই তিনটি প্রক্রিয়ায়, প্রথমত, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিশেষ অভাব (Need) সম্পর্কে অবগত হবেন এবং শিক্ষার্থীদের এ সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন। এই পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত বিশেষ কোনো ঘটনাকে শিক্ষার্থীদের সাহায্যে বিশ্লেষণ করবেন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে তাদের একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্বাধীন মতামত বা চিন্তাধারা ব্যক্ত করবে। শিক্ষক তাদের আলোচনাকে যথাযোগ্য পথে নির্দেশিত করে প্রকৃত অসুবিধাটি তাদের কোথায়, তা নির্ধারণে তাদের সহায়তা করবেন।

(২) সমস্যা নির্ধারণ ঃ দ্বিতীয়স্তরে, শিক্ষার্থীরা তাদের অসুবিধা বা অভাববোধটিকে একটি সমস্যার আকারে উপস্থাপন করবেন। এই পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা উল্লেখ করবেন। অর্থাৎ তাদের অসুবিধাটি সমস্যার আকারে প্রকাশ করবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রস্তাবিত সমস্যাটি শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। কোনো শিক্ষার্থীকে তিনি এব্যাপারে নিরুৎসাহ করবেন না। সমস্ত প্রস্তাবগুলি এসে গেলে সমস্যাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণে অগ্রসর হবেন। এই আলোচনায় শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অভাবটির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণের আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রস্তাবিত বিভিন্ন সমস্যাগুলির কোনটির সমাধান শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণভাবে পূরণে সাহায্য করবেন, এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সেটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। এই আলোচনার শেষে শিক্ষক মূল একটি সমস্যা নির্বাচন করে সেটিকে বোর্ডে লিখবেন। যদি দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের প্রস্তাবিত একের অধিক সমস্যা এই উদ্দেশ্যে সাধনে সক্ষম, সেক্ষেত্রে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে সমস্যা নির্বাচন করবেন। সমস্যা নির্বাচনের সময় শিক্ষক আদর্শ শিক্ষামূলক সমস্যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে নজর রাখবেন এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের আলোচনাকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

(১) নির্বাচিত সমস্যার নির্দিষ্ট শিক্ষাগত মূল্য (Definite educational value) থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন করা উচিত; এই চাহিদা বিচার করতে গিয়ে, তিনি তাদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশের কথা বিচার করেবন।

(৩) সমস্যাটি এমন হওয়া দরকার, যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সকলরকম তথ্য শিক্ষার্থীরা সহজে সংগ্রহ করতে পারে।

(৪) সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে, অতিরিক্ত সময় শিক্ষণের জন্য ব্যয় করতে হয়। এখন এই অতিরিক্ত সময় ব্যয় করলে, সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত কী কী বেশি জ্ঞান আহরণ করতে পারে, সমস্যা নির্বাচনের সময় তা বিচার করে দেখার দরকার। অর্থাৎ, অতিরিক্ত সময় ব্যয় করলে, অপেক্ষাকৃত ভলো ফল পাওয়া যাবে কিনা বিচার করার দরকার।

(৫) সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করতে হলে বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হয়। সমস্যা নির্বাচনের সময় বিচার করার দরকার, সমস্যা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে কিনা।

(৬) সমস্যা নির্বাচনের সময় তার ব্যয়ের দিকও বিচার করে দেখার প্রয়োজন।

(৭) সমস্যার সমাধান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা যাবে কিনা, সে কথা বিচার করে সমস্যা নির্বাচন করতে হয়।

(৩) সমাধান প্রচেষ্টা ঃ সমস্যা সমাধান পদ্ধতির তৃতীয় স্তরে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষভাবে সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হবে। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করে তার সম্বন্ধে প্রকল্প (Hypothesis) গ্রহণ করবে এবং এই প্রকল্পের ভিত্তিতে তারা অগ্রসর হবে। ডিউই-এর সমস্যা সমাধানের এই পর্যায়ের ওপর ভিত্তি করে বসিং এবং মার্টিন (Bossing, Martin) কতকগুলি ব্যবহারিক কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রথমত সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ করবে। এই তথ্য সংগ্রহের (Collection of data) জন্য তারা পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে -

(১) শিক্ষার্থীরা প্রথমত সমস্যা সংক্রান্ত তাদের পূর্বজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করবে।

(২) অন্যান্য শিক্ষার্থী এ সম্পর্কে কী জানে, তাও তারা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবে।

(৩) অন্যান্য ব্যক্তি এই সম্পর্কে কী জানে বা কী ধরনের তথ্য সরবরাহ করতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করবে।

(৪) পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা স্থির করবে, অতিরিক্ত আর কী কী তথ্যের প্রয়োজন। এইসব অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে। এই তথ্য সংগ্রহের কাজে এবং তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত আলোচনায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য নির্দেশনা দেবেন।

(৫) এই স্তরের পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সংগৃহীত তথ্য কীভাবে রেকর্ড করবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। শিক্ষক আলোচনার ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাৎপর্যপূর্ণ পদ্ধতিতে

তথ্য সংরক্ষণের কৌশল সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন। তথ্যগুলির যথাযোগ্য বিন্যাসে সংরক্ষণ, সমস্যা সমাধান পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুতরাং, এ ব্যাপারে শিক্ষক বিশেষভাবে সর্তকতা অবলম্বন করবেন।

(৬) এই স্তরের সর্বশেষ পর্যায়ে, শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত তথ্যের সবগুলিই সমস্যার সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ নাও হতে পারে। তথ্যগুলির বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলিকে নির্বাচন করতে সহায়তা করবে।

(৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ সমস্যা সমাধানের পদ্ধতির চতুর্থ স্তরে শিক্ষার্থীরা পূর্বের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমস্যার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সংগৃহীত তথ্যগুলির দ্বারা শিক্ষার্থীর যে প্রকল্পটি (Hypothesis) সত্য প্রমাণিত হচ্ছে, তাকেই তারা সমস্যা সম্পর্কিত সাধারণ সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ও বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছে, তার ভিত্তিতে সমস্যা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় কিনা, তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যদি ভুল কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে শিক্ষার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

(৫) প্রয়োগ ঃ এই পদ্ধতিতে সর্বশেষ স্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করে। যদি সিদ্ধান্তে ঠিক করা হয় যে, এসম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন, তাহলে সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা অগ্রসর হয়। আর সিদ্ধান্তটি যদি স্থির হয়, তাহলে দৈনন্দিন জীবনে তার তাৎপর্যের কথা বিচার করে তাকে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এটি আমরা এই পদ্ধতির অভিযোজন স্তর হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

আলোচনা ঃ সমস্যা সমাধানের এই সকল কার্যকর স্তরে যদিও শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সমস্ত পর্যায়ে কাজ করবে, তাহলেও এসম্পর্কে শিক্ষকের দায়িত্ব কিছু কম নয়। সমস্যা সমাধানের প্রত্যেক স্তরে তিনি পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের আলোচনার ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করবেন। শিক্ষার্থীরা যখন সমস্যা নির্বাচন করবে, তাদের নির্বাচিত সমস্যা যাতে শিক্ষামুখী হয়, সে দিকে তিনি নজর রাখবেন। আবার তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি তাদের সহায়তা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে তথ্যগুলির বিশ্লেষণ যাতে উদ্দেশ্যমুখী হয়, সেদিকেও তাঁর বিশেষভাবে নজর রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোনো অসুবিধা হলে তিনি তাদের প্রত্যক্ষভাবেও সহায়তা করবেন। অর্থাৎ, এক কথায় সমস্যা সমাধান পদ্ধতির পরিচালনায়, তিনি শিক্ষার্থীদের মতামতের ওপর আপাতগুরুত্ব দিলেও, সবসময় তিনি সমগ্র পরিস্থিতিকে তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবেন।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Problem Method)

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বিশেষ বিশেষ সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। এইসব সুবিধাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটির কথা আমরা এখানে উল্লেখ করব। যেমন -

(১) জীবনভিত্তিক শিক্ষা ঃ সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীর জীবনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সমস্যা থাকে এবং সেই সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে জীবনের অগ্রগতির ধারা বজায় থাকে। এভ্রিল (L.A.Averill) বলেছেন -"The only worthwhile life is a life which contains its problems; to live without any longings and ambitions is to live only halfway."। জীবনের সমস্যা সমাধান যখন এতই গুরুত্বপূর্ণ, তখন শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের কৌশল আয়ত্তীকরণে সহায়তা

করতে হবে। সমস্যা সমাধান পদ্ধতি জীবনের এই অতি প্রয়োজনীয় কৌশল অর্জন করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে; শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

(২) অনুরাগ ঃ সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কারণ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে বলে তাদের অনুরাগ ধরে রাখা সম্ভব নয়।

(৩) স্বাধীন চিন্তা ঃ এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা কোনো বিশেষ বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এই ক্ষমতা বিকাশ, ব্যক্তিসত্তার বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষান্তে শিক্ষার্থীরা যখন সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তখন তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করতে হবে। স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের ক্ষমতা এই পদ্ধতির সাহায্যে বিকাশ করা যায়।

(৪) মানসিক সক্রিয়তা ঃ সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে যদিও শিক্ষার্থীরা মানসিক পর্যায়ে সমস্যা সমাধান করে, তাহলেও, শ্রেণীকক্ষে তারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং, এই পদ্ধতিকে সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কর্মমূলক সক্রিয়তা যেমন জীবনের পক্ষে উপযোগী, তেমনি চিন্তনমূলক সক্রিয়তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(৫) মানসিক ক্ষমতার গুরুত্ব ঃ গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের স্মৃতির (Memory) ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে, শিক্ষার প্রয়োগমূলক দিকের চেয়ে যান্ত্রিক আবৃত্তির ওপরই সেখানে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে, শিক্ষায় বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৬) এই পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান পুনরাবিষ্কার (Rediscover) করে। এখানে অনুকরণ (Imitation) অপেক্ষা সৃজনীস্পৃহার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে, শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে না, প্রত্যক্ষ যুক্তি ও বিচারের আলোকে নতুন তাৎপর্য লাভ করে।

৭) এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীদের নানারকমের সামাজিক বৈশিষ্ট্যেরও বিকাশ হয়। তারা অন্যের মতামতকে সহ্য করতে শেখে। অন্যের মতামতের যোগ্য মর্যাদা দিতে শেখে। তাছাড়া, পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করে বলে নানা ধরনের সামাজিক প্রবৃত্তিরও বিকাশ হয়।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Problem Method)

অসুবিধা ঃ সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধার কথাও যেমন অনেক শিক্ষাবিদ বলেছেন, তেমনি তার অসুবিধার কথাও অনেকে বলেছেন। যেমন, প্রথমত, অনেকে বলেছেন, এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা সব সময় বজায় রাখা সম্ভব হয় না। কারণ পাঠ্যক্রমের সমস্ত অংশগুলিকে সমস্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় না। দ্বিতীয়ত, অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন, সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীর সুস্থ পাঠ্যাভ্যাসে (Reading habit) গড়ে ওঠে না। সমস্যা সমাধানের জন্য যেটুকু অংশ তারা পড়ে, অন্য অংশ পড়ে না। ফলে, তাদের পাঠের অভ্যাস নষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয়ত, সমস্যা পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে অনেক সময় দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর জ্ঞান অপেক্ষা সমস্যার সমাধানটির ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

ফলে, শিক্ষার প্রকৃতি উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। চতুর্থত, অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন, সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সঙ্গে গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এখানে যে সক্রিয়তার কথা বলা হয়েছে, সেই সক্রিয়তা শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করতে ভালোবাসে। এই পদ্ধতিতে তার বিশেষ কোনো সুযোগ নেই। শিক্ষা এখানে কর্মভিত্তিক নয়।

মন্তব্য ঃ সমস্যা সমাধান পদ্ধতির এই অসুবিধা আছে বলে, প্রয়োগ করার সময় শিক্ষককে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সমস্যা সমাধান পদ্ধতির প্রকৃতির বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, এর মধ্যে প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতির সমস্ত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তার যে বিশেষ অসুবিধার কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলি পরিচালনার ত্রুটির জন্য আসতে পারে। তাই শিক্ষক যদি তার প্রয়োগের মধ্যে কোনো ত্রুটি না রাখেন এবং সুষ্ঠুভাবে এই পদ্ধতি পরচিালনা করতে পারেন, তাহলে এর মাধ্যমেই ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। বিশেষভাবে, বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকর হয়। তার কারণ, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মনে আবিষ্কারের স্পৃহা (Huristic Spirit) জাগ্রত করতে পারে। প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project Method), মরিশন প্ল্যান (Marrison plan) ইত্যাদির মতো আধুনিক পদ্ধতিগুলিতে এই সমস্যা সমাধান পদ্ধতির মূল নীতিগুলিকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

৪.৪ক.২. আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic Method)

প্রস্তাবনা ঃ শিক্ষণ হল শিক্ষার্থীদের শিখন প্রচেষ্টায় সহায়তা করার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, ব্যক্তিজীবনের বিকাশের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা চলছে, তাকে সহায়তা করাই শিক্ষণের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি রচিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গেছে, কোনো পদ্ধতিই এককভাবে , শিক্ষণের সমস্ত উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে পারে না। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, শিক্ষার্থীর প্রকৃতি এবং শিক্ষণ-পরিবেশের প্রকৃতি ভেদে, শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু এমন কিছু নীতি আছে, যেগুলি সবরকমের শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। তার মধ্যে সমস্যা সমাধানের নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক মনোবিদ্যায়, এই ধরনের শিখনকে বলা হয় আবিষ্কারভিত্তিক শিখন (Discovery)। ব্রুনার (Bruner) ও অন্যান্য মনোবিদগণ এই আবিষ্কারভিত্তিক শিখনের উপর বহু পরীক্ষা নীরিক্ষা করেছেন এবং এসম্পর্কে বিশেষ তত্ত্ব গঠন করেছেন। ফলে, এই জাতীয় শিখনে সহায়তা করাও শিক্ষকের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে, আবিষ্কারের নীতি গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আবিষ্কার প্রচেষ্টায় সহায়তা করা শিক্ষণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে নতুন কিছু শিক্ষণ পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে আবিষ্কার পদ্ধতি বা হিউরিস্টিক পদ্ধতি (Heuristic Method) হল একটি।

ইংরাজি 'Heuristic' শব্দটির ব্যুৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'Heurisko' থেকে। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল - 'খুঁজে বের করা' অথবা 'আবিষ্কার করা'। তাই একে বলা হচ্ছে আবিষ্কার পদ্ধতি। অর্থাৎ, যে শিক্ষণ পদ্ধতিতে আবিষ্কার করার মূলনীতিকে কাজে লাগানো হয়, তাকেই সাধারণভাবে বলা হয় আবিষ্কারক পদ্ধতি (Heuristic Method)। লন্ডনের সিটি ও গিল্ড ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক আর্মস্ট্রং (Prof. H.E.Armstrong) শিক্ষণের জন্য এই পদ্ধতির প্রথম প্রস্তাব করেন। আর্মস্ট্রং নিজে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শিক্ষার্থীদের যদি বিশেষভাবে পরীক্ষাগার ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তবে তাদের বিজ্ঞান শিক্ষা

অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং তাদের মধ্যে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্পৃহা জাগানো সম্ভব হবে। সৃজনাত্মক অনুসন্ধানের স্পৃহা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করাই হবে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং, শিক্ষণ পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের স্পৃহা (Spirit of scientific inquire) জাগ্রত করা যায়। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে, শিক্ষার্থীদেরকে আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। আর্মস্ট্রং বলেছেন - "Heuristic Methods of teaching are methods which involve our placing students as far as possible in the attitute of the discoverer methods which involve thier finding out instead of being merely told about things." অর্থাৎ আবিষ্কার পদ্ধতি হল এমন এক শিক্ষণ পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষার্থীকে যতদূর সম্ভব আবিষ্কারকের ভূমিকা দেওয়া হয় এবং যেখানে, তাদেরকে তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে, তথ্যানুসন্ধানে উৎসাহিত করা হয়। অধ্যাপক আর্মস্ট্রং এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য প্রস্তাব করলেও, বর্তমানে এই পদ্ধতিকে অন্যান্য বিষয় শিক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। তাই শিক্ষণের একটি সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে আমরা এখানে তার বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করব।

আবিষ্কার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ঃ গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি (Traditional Teaching Method) বা বক্তৃতা পদ্ধতির (Lecture Method) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে, এই আবিষ্কার পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। তাই বক্তৃতা পদ্ধতির যে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান, সেগুলির বিপরীত বৈশিষ্ট্য এই পদ্ধতির মধ্যে দেখা যায়। এই পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—

(১) এখানে, শিক্ষণ কোনো বিশেষ সমস্যার সমাধান আবিষ্কারের মাধ্যমে হয়। অর্থাৎ, শিক্ষণ এখানে যান্ত্রিক নিয়মে হয় না। শিক্ষার্থীদেরই তথ্য সংগ্রহে উৎসাহিত করা হয়।

(২) এই পদ্ধতিতে শিক্ষক আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করে। কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার স্বাধীনতা শিক্ষার্থীর থাকে। শিক্ষকের বক্তব্যকে অভ্রান্তহিসেবে গ্রহণ করে নেয় না।

(৩) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তন দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করেন না।

(৪) এই পদ্ধতিতে মানসিক সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দৈহিক সক্রিয়তার সুযোগ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, তারা হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ পায়।

(৫) এই পদ্ধতিতে শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তথ্যানুসন্ধানের কৌশলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ, এখানে শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষাবিদ ওয়েস্টঅ্যাওয়ে (Westway), এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন - "Essentially, therefore, the heuristic method is intended to provide a training is method. Knowledge is a secondary consideration altogether."।

(৬) এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনার সময়, শিক্ষককে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য পরিবেশন করতে হয় না; তিনি সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেন মাত্র। সুতরাং, আবিষ্কারক পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, এটি আমাদের গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

আবিষ্কার পদ্ধতির পরিচালনা (Organisation of Heuristic Method)

আবিষ্কার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা লক্ষ করেছি, এখানে শিক্ষার্থীকে মুখ্য ভূমিকা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় । তাই অনেকে মনে করেন, এই ধরনের পাঠ পরিচালনায় শিক্ষকের কিছু করণীয় নেই, সব কিছু শিক্ষার্থীরা করবে। কিন্তু আবিষ্কার পদ্ধতির প্রকৃত তাৎপর্য তা নয়। কারণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পূর্বঅভিজ্ঞতা এমন কিছু থাকে না যে, তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে পারে। আবার, তাদের মানসিক সংগঠনও এত পরিণত নয় যে, তারা প্রকৃত আবিষ্কারকের মতো কাজ করবে। ফলে, শিক্ষকের সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। তাছাড়া, আরও একটি দিক আছে। আমরা একে আবিষ্কার পদ্ধতি বললেও, এখানে শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু সত্য আবিষ্কার করছে, তাও ঠিক নয়। শিক্ষণের এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলিকে শিক্ষার্থীরা পুনরাবিষ্কার (Rediscover) করে বলাই ভালো। তাই শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত যাতে প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরুদ্ধে না যায়, সেদিকেও শিক্ষককে লক্ষ রাখতে হয়। ফলে, এই পদ্ধতিতে কাজ করার সময়, শিক্ষকের ভূমিকার পরিবর্তন হয় মাত্র, তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন না। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষককে কয়েকেটি পর্যায়ে কাজ করতে হয়।

প্রথমত, শিক্ষক যেকোনো বিষয়বস্তুকে সমস্যার আকারে উপস্থাপন করবেন। অর্থাৎ, প্রথম পর্যায়ে শিক্ষকের কাজ হল, যেকোনো পাঠ্য বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমস্যা সৃষ্টি করা। অনেক শিক্ষাবিদ বলেছেন, এই সমস্যা সৃষ্টির সময়, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। সমস্যাটিকে যদি শিক্ষার্থীদের কোনো বিশেষ চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানমুখী প্রেষণার সঞ্চার হয় এবং তাদের কাজে আগ্রহ দেখা যায়। তাই এই পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়ে, শিক্ষক প্রথমত শিক্ষার্থীদের সহায়তায় একটি সমস্যা সৃষ্টি করবেন। সাধারণ কোনো তথ্যভিত্তিক বিবৃতি দিয়ে পাঠ শুরু হবে না। যেমন - বিজ্ঞান শিক্ষণের সময় আমরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে একটি বিবৃতি দিয়ে তথ্য পরিবেশন করি। ''নিম্নলিখিত কতকগুলি কারণে লোহায় মরিচা পড়ে'' এই পদ্ধতিতে আমরা একই বিষয়বস্তুকে সমস্যার আকারে উপস্থাপন করব ''লোহায় মরিচা পড়ে কেন, তোমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে''। আবার অনেক সময়, শ্রেণীতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার সময় গতানুগতিক পদ্ধতিতেও শিক্ষার্থীদের বলি ''প্রমাণ কর''। যেমন - জ্যামিতি শিক্ষণের সময় আমরা উপপাদ্যটি বিবৃত করি - ''ত্রিভুজের দুটি বাহু সমান হলে প্রমাণ কর যে ওই সমান সমান বাহুর বিপরীত কোণগুলিও সমান হবে''। এই ধরনের বিবৃতিতে ''প্রমাণ কর'' নির্দেশ থাকলেও, আবিষ্কারক পদ্ধতির উপযোগী নয়। আবিষ্কারক পদ্ধতিতে সমস্যাটি নিম্নলিখিতভাবে পরিবেশন করা উচিত - ''XYZ ত্রিভুজে, $\angle XYZ = \angle XYZ$; XY ও XZ বাহুর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো''। সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, আবিষ্কারক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে বিষয়বস্তুকে সমস্যার আকারে উপস্থাপন করার জন্য শিক্ষককে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হয়। এই সমস্যা রচনার উপর নির্ভর করে, শিক্ষক সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবিষ্কারকের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পৃহা জাগ্রত করতে পারবেন কিনা।

অনুসন্ধান ঃ এই পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায়ে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানের সুযোগ দেবেন। কারণ, শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহের মাধ্যমে ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে পুনরাবিষ্কার করবে। কিন্তু, আবিষ্কার পদ্ধতির মূলনীতি তা নয়। শিক্ষার্থীরা সাহায্য চাইলে শিক্ষক তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করারই পরামর্শ দেবেন, তাই নয়, তিনি তাদের উপযুক্ত সাহায্যও করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষক যেমন সম্পূর্ণ তথ্য

শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করবেন না, তেমনি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবেন না। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী তিনি পরিমিত সাহায্য করবেন এবং তারা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করে, সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন। এই পর্যায়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য দুটি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। প্রথমত, তিনি শিক্ষার্থীদের একটি নির্দেশিকা পত্র বিতরণ করতে পারেন। এই নির্দেশিকা পত্রে শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হবে, যার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানে অগ্রসর হবে। সাধারণভাবে বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য এই জাতীয় নির্দেশনা পত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা যেতে পারে। আবার, শিক্ষক অন্যভাবে প্রশ্ন উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন অনুসন্ধানে সহায়তা করতে পারেন। যেমন, গণিতের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আবিষ্কারকের স্পৃহাকে জাগ্রত করতে পারেন। এই ধরনের প্রশ্নকে বলা হয় আবিষ্কারমুখী প্রশ্ন। যেমন পূর্বোক্ত জ্যামিতির উদাহরণে, বোর্ডে উপপাদ্যটির প্রমাণ লিখে না দিয়ে বা নিজে প্রমাণের চেষ্টা না করে, শিক্ষার্থীদের সামনে পর্যায়ক্রমে কতকগুলি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে পারেন এবং তাদের চিন্তা করার সুযোগ দিতে পারেন। যেমন - ''XYZ ত্রিভুজটির XY ও XZ বাহু দুটি দেখে তোমাদের কী ধারণা হয়?'' ''XY ও XZ রেখা দুটি যে সমান তা জ্যামিতিতে যুক্তির দ্বারা কীভাবে প্রমাণ করা যায়?'' ''XYZ ত্রিভুজের মধ্যে দুটি সর্বসম ত্রিভুজ কীভাবে আঁকা যায়?'' ''XYZ ত্রিভুজকে যখন দুটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করা যাচ্ছে, তখন তার থেকে কী সিদ্ধান্ত করা যাবে?'' শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারলে, তাদের আবিষ্কারের কাজ সম্পূর্ণ হবে, অর্থাৎ, তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে যে, ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর বিপরীত কোণগুলিও সমান।

আলোচনা ঃ পূর্বোক্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষণের সময় শিক্ষককে আরও একটি পর্যায়ে কাজ করতে হয়। শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক অনুসন্ধান দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও, পাঠ্যবিষয়ের মূল সাংগঠনিক রূপের সঙ্গে তাদের পরিচয় থাকে না। ফলে, নতুন অভিজ্ঞতাকে কীভাবে পরিবেশন করতে হবে, সে সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকে না। তাছাড়া, অনুসন্ধান করতে গিয়ে, শিক্ষার্থীরা অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, সেইসব তথ্যের তাৎপর্যও সবসময় তাদের কাছে পরিষ্কার নাও হতে পারে। তাই এইসব কারণে তাদের মনে নানারকমের প্রশ্ন আসতে পারে। এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনে সহায়তা করার জন্য এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের জন্য সবশেষে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। এই আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি ব্যক্ত করে এবং পরস্পর সেবিষয়ে আলোচনা করে। প্রয়োজনে, শিক্ষকও কার্য বিবরণী তৈরী করে এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আবিষ্কার পদ্ধতি পরিচালনার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, এখানে শিক্ষকের ভূমিকা নগণ্য নয়। বরং এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এখানে তিনি গতানুগতিক রীতিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারেন না। তাকে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে, বিষয়বস্তুকে সমস্যার আকারে উপস্থাপন করতে হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের কার্য পরিচালনার জন্যও তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাই সৃজনধর্মী শিক্ষণ (Creative teaching) পরিচালনার দক্ষতা শিক্ষকের থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া আবিষ্কারমূলক প্রশ্ন (Heuristic question) গঠন করার জন্যও শিক্ষকের বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন। তাই এই পদ্ধতি পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন।

আবিষ্কারক পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Heuristic Method)

আবিষ্কার পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষণ পরিচালনা করলে, নানা দিক থেকে শিখনে সহায়তা করা যায়। এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধাগুলি নিম্নরূপ -

প্রথমত, সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা (Learning by doing) আধুনিক মনোবিদ্যার একটি পরীক্ষিত নীতি। আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ দিয়ে, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলা হয়। ফলে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ পরিচালনা করলে, শিখন ও শিক্ষণ উভয়ই মনোবিজ্ঞানসম্মত হয়।

দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মানসিক দিক থেকেও সক্রিয় করে তোলা যায়। গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মূলত গ্রহণাত্মক চিন্তন (Receptive thinking) করতে পারে। কিন্তু, এই ধরনের চিন্তনের অভ্যাস ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী নয়। আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষক কোনো সময় শিক্ষার্থীদের তার চিন্তার ফলাফল গ্রহণ করতে বাধ্য করেন না। তিনি শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন। ফলে, ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সৃজনাত্মক চিন্তন ক্ষমতার (Creative thinking) বিকাশ হয়।

তৃতীয়ত, আবিষ্কার পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়ে, শিক্ষার্থীরা শ্রেণীর গতানুগতিক বাধ্যবাধকতা থেকে অনেকটা মুক্তি পায়। গতানুগতিক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে; অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তাদের সে একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেওয়া যায় এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ পরিচালনা করে। আর এই পরিবর্তন পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের মনে বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করে।

চতুর্থ, কৌতূহল (Curiosity) শিশুমনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। এই প্রবণতার তাড়নায় শিশুরা সব কিছু অনুসন্ধান করে দেখতে চায়। আবিষ্কারক পদ্ধতিতে কাজের সুযোগ পেয়ে, শিক্ষার্থীরা তাদের এই কৌতূহলস্পৃহাকে চরিতার্থ করতে পারে।

পঞ্চমত, আবিষ্কার পদ্ধতি বিশেষভাবে বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষা দিলে, শিক্ষার্থীদের মনে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (Scientific attitude) বিকাশ লাভ করে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে, শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়। ফলে, জ্ঞানার্জনের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জনের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পায়।

ষষ্ঠত, আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে, শিক্ষার্থীদের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের পথ সুগম হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় বলে, এবং শিক্ষকের ন্যূনতম সাহায্য নিয়ে সফলতা আয়ত্ত করে বলে, তাদের মনে আত্মনির্ভরতাবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং নিরপেক্ষ চিন্তা করার ক্ষমতার বিকাশ হয়।

সপ্তম, এই পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের কৌশল আয়ত্ত করে। তাই শিক্ষক গৃহকাজ হিসেবে যে দায়িত্বভার শিক্ষার্থীদের উপর দেন, সেগুলি তারা সহজে সমাধান করতে পারে।

অষ্টমত, এই পদ্ধতিতে কাজ করার সময় শিক্ষক, প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীদের সহায়তা করেন। যখনই শিক্ষার্থী কোনো সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখনই তিনি তাদের পরিমিত সাহায্য করেন।

নবমত, পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আবিষ্কার পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে, শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারে। তাছাড়া, অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ সম্ভাবনাও এই পদ্ধতিতে বাড়ে।

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, আবিষ্কার পদ্ধতি সমস্ত দিক থেকে মনোবিজ্ঞানসম্মত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের সামনে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা উদ্দেশ্য করা যায় না; অভিজ্ঞতা গ্রহণের প্রশিক্ষণও দেওয়া যায়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ওয়েস্টঅ্যাওয়ে (F.W.Westaway) এই পদ্ধতির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন - " The method is formative rather than informational. "

আবিষ্কারক পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Heuristic Method)

আবিষ্কার পদ্ধতির পূর্বোক্ত সুবিধা থআকলেও, এই পদ্ধতির সব কিছুই ভালো এ কথা বলা যায় না। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে এই পদ্ধতির অনেক অসুবিধা শিক্ষাবিদগণ লক্ষ করেছেন। আবিষ্কার পদ্ধতির বিশেষ অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ -

প্রথমত, এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে, শিখনের সময় তুলনামূলকভাবে বেশি প্রয়োজন হয়। আমাদের প্রথাগত শিক্ষায়, প্রত্যেকটি শ্রেণীতে অনুশীলনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম থাকে। কিন্তু, এই পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রম এত ধীরে অগ্রগতি হয় যে, সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমটি নির্দিষ্ট সময়ে অনুশীলন করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করার জন্য, পাঠ্য বিষয়বস্তুকে সমস্যার আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়। বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের সব অংশকে সমস্যার আকারে উপস্থাপন করা যায় না। তাই এই পদ্ধতি বিদ্যালয়ে পাঠ্য সব বিষয় শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

তৃতীয়ত, এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করতে গেলে, শিক্ষকের পক্ষে প্রস্তুতি অনুযায়ী সবসময় কাজ করা সম্ভব হয় না। কারণ, শিার্থীদের চাহিদা ও সমস্যা অনুযায়ী শিক্ষককে শ্রেণীতে কাজ করতে হয়। ফলে, সব শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীকক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া, প্রকৃত আবিষ্কারমূলক প্রশ্ন (Heuristic question) করার জন্য শিক্ষকের যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এই ধরনের প্রশিক্ষণের অভাবের দরুন, এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

চতুর্থত, শ্রেণীতে কিছু শিক্ষার্থী থাকে, যারা স্বভাবতই লাজুক প্রকৃতির। এইসব শিক্ষার্থীরা তাদের অভাব অভিযোগ কখনই ব্যক্ত করে না। আবিষ্কারক পদ্ধতি এইসব শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

পঞ্চমত, আবিষ্কারক পদ্ধতিতে, শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার এবং চিন্তা করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের শিশুদের এমন কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ থাকে না যে, তারা সম্পূর্ণভাবে কোনো কাজ শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই এককভাবে সম্পাদন করে। ফলে, বেশিরভাগ সময়ে তারা শিক্ষকের সাহায্য প্রার্থনা করে। ফলে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না।

ষষ্ঠত, আবিষ্কার পদ্ধতি, বিজ্ঞান শিক্ষকদের বিশেষ পদ্ধতি। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করতে হলে, উপযুক্ত পরীক্ষাগার ও সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করা ব্যয়সাধ্য। তাই সাধারণ বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

সপ্তমত, শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে কাজ করতে ভালোবাসে ঠিকই,কিন্তু সেই কাজ যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা না করা যায়, তাহলে তা খেলার পর্যায়েই থেকে যায়। তার থেকে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, এই পদ্ধতির সফলতার জন্য সুপরিচালনার প্রয়োজন। কিন্তু , বাস্তব পরিস্থিতিতে ৪০ বা ৫০ জন শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণীতে শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরা প্রতি মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব। তাই সাধারণভাবে শ্রেণীকক্ষে এই পদ্ধতি ব্যর্থ হয়।

মন্তব্য ঃ আবিষ্কার পদ্ধতির পূর্বোক্ত অসুবিধাগুলি বিচার করলে দেখা যায়, সেগুলি সবই পরিচালনগত। কিন্তু, এই পদ্ধতির মৌলিক ভিত্তি বিচার করলে দেখা যায়, এটি মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে, শিক্ষার কতকগুলি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। সুতরাং, বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমাদের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা মাধ্যমিক স্তর থেকে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি। তবে সামগ্রিকভাবে সবক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে পাঠদানের চেষ্টা না করে, আমরা যদি প্রত্যেক শ্রেণীতে কিছু কিছু নির্বাচিত অংশের ক্ষেত্রে, এই পদ্ধতি প্রয়োগ করি, তাহলে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। আবিষ্কারক পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধন-এর স্পৃহাকে জাগ্রত করা। তাই বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করে, আমরা বিদ্যালয়ে কিচু কিছু ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করব।

৪.৪.ক.৩ প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project Method)

ভূমিকা ঃ বর্তমান শতাব্দীতে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বহুমুখী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, প্রোজেক্ট পদ্ধতি তারই একটি ফল। শিক্ষণের এই পদ্ধতিও ডিউই-এর শিক্ষাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষণের কাজে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে এই পদ্ধতির সৃষ্টি। ডিউই বলেছিলেন, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়েই শিক্ষা হয়। সুতরাং, শিক্ষণের জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন - একটি হল সমস্যা এবং অপরটি হল শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা। সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে সমস্যা ও তার মানসিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে (Project method) সমস্যা কর্মকেন্দ্রিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 'প্রোজেক্ট' (Project) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন সি. আর. রিচার্ডস (C. R. Richards) ১৯০০ সালে। রিচার্ডস কলম্বিয়া টিচার্স কলেজে (Teachers' College, Cloumbia) কর্মশিক্ষা বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি প্রথম কর্মশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্যা পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃত কাজের পরিকল্পনা ও সম্পাদনের মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। ১৯০৮ সালে, স্টিভেনসন (Stevenson) কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে প্রকৃত কর্মসম্পাদনের ওপর বা কর্মের ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, এবং প্রাথমিক স্তরে এই কাজ, বিশেষভাবে হস্তচালিত কাজ, কৃষি ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ একটি 'প্রোজেক্টের (Project) সাহায্যে পরিচালিত করা হয়। প্রোজেক্ট বলতে স্টিভেনসন (Stevenson) বলেছেন, - ''A project is a problematic act carried to completion in its natural setting. '' এই ধারণা অনুযায়ী প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে সমস্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রোজেক্টকে সমস্যামূলক কাজ (Problematic act) হিসেবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু প্রোজেক্ট পদ্ধতিকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেন কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick)। ডিউই-এর দার্শনিক চিন্তার বিশ্লেষক হিসেবে কিলপ্যাট্রিক খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর বিশ্লেষণে প্রোজেক্ট পদ্ধতি নতুন তাৎপর্য লাভ করে। তিনি প্রোজেক্টকে সাধারণ কৌশল হিসেবে

কিলপ্যাট্রিক খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর বিশ্লেষণে প্রজেক্ট পদ্ধতি নতুন তাৎপর্য লাভ করে। তিনি প্রজেক্টকে সাধারণ কৌশল হিসেবে বর্ণনা করেছেন ; নির্দিষ্ট কোনো সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি বলেছেন "A whole hearted purposeful activity, proceeding in a social environment." অর্থাৎ, যেসব উদ্দেশ্যমূলক কাজ স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে সম্পাদিত হয়, তাই হল প্রোজেক্ট (Project)। প্রোজেক্ট-এর এই উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষভাবে শিক্ষামূলক। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর কর্মসম্পাদনের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষ্ণায়া (Krishnayya) বলেছেন - "The project briefly described, is that method of teaching which encourages a maximum amount of purposeful activity on the part of the pupils." কিলপ্যাট্রিক বলেছেন, বিদ্যালয়ের সংগঠন এমন হওয়া উচিত, যেখানে শিক্ষার্থীরা জীবনের উপযোগী প্রকৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এই উদ্দেশ্যসাধনে প্রোজেক্ট পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Project Method) :

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তখন প্রকৃত কোনো কাজ শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং তার ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তখন তাকে বলা হয় প্রোজেক্ট (Project)। এই প্রোজেক্ট পদ্ধতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি।

প্রথমত, কর্মভিত্তিক শিক্ষা : যেকোনো প্রোজেক্ট (Project) বলতে আমরা একটি নির্দিষ্ট সমস্যামূলক কাজকে বুঝি। কারণ, এই পদ্ধতির মূল কথা হল জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করা এবং সেই সমস্যামূলক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা। সুতরাং, সমস্যামূলক প্রত্যক্ষ কর্মপরিকল্পনা, প্রোজেক্ট পদ্ধতির একটি মূল বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের কাজ ছাড়া প্রোজেক্ট পদ্ধতি কার্যকরী হয় না।

দ্বিতীয়, উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তা : প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে যে কর্ম নির্বাচন করা হয়, তা সবসময় উদ্দেশ্যমুখী। কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick) বলেছেন, প্রোজেক্ট হল এক ধরনের উদ্দেশ্যমুখী (Purposeful) কাজ। সুতরাং, প্রোজেক্ট পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল - এখানে যে কাজ বা সমস্যাটি নির্বাচন করা হয়, তার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ, শ্রেণীকক্ষে যেকোনো ধরনের সক্রিয়তাই প্রোজেক্ট নয়। সুতরাং প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে আমরা যে শিক্ষার্থী সক্রিয়তাকে কাজে লাগাই, তা কোনো রকমের যান্ত্রিক সক্রিয়তা নয়, উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস (Massachusetts)-এর কৃষিবিদ্যা শিক্ষা পর্ষদ বলেছেন- "Projects means something to be done in a form under specific conditions and for a specified valuable result" এই উদ্দেশ্য দ্বিমুখী- প্রত্যেক প্রোজেক্টেরই একটি শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য আছে।

তৃতীয়ত, স্বাভাবিক পরিবেশ : প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করার জন্য একটি স্বাভাবিক পরিবেশ চাই। গতানুগতিক বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষণের জন্য একটি কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করি। ফলে, এই শিক্ষার সঙ্গে আমাদের প্রকৃত জীবনের কোনো সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু, প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে বলা হয়েছে কর্মসম্পাদন স্বাভাবিক পরিবেশে (Natural setting) হবে। অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে প্রোজেক্ট হিসাবে যে কাজটি বেছে নেওয়া হয়, তাকে স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পাদন করা হয়। এই ধরনের স্বাভাবিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমেই

শিক্ষার্থীরা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং এর মাধ্যমেই শিক্ষণের ক্ষেত্রে কৃত্রিমতাকে দূর করা যায়। সুতরাং, প্রোজেক্ট পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার এই কর্মসম্পাদনের স্বাভাবিক পরিবেশ।

চতুর্থত, সামাজিক পরিবেশ : প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনার জন্য সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে কর্মসম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হয়। এই দলগতভাবে কাজের সুযোগদানের উদ্দেশ্য শিক্ষণ পরিবেশকে সামাজিক পরিবেশে রূপান্তরিত করা। ডিউই বলেছেন, ব্যক্তিজীবনের বিকাশ সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়, তাহলে সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিক্ষণকে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সংঘটিত করতে হবে। এই কারণে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার সামাজিক পরিবেশ গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষণের সময় বিদ্যালয়ের পরিবেশ সমাজের অনুকূল হওয়া উচিত। এই ধরনের সামাজিক পরিবেশে জীবন উপযোগী সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে। কিলপ্যাট্রিক প্রোজেক্ট পদ্ধতির এই সামাজিক পরিবেশের (Social environment) ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পঞ্চমত, স্বাধীনতা : শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ এবং অংশ গহণ, প্রোজেক্ট পদ্ধতির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই কিলপ্যাট্রিক তাঁর সংজ্ঞায় প্রোজেক্টকে একটি আন্তরিক (Whole-herted) উদ্দেশ্যমূলক কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার্থীরা যে কাজ স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ গ্রহণ করবে, তাকেই তারা সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ায় সচেষ্ট হবে। এই কারণে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে কর্ম-নির্বাচনের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যে কর্ম নির্বাচন করে, তা সম্পাদনে তাদের আন্তরিকতা দেখা যায়। এই আন্তরিকতা প্রোজেক্ট পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ষষ্ঠত, দায়িত্ব : প্রোজেক্ট পদ্ধতির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষার্থীদের ওপর দায়িত্বভার অর্পণ। এই শিক্ষণ পদ্ধতির সমস্ত পর্যায়েই শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে, এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনার সময় পাঠ পরিকল্পনা, পাঠ নির্বাচন, পাঠ সম্পাদন ইত্যাদির ওপর দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীর দায়িত্ববোধ বাড়ে।

মন্তব্য : কিলপ্যাট্রিক বলেছেন, প্রোজেক্ট পদ্ধতির মধ্যে যেকোনো মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমস্তরকম বৈশিষ্ট্য বর্তমান। শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখনের (Learning) সর্বাধুনিক নীতিগুলিকে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষণ-শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে শিখনের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সহায়তা করে এবং সবশেষে শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টামূলক কাজে অনুপ্রেরণা জোগায়। এই কারণে প্রোজেক্ট পদ্ধতিকে বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির পরিচালনা (Organisation of Project Method)

প্রোজেক্টের বিভিন্ন স্তর : সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি পরিচালনা করার সময় চিন্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে চিন্তনের স্তর অনুযায়ী শিক্ষণের স্তর নির্ধারণ করা হয়। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায় নির্ধারণের জন্য শিখনের বিভিন্ন স্তরকে বিচার করা হয়। প্রোজেক্ট পদ্ধতির পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মনোবিদগণ বলেছেন, যেকোনো ধরনের শিক্ষণ প্রচেষ্টা চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। গতানুগতিক শিক্ষণেও এই স্তরগুলি খুবই পরিষ্কারভাবে না হলেও আমরা লক্ষ করি, শ্রেণীতে পাঠ-পরিচালনার জন্য

প্রথমত শিক্ষককে বিশেষ পাঠ ও পাঠের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। দ্বিতীয় স্তরে, পাঠ পরিচালনার একটি খসড়া পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। তৃতীয় স্তরে শিক্ষক তাঁর নিজস্ব সক্রিয়তা শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করেন। সবশেষে, তাঁর শিক্ষণের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, তা শিক্ষক বিচার করে দেখেন। প্রত্যেক শিক্ষক সচেতনভাবেই হোক বা অবচেতন মনেই হোক, শিক্ষণের এই চারটি স্তর অনুসরণ করেন। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতেই এই চারটি স্তর পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা হয়। প্রোজেক্ট পদ্ধতির উদ্ভাবকদের ভাষায় এই চারটি স্তর হল —

১) উদ্দেশ্যস্থাপন (Purposing)

২) পরিকল্পন (Planning)

৩) কর্মসম্পাদন (Execution) এবং

৪) মূল্যায়ন (Judging)।

প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে গতানুগতিক পদ্ধতির এই চারটি স্তর অনুসরণ করা হলেও তার প্রয়োগের অনেক তারতম্য আছে। গতানুগতিক আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রত্যেক স্তরে শিক্ষকই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে শিক্ষকের কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু, প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে এই চারটি স্তরেই শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বসিং (Bossing) এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''The project is a significant practical unit of activity..... planned and carried to completion by the students.....'' অবশ্য এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষক পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করেন। অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে, যেহেতু এই পদ্ধতিতে সমস্ত দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের ওপর দেওয়া হয়, সেহেতু এখানে শিক্ষকের কোনো কিছু করণীয় নেই। কিন্তু, এই রকম ধারণা ঠিক নয়। বরং এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে গতানুগতিক পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় হতে হয়। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষককে প্রত্যেক স্তরেই শিক্ষার্থীদের ঠিক প্রয়োজনীয় সময়ে যথাযোগ্য সাহায্য করতে হয়। তবে একথা ঠিক, শিক্ষক কোনো সময় নিজের মতবাদ জোর করে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। এই ধরনের কর্মপ্রচেষ্টামূলক পদ্ধতিতে কীভাবে শিক্ষণ পরিচালনা করা হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

উদ্দেশ্য-স্থাপন : প্রথমত, এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করার জন্য কাজ বা প্রোজেক্ট নির্বাচন করতে হয় এবং এই প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। প্রথম স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ সমবেত চেষ্টায় প্রোজেক্টটি ঠিক করেন এবং সেইসঙ্গে তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। সাধারণত শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের কোনো সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রোজেক্ট নির্বাচন করে। শিক্ষার্থীরা সমবেতভাবে আলোচনায় বসে। এই আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা নানারকম সমস্যা বা কাজের প্রস্তাব করতে থাকে। এই সব প্রস্তাব শিক্ষক বোর্ডে লেখেন, পরে এক একটি করে শিক্ষার্থীরা এই প্রস্তাবগুলি আলোচনা করতে থাকে। এই পর্যায়ে শিক্ষকও আলোচনায় যোগ দেন। কোন প্রস্তাবটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং কোনটি তাৎপর্যপূর্ণ নয়, তা এই আলোচনার সময় বিচার করা হয়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা প্রোজেক্টটি নির্বাচন করে। এই পর্যায়ে শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আলোচনায় শিক্ষক খুব বেশি অংশগ্রহণ করেন না, যদিও তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেন না, তবুও তাঁকে এই পর্যায়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা

গ্রহণ করতে হয়। প্রোজেক্টটি শিক্ষার্থীরা নিজেদের আলোচনার ফলস্বরূপ নিজেরাই নির্বাচন করবে। কিন্তু, এবাপ্যারে শিক্ষার্থীদের যদি সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে তারা অনেক সময় এমন প্রোজেক্ট নির্বাচন করবে যার কোনো শিক্ষাগত তাৎপর্য নেই। ফলে, সেই প্রোজেক্ট দ্বারা শিক্ষণের কাজ সম্পন্ন হবে না। সুতরাং, এই স্তরে শিক্ষককে দক্ষ নির্দেশকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকই সচেতন থাকবেন এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে ধরনের প্রজেক্ট প্রয়োজন, সেটি যাতে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় নির্বাচন করে, তার জন্য শিক্ষক সকলরকম কৌশল অবলম্বন করবেন। অর্থাৎ এই স্তরে যদিও শিক্ষার্থীরা প্রোজেক্ট নির্বাচন করবে, তাহলেও তা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকের ইচ্ছায়। শিক্ষক যত পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের এই প্রোজেক্ট নির্বাচনের ব্যাপারে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন, তত তিনি এই পদ্ধতির কার্যকর রূপদানে সার্থকতা লাভ করবেন। তবে প্রোজেক্ট এবং তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর তাদাত্ম্যতা তাদের পরবর্তী কাজে প্রেষণা জোগাবে।

পরিকল্পনা : পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রোজেক্ট নির্বাচনের পর, দ্বিতীয়স্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা সমবেতভাবে কর্মসম্পাদনের পরিকল্পনা রচনা করেন। এই আলোচনায়ও শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। যে প্রোজেক্টটি নির্বাচন করা হয়েছে, সেটিকে কার্যকর রূপদানের জন্য কীভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, কী ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন, কোন কোন ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন, সবই এই পর্যায়ে ঠিক করার প্রয়োজন। এখানেও শিক্ষক পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য নেওয়া করবেন। কাজের পরিকল্পনাটি সুন্দর হলে কাজটি সুসম্পন্ন হবে না। শিক্ষার্থীরা কোন কোন জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে, কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করবে, কীভাবে তথ্যগুলির সংরক্ষণ করবে, সে সম্পর্কে যথাযোগ্য নির্দেশনা না দিলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অস্পূর্ণ থেকে যাবে। এই পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষক সবসময় উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রাখবেন। যেসব তথ্য সংগ্রহ করলে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌঁছানো যাবে, সেইসব তথ্য যাতে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই সংগ্রহ করে, সে দিকে লক্ষ রেখে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

কর্ম সম্পাদন : পরিকল্পনা রচনার পর শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ কর্মমূলক স্তরে কাজে অগ্রসর হয়। পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা কাজে অগ্রসর হয়। শিক্ষক এই পর্যায়ে তাদের পাশে থাকেন। শিক্ষার্থীরা যদি কোনো বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তাহলে শিক্ষকের উচিত সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহায্য করা। প্রয়োজনবোধে, এই পর্যায়ে শিক্ষক প্রোজেক্টটি বিশ্লেষণ করে তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। শিক্ষক এই সম্পাদনের স্তরে কোনো সময় শিক্ষার্থীদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না ঠিকই, কিন্তু যথাযোগ্য সময়ে তাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। সুতরাং, প্রোজেক্ট পদ্ধতির সম্পাদনের স্তরে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার মতো মানসিক তৎপরতা শিক্ষণের কার্যকারিতাকে নির্ধারণ করে।

মূল্যায়ন : প্রোজেক্ট পদ্ধতির সর্বশেষ স্তরে প্রোজেক্টটির মূল্যায়ন করা হয়। যে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রোজেক্টটি নির্বাচন করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য কতটুকু সার্থক হয়েছে, তা বিচার করে দেখা হয়। এই মূল্যায়নের কাজও শিক্ষার্থীরা সম্পন্ন করে। এই মূল্যায়ন শুধুমাত্র কর্মসম্পাদনে হয় না, কর্মসম্পাদনের মধ্যে শিক্ষার্থী যে সমস্ত পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেছে, তারও মূল্যায়ন করা হয় এই সর্বশেষ স্তরে।

প্রোজেক্টের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Project)

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি প্রোজেক্ট শুধুমাত্র উদ্দেশ্যহীন সক্রিয়তা নয়, প্রত্যেক প্রোজেক্টেরই উদ্দেশ্য থাকে। প্রোজেক্ট পদ্ধতির মূল কথা হল, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়কে এমনভাবে পূর্ববিন্যাস করতে

হবে, যাতে সেগুলি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যমুখী কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে। এই উদ্দেশ্যই প্রোজেক্টের কেন্দ্রবিন্দু। প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দৈহিক শ্রম নয়, বৌদ্ধিক ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশও তার উদ্দেশ্য। কিলপ্যাট্রিক এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজেক্টগুলি চারটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

(১) সংগঠনমূলক প্রোজেক্ট বা সৃজনাত্মক প্রোজেক্ট (Constructive or Creative Project) : সংগঠনমূলক কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব প্রোজেক্ট গঠন করা হয়, তাদের বলা হয়েছে, সংগঠনমূলক প্রোজেক্ট। যেকোনো ধরনের সৃজনাত্মক কাজও এই ধরনের প্রোজেক্টের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত এই ধরনের সংগঠন বা সৃজনধর্মী কাজে কোনো বস্তুর বাহ্যিক অবয়বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোনো বিশেষ জিনিস তৈরী করা, নাটক অভিনয় করা ইত্যাদি এই শ্রেণীর প্রোজেক্ট।

(২) উপভোগাত্মক বা গ্রহণাত্মক প্রোজেক্ট (Appreciative Project) : সাধারণত সৌন্দর্যমূলক বিষয়বস্তুর সার্থক উপভোগের উদ্দেশ্যে যেসব প্রোজেক্ট গঠন করা হয়, তাদের বলা হয় উপভোগাত্মক প্রোজেক্ট। কিলপ্যাট্রিক বলেছেন, যে সমস্ত কাজের মূলক উদ্দেশ্য রসামুভুতি বা সৌন্দর্যানুভূতি, সেই সমস্ত কাজকে প্রোজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীদের ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়। গল্প শোনা, গান শোনা, ছবি দেখা ইত্যাদি এই শ্রেণির প্রজেক্টের উদাহরণ।

(৩) সমস্যামূলক প্রোজেক্ট (Problem Project) :কোনো মানসিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যেসব প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়, তাদের বলা হয় সমস্যামূলক প্রোজেক্ট। সাধারণত বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়। সাধারণত এই ধরনের প্রোজেক্টে পাঠ্য বিষয়বস্তুকে বিশেষ একটি সমস্যার আকারে তুলে ধরা হয়, শিক্ষার্থীদের মনেও এই ধরনের সমস্যা সমাধানের তাগিদ সৃষ্টি করা হয়। যেমন গ্রহণ কেন হয়? বৃষ্টিপাত কীভাবে হয়? ইত্যাদি।

(৪) অনুশীলনমূলক বা শিক্ষণমূলক প্রোজেক্ট (Drill Project or Specific Teaching Type Project) : অনেক সময় প্রজেক্টের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বিষয়কেন্দ্রিত জ্ঞান আহরণে সহায়তা করার বা বিষয়কেন্দ্রিত জ্ঞান অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধরনের বিশেষ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে যেসব প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়, তাদের বলা হয় অনুশীলনমূলক প্রোজেক্ট বা বিশেষ শিক্ষামূলক প্রজেক্ট। যেমন, কবিতা মুখস্থ করা, অঙ্কে সূদ কষা, ভূগোল জরীপ শেখা ইত্যাদি।

আদর্শ প্রোজেক্টের বৈশিষ্ট্য নির্বাচন : শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিক্ষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিক্ষণমূলক প্রজেক্টই যথেষ্ট নয়। প্রোজেক্টের শ্রেণীকরণের উদ্দেশ্যও তা নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ জীবনবিকাশে সহায়তা করা। সুতরাং, তার জীবনের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করার ক্ষেত্রে সবরকমের প্রোজেক্টরই শিক্ষাগত মূল্য আছে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজেক্টই বিদ্যালয়ে গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের এই পরিপূর্ণ জীবনবিকাশে সহায়তা করবেন। তবে শ্রেণীর উপযোগী প্রজেক্ট নির্বাচনে, শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার সময় শিক্ষক আদর্শ প্রোজেক্টের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ রাখবেন।

প্রথমত, প্রোজেক্ট নির্বাচনের সময় বিচার করে দেখার দরকার নির্বাচিত প্রোজেক্টের শিক্ষাগত মূল্য আছে কিনা। যে প্রোজেক্টের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা সংগ্রহে সহায়তা করা যাবে, সেই ধরনের প্রোজেক্ট শ্রেণীর জন্য নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ, আদর্শ প্রোজেক্টের একটি প্রধান

বৈশিষ্ট্য হল তার এই অভিজ্ঞতা মূল্য। কোনো প্রোজেক্টে কর্মসম্পাদনের জন্য যে পরিশ্রম শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে করতে হয়, সে অনুপাতে যদি তার থেকে শিক্ষাগত ফল না পাওয়া যায়, তাহলে ঐ পরিশ্রমের কোনো প্রকৃত তাৎপর্য থাকে না। এই কারণে প্রোজেক্ট নির্বাচনের সময় তার এই অভিজ্ঞতা মূল্য (Experience value) বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত।

দ্বিতীয়, কোনো প্রোজেক্টের অভিজ্ঞতামূল্য বেশি হতে পারে, কিন্তু যে শ্রেণির জন্য তা নির্বাচন করা হয়েছে, সেই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা সমাধান করা সম্ভব নয়। কারণ যেকোনো ধরনের কর্ম সম্পাদনের জন্য যথোপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রোজেক্ট নির্বাচনের সময়, শিক্ষার্থীদের পরিণমনের স্তরের (Level of maturity) কথা চিন্তা করা উচিত। প্রোজেক্ট সবসময় শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়ত, সবরকম প্রোজেক্ট ইচ্ছা করলেই বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা যায় না। তার শিক্ষাগত মূল্য আছে বলেই বা তা শিক্ষণের সহায়ক বলেই প্রোজেক্টটি নির্বাচনযোগ্য, এ কথা বলা যায় না। প্রত্যেক প্রোজেক্টের একটি আর্থিক দিক থাকে। প্রোজেক্ট নির্বাচনের সময় তার আর্থিক দিকের কথা বিবেচনা করা উচিত। যে প্রোজেক্ট ব্যয়সাপেক্ষে তা বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা উচিত নয়। তাতে করে বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার ওপর চাপ পড়ে। আর্থিক ব্যয়ভার কম, এরকম প্রোজেক্টই গ্রহণ করা উচিত।

চতুর্থত, প্রোজেক্ট নির্বাচনের সময় শিক্ষককে তার তথ্য সংগ্রহের সমস্যাদির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। যে প্রোজেক্ট সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষার্থীরা কাছাকাছি পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করতে পারবে না, সে ধরনের প্রোজেক্ট নির্বাচনে তাদের নিরুৎসাহী করা উচিত। প্রজেক্ট নির্বাচনের পর তার সফলতা আনা এই পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কোনো কারণে শিক্ষার্থীরা যদি তাদের প্রজেক্ট অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে বাধা পায় এবং যথাযোগ্য তথ্য ও সুযোগের অভাবে প্রজেক্টটিকে মাঝ পথে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তবে তার সামগ্রিক প্রভাব শিক্ষণের ওপর খুবই খারাপ হয়। এই কারণে শিক্ষকের পূর্বে এইসব তথ্য সংগ্রহের উৎস সম্পর্কে চিন্তা করে প্রজেক্ট নির্বাচন করা উচিত।

পঞ্চমত, আমাদের নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায়, পাঠ্যক্রম রচনার সময় শিক্ষাকালের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়। ফলে, আদর্শ প্রোজেক্ট সম্পাদনের সময়কাল নির্ধারণ তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যে প্রোজেক্ট সম্পাদন করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, সে প্রজেক্টকে আদর্শ প্রোজেক্ট বলা যায় না। কোনো প্রোজেক্টের সময়কাল তার উপযোগিতার সঙ্গে সমানুপাতিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক প্রোজেক্ট নির্বাচনের সময় এই দিকে বিশেষভাবে নজর রাখবেন। এপ্রসঙ্গে আরও মনে রাখার দরকার, অত্যধিক দীর্ঘ প্রোজেক্ট শিক্ষার্থীদের মনোযোগের স্থায়িত্বেও বাধা সৃষ্টি করে।

ষষ্ঠত, প্রোজেক্ট সব সময় উদ্দেশ্যমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক প্রোজেক্ট নির্বাচনের কাজ শুরু করার পূর্বে শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করবেন এবং প্রোজেক্ট নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি তিনি উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করবেন। যে প্রোজেক্ট পূর্বনির্ধারিত সমস্ত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সহায়তা করবে, সেই প্রোজেক্টই নির্বাচনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির সুবিধা (Advantage of Project Method) :

প্রোজেক্ট পদ্ধতির গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতির অনেক দোষ ত্রুটি দূর করতে সক্ষম। বিদ্যালয়ে শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট পদ্ধতি ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে পাঠদানের কাজ অনেকাংশে বিজ্ঞানসম্মত হয়। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এই পদ্ধতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, প্রোজেক্ট পদ্ধতি মানবসভ্যতার বিকাশের মৌলিক নীতিকে শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে (The project Method seeks to educate the child through purposive activety as the human race has educated itself.)। প্রোজেক্ট পদ্ধতির বিশেষ তাৎপর্যগুলি উল্লেখ করলে শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগের উপলব্ধি করা যাবে। এই পদ্ধতির বিশেষ সুবিধাগুলি হল —

(১) **সক্রিয়তাবাদ :** আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সক্রিয়তাবাদ (Activity Principle) আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। আধুনিক মনোবিদ এবং শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, ব্যক্তিসত্তার কোনো বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির সক্রিয়তা ছাড়া স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা যায় না। এই পদ্ধতি শিক্ষণকে সক্রিয়তাভিত্তিক করে তোলায় সহায়তা করে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষণের সমস্ত পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করার সুযোগ পায় এই পদ্ধতিতে।

(২) **স্বাধীনতা :** এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পায়। পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন, পাঠ-পরিকল্পনা, পাঠ-পরিচালনা এবং সবশেষে মূল্যায়ন, এইসব পর্যায়েই শিক্ষার্থীরা নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায়। এর ফলে, শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধ, আত্মনির্ভরতা ইত্যাদি বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার সমস্যারও সমাধান হয়।

(৩) **প্রেষণা :** এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ পরিচালনা করলে পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হয়। এই উদ্দেশ্য সচেতনতা তাদের কাজের প্রেষণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ফলে, শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রেষণা সৃষ্টির জন্য শিক্ষককে অতিরিক্ত কৌশল প্রয়োগ করতে হয় না। শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রোজেক্টের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি সম্পাদনে আগ্রহী হয়।

(৪) **বাস্তবমুখীতা :** প্রোজেক্টগুলি সাধারণত শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা প্রোজেক্ট নির্বাচন করে। ফলে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ পরিচালনা করলে, শিক্ষা জীবনের সম্পর্কযুক্ত হয়। জ্ঞানের সঞ্চালন সমস্যা অনেক কমে যায়। এই শিক্ষণপদ্ধতি শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কাছে বাস্তবমুখী করে তোলে। এই বাস্তবমুখিতা শিক্ষাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। আমস্ট্রং (Armstrong) বলেছেন, "All true education is rooted in reality."

(৫) **অনুবন্ধ :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষণের অনুবন্ধ নীতিকে (Principle of correlation) সহজে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। একই প্রোজেক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞান উপস্থাপন করা যায়। ফলে, পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে যে কৃত্রিম বিভেদের রেখা সৃষ্টি করা হয়েছে তা দূর করা সম্ভব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সুসংবদ্ধ জ্ঞান আহরণ করতে পারে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা মানসিক জগতে ঐক্য স্থাপিত হয়।

(৬) **বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ :** এই পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা একই সঙ্গে বৃত্তিমুখী শিক্ষাও লাভ করে। শিক্ষার্থীরা যে সকল প্রোজেক্ট নির্বাচন করে, সেগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে

গেলে তাদের নানারকম কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এই সকল কাজ করার সময় তাদের কর্মজীবনের প্রাথমিক বিকাশ শুরু হয়। প্রোজেক্ট সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক যোগ্য মনোভাবের বিকাশ হয়। এই কারণে এই শিক্ষণ পদ্ধতিকে জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ পদ্ধতিতে হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

(৭) **সামাজিক বিকাশ :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে, একক এবং যৌথ প্রচেষ্টায় কর্ম সম্পাদন করে। বিভিন্ন ধরনের যৌথ প্রচেষ্টায় কর্মসম্পাদনের সময় পারস্পরিক প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ধরনের সামাজিক গুণের বিকাশ হয়। ফলে, প্রোজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশেও সহায়তা করে।

(৮) **দৈহিক বিকাশ :** এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের দৈহিক শ্রমের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্ত দায়িত্বগুলি পালন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের যে অঙ্গসঞ্চালনের প্রয়োজন হয়, তার দ্বারা তাদের দৈহিক বিকাশও হয়। অর্থাৎ, প্রোজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশেও সহায়তা করে।

(৯) **চিন্তনের বিকাশ :** প্রোজেক্ট পদ্ধতি, ডিউই-এর সৃজনাত্মক চিন্তনের তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এখানে শিক্ষার্থীর সৃজনাত্মক চিন্তনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিমূলক শিক্ষণের কোনো স্থান এই পদ্ধতিতে নেই। ফলে, এই পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়।

(১০) **মূল্যায়ন :** এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়নের মধ্যেও অভিনবত্ব আছে। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজের কাজের ফলাফল নিজেরাই বিবেচনা করতে পারে। এই আত্মমূল্যায়ন, বা নিজেদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা, শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে।

(১১) **শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক :** সবশেষে, এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে, শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক অনেক বেশি সহায় হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক সহায়ক এবং নির্দেশকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ফলে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির মনোভাব জাগ্রত হয়। শিক্ষকগণ ও তাদের গতানুগতিক কাজের একঘেয়েমি থেকে রেহাই পান বলে তাঁরা অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Project Method) :

প্রোজেক্ট পদ্ধতির মধ্যে আর্দশ শিক্ষণ পদ্ধতির অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যর সমন্বয় হলেও অনেক শিক্ষাবিদ তাকে সম্পূর্ণ আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেননি। প্রোজেক্ট পদ্ধতির পরিকল্পনা ও ব্যবহারিক দিকের বিভিন্ন অসুবিধার কথা বিবেচনা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁরা এই পদ্ধতিকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেছেন। যেমন —

(১) **জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা :**এই পদ্ধতির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে পাঠ অন্তর্ভুক্ত সব অংশগুলিকে প্রোজেক্টে রূপান্তরিত করা যায় না। তাছাড়া, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ওপর অত্যধিক স্বাধীনতা

দেওয়া হয় বলে তারা অনেক সময় জ্ঞানের ক্ষেত্রের গুরত্বপূর্ণ অংশগুলিকে বাদ দিয়ে চলে যায়। ফলে, তাদের জ্ঞানের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার এই অভাব দূর করার জন্য শিক্ষককে এই কারণে অনেক সময় গতানুগতিক পদ্ধতি বা বিবৃতির আশ্রয় নিতে হয়।

(২) **শিক্ষকের অভাব :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। প্রোজেক্টের পরিকল্পনা রচনার সময় যদি কোনো প্রয়োজনীয় অংশ পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে যায়, বা পরিকল্পনা যদি উদ্দেশ্যমুখী না হয়, তাহলে সম্পূর্ণ পদ্ধতিই ব্যর্থ হবে। এই কারণে, প্রোজেক্ট পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষকের বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত এবং এই বিষয়ে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতাও থাকা উচিত। কীভাবে সুকৌশল শিক্ষক উদ্দেশ্যমুখী প্রোজেক্ট নির্বাচনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন, তার প্রশিক্ষণ (Training) তাঁর থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সব সময় পাওয়া মুশকিল। তাছাড়া, এই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের অতিরিক্ত পরিশ্রম ও চিন্তা করতে হয় বলে তাঁরা একে এড়িয়ে যেতে চান।

(৩) **পরিচালনাগত অসুবিধা :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে সঠিকভাবে পাঠ-পরিচালনা করতে না পারলে অনেক সময় শিক্ষার উদ্দেশ্যের চেয়ে শিক্ষার্থীরা কাজের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে, তারা কর্ম কৌশলই আয়ত্ত করে, সংশ্লিষ্ট জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না। শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে কাজ পছন্দ করে। ফলে, তারা যখন কোনো কাজ করার সুযোগ পায়, তখন তার ওপরই বেশী গুরুত্ব দেয়; কাজের পরোক্ষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কথা চিন্তা করে না। এক্ষেত্রে শিক্ষকের উচিত তাদের মনোযোগকে নিয়ন্ত্রণ করা। আবার অনেক সময় শিক্ষকের নিজের পরিচালনার ত্রুটির জন্য তিনি নিজেই কাজরে ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে ফেলেন। এর দ্বারাও প্রোজেক্ট পদ্ধতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

(৪) **উচ্চশ্রেণীতে পদ্ধতির অসুবিধা :** এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের পাঠ্য সমস্ত বিষয়ের পাঠ-পরিচালনা করা যায় না। এমনকি, বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। এই পদ্ধতি ওপরের দিকের শ্রেণীতে প্রয়োগ করে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের ওপর তার কোনো বিশেষ প্রভাব পড়ে না। বরং তাদের কাছে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুটি খুব হালকা মনে হয়। এর ফলে, শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহও কমে যায়। বিষয়বস্তু যুক্তিসম্মত না হলে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করতে চায় না। তাই তাদের ক্ষেত্রে যৌক্তিক পদ্ধতিই বিশেষ কার্যকরী।

(৫) **সময়ের অভাব :** বিদ্যালয়ের সীমিত সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করলে পাঠ্যক্রমের সম্পূর্ণ অংশ আলোচনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, এখানে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়। ফলে, সময়ের দিক থেকে এই পদ্ধতির পরিচালনায় অসুবিধা আছে।

মন্তব্য : প্রোজেক্ট পদ্ধতির এই অসুবিধাগুলির কথা, এই মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদরাও বিবেচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এইসব ত্রুটি পদ্ধতির প্রকৃত ত্রুটি নয়; এগুলি আমাদের গতানুগতিক চিন্তাধারারই প্রতিফলন মাত্র। তাঁরা বলেছেন, এই পদ্ধতিতে পাঠদান করতে হলে, আমাদের গতানুগতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন করতে হবে। পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ধারণারও পরিবর্তন করতে হবে। কারণ কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity

curriculum) রচনা করে সেই অনুযায়ী এই পদ্ধতি পরিচালনা করতে পারলে, তখন আর বিশেষ কোনো অসুবিধা দেখা দেবে না। তাছাড়া, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে বলে কোনো পদ্ধতিকে খারাপ বলা যায় না। প্রশিক্ষণ না থাকলেও শিক্ষক যদি আর্দশ মনোভাব নিয়ে এই পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করেন, তাহলে শিক্ষণের কাজ তাঁর নিজের কাছেই আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। প্রয়োজনবোধে বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য তিনি প্রোজেক্ট পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচনাভিত্তিক পদ্ধতিও (Discussion Method) প্রয়োগ করতে পারেন। এই পদ্ধতির সুপরিচালনার জন্য ব্রাউডি কিলপ্যাট্রিকের অনুসরণে শিক্ষকের অবশ্যকরণীয় কতকগুলি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক যদি এই দায়িত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করতে পারেন, তাহলে এই পদ্ধতিতে পাঠদানের আর কোনো ত্রুটি থাকবে না। এই নীতিগুলি হল—

(১) শিক্ষার্থীদের কর্মোদ্যোগে সহায়তা করা;

(২) কর্ম সম্পাদনের পরিকল্পনায় সহায়তা করা;

(৩) কর্ম পরিকল্পনার কার্যকর রূপদানে সহায়তা করা;

(৪) শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পরিমাপ করা;

(৫) শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য নতুননতুন উপায় উদ্ভাবন করা;

(৬) কর্ম সম্পাদনের প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার্থীদের আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করা;

(৭) সম্পূর্ণ শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি পর্যলোচনা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির মধ্যে আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির অনেকগুলি মৌলিক উপাদায় বর্তমান। কেবলমাত্র শিক্ষক যদি তাঁর দায়িত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করেন, তাহলে এই শিক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষণের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়।

৪.৪.ক.৪ আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method)

সাধারণ অর্থে আলোচনা বলতে আমরা পারস্পরিক মত বিনিময়ের প্রক্রিয়াকে বুঝি। আলোচনা এক ধরনের কথোপকথন (Conversation)। এই আলোচনার প্রক্রিয়াকে আধুনিককালে শিক্ষণের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বক্তৃতাদান (Lecturing) বা কথন (Telling) পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং একে এক ধরনের সামাজীকৃত দলগত শিক্ষণ পদ্ধতি (Socialised Group Method of Teaching) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সাধারণত গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষক কোনো বিশেষ বিশেষ বিষয় বিবৃত করেন এবং শিক্ষার্থীরা নীরবে তা অনুসরণ করে। অর্থাৎ, বক্তৃতাদানে কেবলমাত্র শিক্ষকই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কথন পদ্ধতিতেও কেবলমাত্র শিক্ষকেরই সক্রিয় ভূমিকা থাকে। অন্যদিকে আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এই কারণে এই পদ্ধতিকে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাইকেল লী (Michael Lee) বলেছেন- "Discussion is an educational group activity in which the teacher and the students co-operatively talk over some problems or topics." যে পদ্ধতিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতায় কোনো বিশেষ সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে আলাপ করেন, তাকেই বলা হয় আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method)।

আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Discussion Method)

আলোচনা পদ্ধতির উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে আমরা তার বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করলে আলোচনা পদ্ধতির পরিচালনা কৌশল সম্পর্কে ধারণা হবে।

প্রথমত, দলগত পদ্ধতি : আলোচনা এক ধরনের দলগত পদ্ধতি (Group Method)। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণে আলোচনা পদ্ধতির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। তাই শ্রেণীকক্ষে আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করতে হলে, প্রথমত শিক্ষককে একটি দল গঠন করতে হবে, এই দল (Group) যাতে সমগুণসম্পন্ন হয়, সেদিকে শিক্ষকের বিশেষভাবে নজর রাখা প্রয়োজন। এই দল সম্পূর্ণ শ্রেণী দ্বারা গঠিত হতে পারে, বা শ্রেণীর অংশ বিশেষ দ্বারা গঠিত হতে পারে। অর্থাৎ, আলোচনার সময় শিক্ষক সম্পূর্ণ শ্রেণীকে একত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে পারেন। অথবা, সম্পূর্ণ শ্রেণীকে কতকগুলি ছোটো ছোটো দলে ভার করে নিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, বিষয়বস্তু : আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা প্রয়োজন। এই নির্বাচিত বিষয়বস্তু দু'করমের হতে পারে। শিক্ষক আলোচনার বিষয়বস্তুকে বিবৃতির আকারে উপস্থাপন করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে তিনি কোনো বিষয়বস্তুকে সমস্যার আকারে উপস্থাপন করতে পারেন। অর্থাৎ, আলোচনার বিষয়বস্তু পাঠ্য বিষয়ের বিশেষ অংশভিত্তিক হতে পারে অথবা সমস্যামূলক হতে পারে। তবে বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় শিক্ষকের একটি দিকের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখা প্রয়োজন। তিনি শিক্ষার্থীদের বা বিশেষ দলের প্রস্তুতির (Readiness) কথা বিবেচনা করে সবসময় বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন।

তৃতীয়ত, প্রস্তুতি : আলোচনার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন। যে বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যদি কোনো ধারণাই না থাকে, তাহলে তারা আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না অন্যদিকে শিক্ষক যদি ওই বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত না থাকেন, তাঁর পক্ষেও আলোচনা সঠিক পথে পরিচালনা করার অসুবিধা হয়। তাই তাঁর দিক থেকেও প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

চতুর্থত, শিক্ষকের নেতৃত্ব : বার্নি এবং হানস (Burney and Hance) আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, প্রত্যেক আলোচনায় একজন নেতা (Leader) থাকবেন। তাঁরা আরও বলেছেন, এই আলোচনার নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন শিক্ষক নিজে। আলোচনার নেতৃত্ব গ্রহণ করার তাৎপর্য এই নয় যে, শিক্ষক সবসময়ে তাঁর নিজের মতামত শিক্ষার্থীদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবেন। বরং, আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা বিপরীত হওয়া উচিত। আলোচনা যত কম শিক্ষকের দ্বারা প্রভাবিত হবে, শিক্ষণ তত বেশি কার্যকর হবে। ডন রবিনসন (Don Robinson) মন্তব্য করেছেন — "A good discussion is not tearcher dominated, but is rather, a conversation is which the pupils react with their ideas and reasoning behind them freelly and openly..... During the interplay among the pupils, the teacher leads and guides by and occassional remark or a directing question." অর্থাৎ, আলোচনা শিক্ষক শুরু করবেন ঠিকই, কিন্তু তারপর শিক্ষার্থীরা পরস্পর মত বিনিময় করবে। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং মাঝে মাঝে উপযুক্ত প্রশ্নের অবতারণা করে শিক্ষার্থীদের আলোচনার গতি নির্ধারণ করবেন। সুতরাং, আলোচনায় শিক্ষকের নেতৃত্ব সবসময় পরোক্ষভাবে থাকবে। তিনি সবসময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন না।

পঞ্চমত, শিক্ষার্থীর ভূমিকা : আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, সে দিকেও নজর রাখতে হবে। যে শিক্ষার্থী আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে না, তার সামনে কিছু সমস্যা তুলে ধরে, তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ শ্রেণী পরিচালনাও এই পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষক যদি ঠিকমত শ্রেণী পরিচালনায় ব্যর্থ হন, তাহলে এই পদ্ধতিও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে।

ষষ্ঠত, সময় : আলোচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করারও প্রয়োজন। শিক্ষক বিষয়বস্তুর প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে আলোচনার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবেন। তা না হলে, অনিয়ন্ত্রিত আলোচনা পাঠের অগ্রগতিকে হ্রাস করবে।

আলোচনার শ্রেণীবিভাগ ও পরিচালনা (Classification and Organisation of Discussion) :

আলোচনা পদ্ধতি হল একটি সাধারণ নাম। এই পদ্ধতির মূল কথা হল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী দলগতভাবে কোনো বিষয় বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। এই আলোচনার অনুষ্ঠান বিভিন্নভাবে পরিচালনা করা যায়। তাছাড়া, আলোচনার প্রকৃতিও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আধুনিক সমাজীকৃত পদ্ধতি (Socialised method)

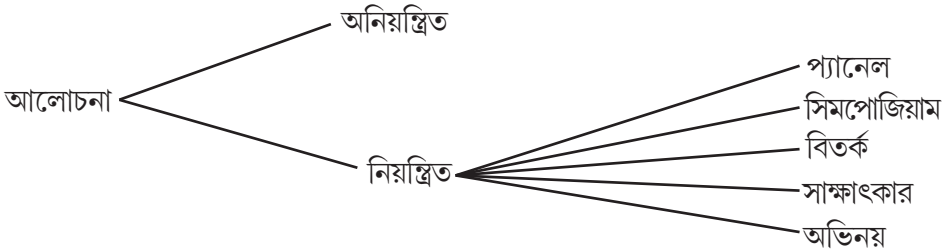

সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদগণ তাই আলোচনাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই আলোচনা পূর্ব নির্ধারিত কোনো বিশেষ পরিকল্পনা ছাড়াই হতে পারে; আবার বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ীও হতে পারে। এই দিক থেকে বিচার করলে আলোচনা দুরকমের— (১) অনিয়ন্ত্রিত আলোচনা (Informal group discussion) এবং (২) নিয়ন্ত্রিত আলোচনা (Formal group discussion)। আবার নিয়ন্ত্রিত আলোচনা, নিয়ন্ত্রণের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। শিক্ষাগত উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ, পাঁচ রকমের আলোচনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন— (ক) প্যানেল আলোচনা (Panel Discussion) (খ) সিমপোজিয়াম (Symposium), (গ) বিতর্ক (Debate), (ঘ) সাক্ষাৎকার (Interview) এবং (ঙ) চরিত্রাভিনয় (Role Playing)। এখন এইসব আলোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

১. **অনিয়ন্ত্রিত আলোচনা :** যে আলোচনায় শিক্ষক এবং বিশেষভাবে শিক্ষার্থীগণ স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে পারেন এবং পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করতে পারেন, তাকে বলা হয় অনিয়ন্ত্রিত আলোচনা। এই আলোচনায় পূর্ব নির্ধারিত কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় না। সাধারণত এই ধরনের আলোচনায় সম্পূর্ণ শ্রেণী একত্রে অংশগ্রহণ করে। এই আলোচনায় শিক্ষক নিজে নেতৃত্ব প্রশ্ন করেন। শিক্ষার্থীদের এই আলোচনায় যথাযোগ্য রীতিতে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষকের এক দিকে যেমন বিষয় সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান

থাকা প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষণের দক্ষতাও যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন। সমস্যা সমাধানের পথে শিক্ষার্থীরা কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, সে সম্পর্কে তার ধারণা থাকার দরকার। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সবরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এই ধরনের আলোচনা অনিয়ন্ত্রিত হলেও পরোক্ষভাবে শিক্ষক এর নিয়ন্ত্রণ করবেন। অনিয়ন্ত্রিত আলোচনা পরিচালনার সময় শিক্ষক নিম্নলিখিত দিকগুলির প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবেন— (১) আলোচনার সময় বিষয়বস্তু বা সমস্যাটি যাতে সবসময় শিক্ষার্থীদের সামনে থাকে, সে দিকে তিনি নজর রাখবেন। অর্থাৎ, আলোচনা যেন বিষয়বস্তু বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে সব সময় হয়, সে দিকে শিক্ষকের নজর রাখার প্রয়োজন। (২) শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাধীনভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে, শিক্ষক তার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। কোনো বিশেষ শিক্ষার্থীর ভুল মতামতের জন্য তাকে যেন তিরস্কার করা না হয়, বা উপহাস করা না হয়। এই তিরস্কার বা উপহাস শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মনোভাব ব্যক্তকরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়; তাছাড়া যে সামাজিক পরিবেশে আলোচনা পদ্ধতি পরিচালিত হয়, তাও নষ্ট হয়। (৩) আলোচনা যাতে যথাযোগ্য দিকে অগ্রসর হয়, সেদিকে শিক্ষক বিশেষভাবে নজর রাখবেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির পরিমাণ সম্পর্কে তাঁর সচেতন থাকা প্রয়োজন। (৪) আলোচনাকালে শিক্ষার্থীরা যাতে বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেদিকেও শিক্ষককে বিশেষ নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে তিনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ফাঁকগুলি আছে, তা পূরণ করার চেষ্টা করবেন। (৫) সব শেষে, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের মূল্যায়নেও তিনি সহায়তা করবেন।

২. **নিয়ন্ত্রিত আলোচনা :** যে আলোচনা পূর্বপরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়, তাকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত আলোচনা। এই ধরনের আলোচনাভিত্তিক পাঠদানের জন্য শিক্ষক প্রথমেই পরিকল্পনা রচনা করেন এবং আলোচনাকালে তিনি এই নিয়ম অনুযায়ী পাঠ-পরিচালনা করেন। এই পদ্ধতিতে সাধারণত প্রথমে একজন দলনেতা নির্বাচন করা হয়। সেই দলনেতা সম্পূর্ণ আলোচনাটি নিয়ন্ত্রণ করেন। এই ধরনের নিয়ন্ত্রিত আলোচনা পদ্ধতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকটি পদ্ধতির নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

(ক) প্যানেল আলোচনা : প্যানেল আলোচনায় (Panel discussion) একদল নির্বাচিত শিক্ষার্থী শ্রেণীর সম্মুখে, কোনো বিশেষ বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে। এখানে আলোচনা খুবই ঘরোয়া (Informal) ভাবে হয়। এই পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করতে হলে প্রথমত সমস্যা বা বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। এই বিষয়বস্তু বা সমস্যা পূর্বে ঘোষণা করা হয়। পরে আলোচনার পূর্বে শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে, একটি দল বা প্যানেল গঠন করা হয়। এই প্যানেলের সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। অবশ্য শিক্ষকও নেতা হিসেবে কাজ করতে পারেন। প্যানেলের এই নেতাকে বলা হয় সভাপতি (Chairman)। এইভাবে প্যানেল আলোচনার পরিকল্পনা রচনা করার পর প্রকৃত আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনায় প্যানেলের সভ্যগণ শ্রেণীর সামনের দিকে বসে এবং পরস্পরের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাদের এই আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। প্যানেল আলোচনা, পৃথক পৃথক বক্তৃতা নয়; প্রত্যেক সদস্য পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনা করবেন। দীর্ঘ বক্তব্য রাখলে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়বে এবং প্যানেল আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। প্যানেলের সদস্যদের আলোচনা শেষ হলে শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাদের

নানারকম প্রশ্ন করবে এবং সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেবে প্রয়োজনবোধে শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থী এই স্তরে সংক্ষিপ্ত আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে সভাপতি বা চেয়ারম্যানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত বিদ্যালয়ের শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব শিক্ষকের গ্রহণ করা উচিত। তিনি শ্রেণীতে প্রথম আলোচনার বিষয়বস্তু ঘোষণা করবেন এবং তার গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করবেন। এছাড়া, শিক্ষকের কাজ হল আলোচনার সময় বিষয়বস্তুর দিকে প্যানেলের সভ্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। এতে করে, আলোচনা বিষয়বস্তুর বাইরে চলে যেতে পারবে না। মাঝে মাঝে আলোচনা যাতে বিষয়বস্তুর কোনো বিশেষ দিকের ওপর আলোকপাত করে, সেজন্য তিনি আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রত্যেক সভ্য যাতে সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, সেদিকেও তিনি নজর রাখবেন। প্যানেলের সভাপতি হিসেবে শিক্ষক মাঝে মাঝে আলোচনার সারাংশ সকলের সামনে তুলে ধরবেন এবং আলোচনার শেষেও সমগ্র বিষয়বস্তুর আলোচনালব্ধ সার অংশটি সর্বসমক্ষে তুলে ধরবেন।

(খ) সিমপোজিয়াম : সিমপোজিয়ামও (Symposium) এক ধরনের দলগত আলোচনা। তবে প্যানেল আলোচনার সঙ্গে সিমপোজিয়াম-এর কিছু পার্থক্য আছে। এই ধরনের আলোচনায় প্রথমত একদল শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। এই শিক্ষার্থীরা কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর ছোটো ছোটো প্রবন্ধ রচনা করে। সিমপোজিয়ামে এই প্রবন্ধগুলি তারা পাঠ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যখন পূর্বরচিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করতে থাকে, তখন শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থী তা মনোযোগ সহকারে শোনে এবং প্রত্যেকটি আলোচনার মূল সংকেতগুলি নিজ নিজ খাতায় লিখে রাখে। সাধারণত সিমপোজিয়ামে দল গঠনের সময় দলটিকে খুব ছোটো করা হয়। এই দলের সদস্য সংখ্যা চার থেকে পাঁচের বেশী হওয়া উচিত নয়। কারণ দল যত বড়ো হবে, প্রবন্ধ পাঠের জন্য সময় তত বেশী লাগবে। তবে দল গঠন করার সময় শিক্ষক বিশেষ একটি দিকের প্রতি লক্ষ রাখবেন, সেটি হল দলে যেন পরস্পর বিরোধী মতবাদের শিক্ষার্থী স্থান পায়। এতে করে আলোচনা অনেক সজীব হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার্থীরা আলোচনা বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারে। এই পদ্ধতিতে প্রবন্ধ পাঠের পর অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরের মধ্যে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করে। পরে এই আলোচনায় শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এই ধরনের আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বক্তব্য সম্পর্কে প্রস্তুত হয়ে আসে বলে, এর মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এই আলোচনা পদ্ধতির পরিচালনার কৌশল প্যানেল আলোচনার মত। এখানেও একজন সভাপতি বা চেয়ারম্যান প্রয়োজন। শিক্ষক এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন বা কোনো শিক্ষার্থীর ওপরও এই ভার দেওয়া যেতে পারে। এই ভার যদি শিক্ষার্থীর ওপর দেওয়া হয়, তাহলে প্রবন্ধ রচনার সময় শিক্ষক এবং অংশগ্রহণকারীদের উপযুক্ত সাহায্য করবেন।

(গ) বিতর্কমূলক আলোচনা : বিতর্কও (Debate) এক ধরনের আলোচনা এবং এর সাহায্যেও পরিচালনা করা যায়। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রথমত বিষয়বস্তুটি বা বিশেষ কোনো একটি সমস্যা ঘোষণা করা হয়। পরে আলোচনার জন্য পরস্পরবিরোধী মতাবলম্বী দুটি দল গঠন করা হয়। এই দুটি দল পরস্পর নিজেদের বক্তব্য শ্রেণীর সামনে তুলে ধরে। তাছাড়া, এক পক্ষ অপর পক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করারও সুযোগ পায়। এই ধরনের আলোচনা পদ্ধতিতে যুক্তির যথার্থ্যের ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইভাবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের পর শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই প্রশ্নগুলির উত্তর বিভিন্ন পক্ষের বক্তারা দেন।

বিতর্কমূলক আলোচনায় শিক্ষকের ভূমিকা একটু নতুন ধরনের। তিনি এখানে সভার সভাপতি নন। তাঁকে সংশোধনকারী বা নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। তিনি আলোচনাসভার স্পিকার। তাঁর দায়িত্ব হল বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের ও সাধারণভাবে শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই নিয়ন্ত্রণ তিনি যত সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন, বিষয়বস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য তত সুন্দভাবে শ্রেণীর সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

(ঘ) সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা : সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করা যায়। সাক্ষাৎকার বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, শিক্ষামূলক সাক্ষাৎকার কিন্তু তা নয়। সাধারণ সাক্ষাৎকারে কোনো বিশেষজ্ঞ (Expert) তাঁর চেয়ে কম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নানারকম প্রশ্ন করেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি ওই ব্যক্তির জ্ঞানের মূল্যায়ন করেন। কিন্তু শিক্ষামূলক সাক্ষাৎকার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য মূল্যায়ন নয়, শিক্ষণ। এখানে, শিক্ষার্থীরাই বিশেষজ্ঞকে বা শিক্ষককে নানারকম প্রশ্ন করতে থাকে। শিক্ষক বাইরের কোনো ব্যক্তিকে এজন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমন্ত্রণ করতে পারেন। তবে এই ধরনের আলোচনা পদ্ধতি পরিচালনার পূর্বে শিক্ষার্থীদের ওই বিষয় সম্পর্কে পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। সাক্ষাৎকার যাতে অর্থপূর্ণ হয়, তার জন্য শিক্ষকের উচিত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যথাযোগ্য নির্দেশনা (Guidance) দেওয়া। তারা বিশেষজ্ঞকে কী ধরনের প্রশ্ন করবে, সে সম্পর্কে নির্দেশনা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাছাড়া, শিক্ষক বিশেষজ্ঞকেও শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও তাদের সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কে পূর্বে অবগত করাবেন। শিক্ষকের নির্দেশনায় সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাক্ষৎকার পরিচালিত হলে তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বিশ্বাসযোগ্যভাবে অর্জন করতে পারে।

(ঙ) অভিনয় সহযোগে আলোচনা : এই কৌশলকে বর্তমান সমাজীকৃত পদ্ধতি হিসেবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে এক ধরনের সামাজিক নাটক কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই অভিনয় করা হয়। শ্রেণীতে একটি বিশেষ সমস্যামূলক পরিবেশ রচনা করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা এই পরিবেশে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে অভিনয় করতে থাকে। ক্লার্ক (Clarke) বলেছেন, "Role-playing is a dramatic technique in which pupils attempt to portray a situation by putting themselves in the role of the participants."। এই পদ্ধতিতে আদর্শ সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা শিখনকে পরিচালনা করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যগুলিতে পৌঁছানো সহজ হয়। কারণ, এই ধরনের স্বাধীন অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং তাদের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির প্রতি স্থায়ী মনোভাবও গড়ে ওঠে। এই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এর গুরুত্ব সম্বন্ধে রবার্ট জ্যাকসন (Robert Jackson) বলেছেন—"Role playing is imprompter drama done by your students...of all teaching methods, it is probably the most creative."। এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ের সাহায্যে শিক্ষক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেকোনো কালের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে মূর্ত করে তুলতে পারেন। এই কারণে আধুনিককালে এই পদ্ধতির ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, এখানে আলোচনা ও বিষয়বস্তুর মূর্তন উভয়ই শিক্ষার্থীর মাধ্যমে করা সম্ভব হয়।

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Discussion Method) :

শিক্ষণের পদ্ধতি হিসেবে আলোচনাকে বর্তমানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর কারণ, এই পদ্ধতিতে পাঠদান করলে, শিক্ষার অনুকূল কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায়। আলোচনা পদ্ধতির এই সুবিধাগুলি নিম্নরূপ।

(১) সক্রিয়তা : এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, এখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শিক্ষণে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিষয়বস্তুর আলোচনায় অগ্রসর হয়। ফলে, শিক্ষণ অনেকাংশে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

(২) সামাজিক পরিবেশ : এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে বিষয়বস্তুর আলোচনায় বা সমস্যার সমাধানে অংশগ্রহণ করার ফলে শ্রেণীকক্ষে একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই সামাজিক পরিবেশ এক দিকে যেমন বিষয়কেন্দ্রিক শিখনে সহায়তা করে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের নানা রকমের সামাজিক গুণ বিকাশে সহায়তা করে।

(৩) স্বাধীন চিন্তন : আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করলে, শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। এর ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়, তাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। তাছাড়া, শিক্ষার্থীর স্বাধীন নিরপক্ষে চিন্তন ক্ষমতারও বিকাশ হয়। আলোচনা পদ্ধতি এই ধরনের চিন্তনে তাদের উদ্বুদ্ধ করে।

(৪) সংশোধনমূলক প্রচেষ্টা : আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায় বলে তাদের শিখনও পরিপূর্ণতা লাভ করে। তারা তাদের নিজেদের অসুবিধা দূর করতে পারে। ফলে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ এবং সংশোধনমূলক কাজ একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়।

(৫) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক : আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করলে, শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং শিক্ষার্থী শিক্ষক সম্পর্ক আদর্শস্থানীয় হয়। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এই পদ্ধতিতে ঘনিষ্ঠ হয় বলে, শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচে পাঠ গ্রহণ করতে পারে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করতে পারে। ফলে, বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

(৬) শৃঙ্খলা : প্রত্যেক আলোচনা কৌশলের নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে। আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা এই নিয়মগুলি মেনে চলে। ফলে, শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে।

(৭) গতানুগতিক শিক্ষণে শিক্ষার্থীরা যান্ত্রিক নিয়মে পাঠ্য বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে। এইসব বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করে না বা তার জন্য তারা চেষ্টাও করে না। ফলে, গতানুগতিক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের মনে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে না। আলোচনা সঠিকভাবে পরিচালিত হলে শিক্ষার্থীদের স্থায়ীভাবে চারিত্রিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি স্থায়ী মনোভাব গঠন করতে এবং জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে।

সুতরাং এই সমস্ত অসুবিধাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আলোচনা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক দক্ষতা অর্জনে শুধু নয়, তাদের সামাজিক ও চারিত্রিক বিকাশেও সহায়তা করে। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মন্তব্য

করেছেন— "Skilfully conducted group discussion, however, can be an effective means of influencing pupils attitude, clarifying their concept and planning ideas."।

আলোচনা পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Discussion Method)

আলোচনা পদ্ধতির উপরিউক্ত সুবিধাগুলি থাকলেও তার পরিচালনার বিশেষ কতকগুলি অসুবিধা আছে। এই অসুবিধাগুলির কথা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত, পরিকল্পনা : আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনার জন্য সুপরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা সাধারণত সকল শিক্ষকের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয় না। আর পরিকল্পনা ঠিকমত না হলে সম্পূর্ণ আলোচনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এমন কী অপরিকল্পিত আলোচনার প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক রকম কু-অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে। রবার্ট ম্যাককিন (Robert Mckean) বলেছেন— "Conducting discussions successfully requires considerable skill and a good deal of planning. Otherwise, discussions can degenerate into aimless full sessions in which the participants share their ignoranc and reinforce their prejudices."।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষকের প্রস্তুতি : এই পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করতে হলে শিক্ষকের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। কারণ, এখানে শিক্ষকের পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতিতে সবসময় পাঠ-পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের আলোচনা যেমন গতি নেবে, সেই অনুযায়ী তাঁকে প্রতিক্রিয়া করতে হবে। শিক্ষার্থীদের যেকোনো ধরনের সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধান করার মতো তাঁর প্রস্তুতি একান্তভাবে প্রয়োজন। আবার আলোচনা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেও তাঁর বিশেষ প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। আলোচনা পদ্ধতিতে আলোচনা যাতে বিষয়ান্তরে চলে না যায়, তার জন্য শিক্ষককে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই কৌশল আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ : আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়াকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মনোভাব গড়ে উঠতে পারে; কোনো বিশেষ মতবাদের সঙ্গে তারা তাদের প্রক্ষোভিক অনুভূতিকে মিশিয়ে ফেলে। তার বিরুদ্ধাচরণ করলে তারা ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযোগ্য প্রেষণা গড়ে উঠতে পারে না। এই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ খুবই কঠিন কাজ।

চতুর্থত, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা : এই ধরনের দলগত আলোচনামূলক শিক্ষণ পদ্ধতির প্রভাবে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসামাজিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়। তাদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা দেয়, পরস্পরের জন্য ঈর্ষার ভাব জাগ্রত হয়। এই অবস্থা নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে শিক্ষকের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না।

পঞ্চমত, হীনমন্যতাবোধ : আলোচনা পদ্ধতিতে দল গঠনের সময় সাধারণত শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত ভালো শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয়। এর ফলে শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনমন্যতার ভাব জাগে। আলোচনার সময় শিক্ষক স্বাভাবিকভাবে ভালো ছাত্রদের মতামতের ওপর গুরুত্ব দিতে বাধ্য হন। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই ,ঠিক মতবাদ ব্যক্ত করে। এই ধরনের অবস্থা সবসময়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না।

মন্তব্য : সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ-পরিচালনা করলে শিক্ষণ ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিককে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায় না। তাই এই পদ্ধতির অনেক সুবিধা থাকলেও একে

এককভাবে শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। যদিও এই পদ্ধতি শিক্ষণ পরিস্থিতিকে সামাজিক পরিবেশে রূপান্তরিত করে, তাহলেও শিক্ষণের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হিসেবে এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করা যায় না। শিক্ষণের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করলে শিক্ষণকে কার্যকর করা যায়। এই কারণে, ডাল্টন পরিকল্পনায়, প্রোজেক্ট পদ্ধতিকে ব্যবহার করলে শিক্ষণকে কার্যকর করা যায়। এই কারণে, ডাল্টন পরিকল্পনা, প্রজেক্ট পদ্ধতি ইত্যাদিতে আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, অন্য যেকোনো শিক্ষণ পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে আলোচনা কৌশলকে ব্যবহার করা যায়। শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে এই পদ্ধতির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

৪.৪. ক.৫. বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) :

বক্তৃতা পদ্ধতি পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত। তবে অনেক ক্ষেত্রে বক্তৃতাকে শিক্ষণ পদ্ধতি না বলে শিক্ষণ কৌশল বলেই অভিহিত করা হয়। এই বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষখ স্বল্পসময়ে দ্রুতগতিতে অধিক পরিমাণে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। একসঙ্গে অধিক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা পাঠদানে অংশগ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক বেশী সক্রিয় থাকেন আর শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতার ভূমিকা নিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা বা চাহিদার খুব একটা মূল্য থাকে না। এই পদ্ধতিতে দ্রুত পাঠ শেষ করা যায়। অনেক সময়ই শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহ বা মনোযোগ হারায়।

বর্তমানে বক্তৃতা পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও নানান সহযোগী উপকরণেরও সাহায্য নেওয়া হয়। তাই মৌখিক এই পদ্ধতি বর্তমানে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

বক্তৃতা পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (Characteristics of lecture method) :

১। অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় বক্তৃতা পদ্ধতিরও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে যা পাঠ-পরিচালনার প্রতিটি স্তরেই পরিলক্ষিত হয়।

২। শিক্ষকের সুস্পষ্ট উচ্চারণ দক্ষতা, দেহভঙ্গিমা, স্বরের পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতি এই পদ্ধতির গুণগত মানকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনোযোগ, আগ্রহ, গ্রহণ ক্ষমতা প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হয়।

৪। ভাষার সাবলীলতা প্রকাশভঙ্গি প্রভৃতি বক্তৃতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে কাজ করে।

৫। বক্তৃতা পদ্ধতিকে আরো কার্যকরী ও প্রাণীবন্ত করে তুলতে শিক্ষণ প্রদীপন, প্রশ্ন-উত্তর, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, উদাহরণ, আরোহী-অবরোহী প্রভৃতি কৌশলের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Lecture Method) :

১। এই পদ্ধতি ব্যয়বহুল নয়, যন্ত্রপাতি বা উপকরণ আবশ্যিক নয়।

২। স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণে তথ্যকে উপস্থাপন করা যায়। ফলে যথা সময়ে পাঠ শেষ করার কোনোরূপ সমস্যা থাকে না।

৩। কোনো কাহিনী বা জটিল বিষয়কেও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে সহজভাবে উপস্থাপন করা যায়।

৪। এই পদ্ধতিতে একসঙ্গে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাঠ নিতে পারে বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনমতো মনোবৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক বিন্যাসে উপস্থাপন করা যায়।

বক্তৃতা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা (Limitations of Lecture) :

১। এই পদ্ধতি শিক্ষক নির্ভর। শিক্ষর্থীরা শিখনে সক্রিয় থাকে না তাই অনেক সময় এরা পাঠে আগ্রহ হারায়।

২। এই পদ্ধতি বক্তৃতা নির্ভর, মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়।

৩। এই পদ্ধতি ব্যক্তিবৈষম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

৪.৪.ক.৬. প্রতিপাদক পদ্ধতি (Demonstration Method) :

প্রতিপাদক পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক কোনো তত্ত্ব বা নীতিকে যাচাই করার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্বকে নিজে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করেন। শিক্ষক নিজে হাতেকলমে তথ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। তবে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পরীক্ষার যন্ত্রপাতি সাজালে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বাড়ে। অর্থাৎ যতটা সম্ভব বেশী মাত্রায় শিক্ষার্থীদের এই পরীক্ষার কাজে যুক্ত করতে হবে। পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষক ছাত্রদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন, ছাত্ররা পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান থেকে উত্তর প্রদান করবে। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল শিক্ষক বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পাঠের বিষয়বস্তু অনুধাবন করে। শিক্ষার্থীরা প্রতিমুহূর্তে সচেতন থাকে এবং পরীক্ষার প্রতিধাপে যা ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করে, খাতায় নথিভুক্ত করে এবং পরিশেষে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পরীক্ষণের সরঞ্জাম ছাড়াও ম্যাপ, চার্ট, মডেল প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়।

প্রতিপাদক পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Demonstration Method) :

১। বৈজ্ঞানিক নীতি, তত্ত্ব যাচাই করা হয়, ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

২। শিক্ষার্থীরা অধিক পরিমাণে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পায়।

৩। বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কম ব্যয়বহুল। এক সেট করে যন্ত্রপাতি থাকলেই চলে।

৪। সময় কম লাগে।

৫। শিক্ষক নিজে পরীক্ষার কাজে যুক্ত থাকার ফলে বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে।

প্রতিপাদক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা (Limitations of Demonstration) :

১। শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রী হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ পায় না।

২। ব্যক্তি বৈষম্যের নীতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ চাহিদা, সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায় না।

৩। মেধাবী ছাত্ররা বেশী উৎসাহিত হয়। এই পদ্ধতিতে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েরা যথাযথভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেখায় না।

৪। পিছনে বসা ছেলেমেয়েরা সবসময় পরীক্ষার খুঁটিনাটি দেখতে পায় না।

৪.৪.ক.৭. আরোহী এবং অবরোহী দৃষ্টিভঙ্গি (Inductive and Deductive Approach) :

শ্রেণী শিক্ষণকে কার্যকরী করতে আমরা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আরোহী ও অবরোহী দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশল। এগুলি মূলত যুক্তি নির্ভর পদ্ধতির (Logical Method) দুধরনের দৃষ্টিভঙ্গি।

❋ **আরোহী দৃষ্টিভঙ্গি (Inductive approach) :** আরোহী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হিসাবে আমরা গ্রীক দার্শনিক প্লেটো অ্যারিস্টটল প্রমুখকে মান্যতা দিয়ে থাকি। প্লেটোর মতে ব্যক্তির সাধারণ বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান, চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা বা নিয়মের বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব। অন্যদিকে অ্যারিস্টটল মনে করেন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঘটনার পর্যবেক্ষণ তার বিচার বিশ্লেষণ, ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক প্রভৃতি নিরুপণ করা যায়। তবে আরোহী পদ্ধতিকে সুসংহত রূপ দান করেন ব্রিটিশ দার্শনিক ফ্রানসিস বেকন। তিনি বলেন কোনো জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের নির্বাচন, বিচার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা করা এবং তার ভিত্তিতে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। প্রকৃত পক্ষে এই প্রণালীবদ্ধ প্রক্রিয়াই হলো আরোহী দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশল। তাই অনেকে ফ্রানসিস বেকনকেই আরোহী দৃষ্টিভঙ্গির জনক বলে অভিহিত করেন।

আরোহী দৃষ্টিভঙ্গি হল বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা তথ্য বা অভিজ্ঞতা থেকে পরীক্ষানিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ সত্যে বা সূত্রে উপনীত হওয়া। ছোটো ছোটো বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমন্বয়সাধন করে সামান্যকরণ করা অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত (Particular to general) হওয়াই হল আরোহী কৌশল। এক্ষেত্রে শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। শিক্ষক অথবা পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষার্থীরা প্রথমে বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা সত্যের সাথে পরিচিত হবে, পরে পরীক্ষানিরীক্ষা, যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো যুক্তিসম্মত সাধারণ সত্যে উপনীত (Analysis to synthesis) হয় ফলস্বরূপ শিক্ষার্থী সহজেই বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় এবং এই জ্ঞান বাস্তব জীবনে নানান সমস্ত সমাধানে সহায়ক হয়।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়— লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সহজে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে। আরো পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই ধারণাকে আরো বিস্তৃত করে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায় ''ধাতু তড়িৎ-এর সুপারিবাহী''। এছাড়া সাধারণ দৃষ্টান্ত হল, আমরা দেখতে পাই মানুষ একের পর এক মারা যায় অর্থাৎ আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ''মানুষ মরণশীল''। জ্যামিতি শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের একাধিক ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলা হল, বাহুগুলি পরিমাপ করতে বলা হল। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজেরাই দেখবে যেকোনো দুটি বাহুর যোগফলের পরিমাণ তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বেশী হচ্ছে এবং কোনোভাবেই দুটি বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ছোটো হচ্ছে না। তখন শিক্ষার্থীরা নিজেরাই এখান থেকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে ''যেকোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর''। এইভাবে

শিক্ষার্থীরা সক্রিয় প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, উদাহরণের মধ্য দিয়ে সাধারণ সত্য বা সূত্রে উপনীত হওয়াকেই আমরা আরোহী দৃষ্টিভঙ্গি নামে অভিহিত করে থাকি। শিক্ষাবিদ M.W.Ryburn যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পদ্ধতি (Method) হিসাব উল্লেখ করেছেন এবং এর গুরুত্ব হিসাবে বলেন, ''The inductive method is the best method of training children to think for themselves, but they must be allowed and encouraged to carry out the process themselves.''

❋ অবরোহী দৃষ্টিভঙ্গি (Deductive approach) :

এই দৃষ্টিভঙ্গি হল কোনো সূত্রকে বাস্তব ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখা অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। শিক্ষার্থীরা প্রথমে পাঠ্যবই বা শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো সাধারণ সত্য বা সূত্রকে জানবে।

তখন শিক্ষার্থীরা এই সূত্রটিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার সত্যতা যাচাই করবে। এক্ষেত্রে সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে অগ্রসর হয় (General to particular)। অবরোহী কৌশলে সাধারণ সত্য বা সূত্রকে যাচাই করার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বাস্তবায়ন ঘটে, প্রসার ঘটে, পরিপূর্ণতা পায় এবং মানসিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই কৌশলের মধ্য দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্য বা সূত্রকেও যাচাই করে দেখা হয়।

''প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে''— এই প্রতিষ্ঠিত সাধারণ সত্যটিকে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে যাচাই করবে এবং নিজেরাই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে।

আরোহী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ সত্যে উপনীত হয়। অন্যদিকে অবরোহী প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে সাধারণ সত্যটিকে যাচাই করা হয়।

বিভিন্ন ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে আমরা যেমন সাধারণ সিদ্ধান্ত ''যেকোনো দুটি বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বেশী'' বলতে পারি, ঠিক বিপরীতক্রমে এই সাধারণ সিদ্ধান্তটিকে পুনরায় বিভিন্ন আকৃতির ত্রিভুজ অঙ্কন করে যাচিয়ে নিতে পারি।

যৌক্তিক পদ্ধতির কৌশল হিসাবে আরোহী এবং অবরোহী দুটি প্রক্রিয়াই শিক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। সাধারণ থেকে বিশেষ এবং বিশেষ থেকে সাধারণ উভয় প্রক্রিয়াই কোনো বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। আরোহী এবং অবরোহী প্রক্রিয়াকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। যেকোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যাচাইকরণে এই প্রক্রিয়া দুটি যুগপৎ প্রয়োগ বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়।

❋ আরোহী দৃষ্টিভঙ্গির সুবিধা (Advantages of Inductive Approach) :

১। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বা বিশেষ বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ফলে শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তাবোধ, বুদ্ধি ও বিচার শক্তির বিকাশ ঘটে। আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

২। শিখনে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, অর্জিত অভিজ্ঞতার স্থায়িত্ব বাড়ে।

৩। শিক্ষার্থীর এই কৌশলের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সাধারণীকরণ করতে শেখে, জ্ঞানকে আরো সংগঠিত করতে পারে, বৌদ্ধিক সংগঠনের বৃদ্ধি হয়।

❋ **আরোহী দৃষ্টিভঙ্গির অসুবিধা (Disadvantages of Inductive Approach) :**

১। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন যার অভাব রয়েছে।

২। সময় ও অধিক শ্রমের প্রয়োজন হয়।

৩। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কাছে অর্থাৎ শিশুমনে এই কৌশল চাপ সৃষ্টি করে।

❋ **অবরোহী দৃষ্টিভঙ্গির সুবিধা (Advantages of Deductive Approach) :**

১। এই কৌশল 'সমগ্র থেকে অংশ' এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত এই শিখন নীতি অনুসরণ করে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই শিখন কৌশল খুবই কার্যকরী।

২। সময় কম লাগে এবং পরিশ্রম কম হয়।

৩। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সাধারণ সত্যের যাচাই করার সুযোগ পায় ফলে তারা শিক্ষণে খুবই আগ্রহী ও সক্রিয় থাকে।

❋ **অবরোহী দৃষ্টিভঙ্গির অসুবিধা (Disadvantages of Deductive Approach) :**

১। এই কৌশলের মাধ্যমে কোনো সাধারণ সত্যের যাচাই করা হয় মাত্র অনেকটা যান্ত্রিকতা এখানে পেয়ে বসে। নিজস্ব চিন্তাভাবনার জায়গা কম।

২। মৌলিক কোনো আবিষ্কার বা ধারণা এক্ষেত্রে দেওয়ার সুযোগ কম থাকে।

৩। পাঠ্যসূচীর সকল বিষয় এই কৌশলের দ্বারা উপস্থাপন করা যায় না।

৪.৪.ক.৮ ক্ষেত্র পরিদর্শন (Field Survey) :

আমরা জানি শিক্ষা হল, শিশুকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া। এই ধরনের সুপরিকল্পিত প্রভাবের দ্বারা শিশুর এবং সমাজের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় এবং উভয়ের উন্নতি হয়। এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে কিছু পরিবর্তন হয়, যেগুলি তাদের উন্নতির সূচক। এই পরিবর্তনগুলিকেই অনেক সময় শিক্ষা বলা হয়। যেমন, 'শিক্ষিত ব্যক্তি' বলতে কিছু বিশেষ ধরনের জ্ঞানের (Knowledge) বা দক্ষতার (Skill) অধিকারীকে বোঝায়। এখানে জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তি শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করেছে। তাই এসব ক্ষেত্রে, এডুকেশন বলতে ফলকে বুঝতে হয়। অন্যদিকে, শিক্ষাবিজ্ঞান (Socience of education) যাকে চলিত কথায় শুধুই 'শিক্ষা' বলা হয়ে থাকে, সেটি হল মানুষের বিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডারের একটি বিশেষ অংশ বা শাখা (Branch of human knowledge)। এই জ্ঞানের শাখায় বা বিজ্ঞানে, মানুষের শিক্ষাপ্রক্রিয়া ও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মানুষের প্রকৃতি এবং সামাজিক সংস্থাগুলির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার জন্য এবং ওইসব সমাজ সংস্থাগুলির উন্নতিসাধনের জন্য বর্তমানে বহু বিশেষধর্মী জ্ঞানের শাখা গড়ে উঠেছে। এইসব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় সামাজিক বিজ্ঞান (Social science)। শিক্ষা, আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সেই সামাজিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, সামাজিক বিভিন্ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে। এই কারণে, শিক্ষাবিজ্ঞানও একটি সামাজিক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল— শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, গতি, উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য সংযুক্ত বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা করা। শিক্ষাবিদ এম.আর চালর্স (M. R. Charles) শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রকৃতি বোঝাতে তাকে একটি প্রয়োগমূলক

সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছে "Education is an applied social science" অর্থাৎ শিক্ষাবিজ্ঞানে, যে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাই নয়, তার একটি প্রয়োগমূলক দিকও আছে। আর এই কারণেই শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়। এই বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতেই শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বর্তমান সমাজে পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা হয়। শিক্ষার তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকার যেকোনো চিন্তাবিদের থাকলেও, সেই প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত মতামত ব্যক্ত করার অধিকার কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের। এই বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা হলেন শিক্ষাবিজ্ঞানী। এই শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ তাঁদের গবেষণা ক্ষেত্রে শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রয়োগমূলক দিক সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষামূলক তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অবদানে ফলশ্রুতি হিসেবে এবং যৌক্তিক ও পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের (Logical and experimental conclusions) ফলে জ্ঞানের যে পৃথক শাখা গড়ে উঠেছে, তাকেই বলা হয় শিক্ষাবিজ্ঞান (Science of education)।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য প্রয়োগমূলক সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মতই শিক্ষাবিজ্ঞানও মানুষের জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমন্বয়ের ফলে গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানের (Science of medicine) কথা। জ্ঞানের এই শাখা তার বিকাশে, জীববিদ্যা, রসায়ন, জৈব রসায়ন, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির মত বিশেষধর্মী জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছে। ঠিক একইভাবে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানেও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্ককে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যান্য বিশেষধর্মী সামাজিক বিজ্ঞান সহায়তা করেছে। সাধারণত যে সকল বিজ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞানকে, বর্তমান স্তরে উন্নীত হতে সহায়তা করেছে, সেগুলি হল নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, মনোবিদ্যা ইত্যাদি। এছাড়া দর্শনশাস্ত্র এবং শিক্ষাবিজ্ঞানীদের নিজস্ব পরীক্ষালব্ধ বিভিন্ন তথ্যাবলী এই বিজ্ঞানের বিকাশে সহায়তা করেছে। এমনকি আধুনিককালে বিভিন্ন বস্তুধর্মী বিজ্ঞানের তথ্যাবলী ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যাকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার প্রসঙ্গে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংযোজন করেছেন, যাকে বলা হয় শিক্ষাগত প্রযুক্তিবিদ্যা (Educational Technology)। তবে প্রসঙ্গক্রমে একথাও স্মরণ রাখার দরকার যে শিক্ষাবিজ্ঞান, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি তথ্যের সমবায় নয়। বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, শিক্ষাবিজ্ঞান তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করে, তার নিজস্ব আলোচ্য বিষয়বস্তুর একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে।

অন্যদিকে ক্ষেত্র বা স্থান পরিদর্শন শিক্ষাবিজ্ঞানের এই জ্ঞানকে আরো সুদৃঢ় করে, সুসংহত করে তোলে। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে যে জ্ঞান শিক্ষার্থীরা পায় তা পুঁথিগত অসম্পূর্ণ ও সংকীর্ণ হয়; বাস্তব জগতের সাথে সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু স্থান পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ পায়। এই শিক্ষালাভের মূল্যও অনেক বেশি। এই অভিজ্ঞতার স্থায়িত্বও বেশি অর্থাৎ দীর্ঘ দিন আমরা এই অভিজ্ঞতাকে মনের মণিকোঠায় ধরে রাখতে পারি। ক্ষেত্র বা স্থান পরিদর্শন শ্রেণীকক্ষের পাঠদান প্রক্রিয়ার পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত। শ্রেণীকক্ষের সাধারণ আলোচনা বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রের অনুবন্ধ স্থাপন করা যায়, শ্রেণীর তাত্ত্বিক জ্ঞানকে এই ক্ষেত্র পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে আরো দৃঢ় ও সংহত করা যায়। স্থান বা ক্ষেত্র পরিভ্রমণই শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করে (Travelling makes education perfect)। এই ভ্রমণ স্থানীয় স্তরেও হতে পারে আবার দূর দূরান্তরেও হতে পারে।

বাস্তবক্ষেত্র পরিদর্শনের গুরুত্ব (Imortance of Field Survey) :

❋ বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পরিভ্রমণ এক অপরিহার্য শিক্ষণ কৌশল হিসাবে স্বীকৃত। পুঁথির মধ্যে বা তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যে আমরা বাস্তব জগতকে পাই না। বিভিন্ন সমাজের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার বিভিন্ন। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, ভৌগলিক অবস্থা ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে বাস্তবজ্ঞানের জন্য ভ্রমণ অপরিহার্য। বিদ্যালয় গণ্ডীর বাইরে পাঠ্যপুস্তকের সীমানা ছাড়িয়ে যে বিশাল জগৎ রয়েছে তার সাথে পরিচয় করা শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমেই সম্ভব। সেই সুদুর প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশেই দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করত, বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করত।

❋ স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন, মন্দির মসজিদের নকশা, রাজ রাজাদের দুর্গ-প্রাসাদ প্রভৃতি থেকে তৎকালীন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায়। শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করে, তাত্ত্বিক বিমূর্ত জ্ঞানকে মূর্ত করে তোলে।

❋ স্থান পরিভ্রমণ এই বৈচিত্র্যময় দেশের সাধারণ মানুষের নানান ভাষা সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচারণের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে।

❋ প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে আধুনিককালের বিখ্যাত সব প্রতিষ্ঠানগুলি চাক্ষুষ করার মধ্য দিয়ে মানুষের শিক্ষা সাধনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি শিক্ষার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়।

❋ দলগতভাবে স্থান পরিভ্রমণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও দলগত সংহতি গঠনে সাহায্য করে।

❋ পরিশেষে এটা বলা যায় যে, এই ধরনের স্থান পরিভ্রমণমূলক প্রোজেক্ট দেওয়া যায়। এই শিক্ষা আনন্দদায়ক ও সক্রিয়তাভিত্তিক হয়। শিশুর কৌতূহল নিবৃত্তির সহায়ক হয়। পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে শ্রেণীকক্ষের বাইরে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক উন্নতি জীবনগঠন ও দৃষ্টির প্রসারতার জন্য স্থান পরিভ্রমণ অপরিহার্য।

কার্যকরী স্থান পরিভ্রমণের শর্তাবলী (Conditions of effective field survey) :

❋ ক্ষেত্র পরিভ্রমণকে সার্থক করে তুলতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে—

❋ শিক্ষক মহাশয় এমন একটি স্থান নির্বাচন করবেন যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সর্বাধিক মাত্রায় সংগ্রহ করতে পারে।

❋ ক্ষেত্র পরিদর্শনে শিক্ষকের কাজ হল পরিদর্শনের স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি পড়াশুনো করা ও তথ্য সংগ্রহ করা।

❋ সময়সূচীতে স্থানীয় স্তরে পরিদর্শন বা সার্ভের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা। এছাড়া গ্রীষ্মের ছুটি বা পুজোর ছুটিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি।

❋ আর্থিক সঙ্গতির বিষয়েও শিক্ষককে সচেতন থাকতে হয়।

- শিক্ষার্থীদের যথাযথ তথ্য সরাবরাহের জন্য পরিদর্শনের সময় শিক্ষককে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। শিক্ষার্থীরা যাতে পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে প্রণালীবদ্ধভাবে নোটবুকে নথিভুক্ত করে সেবিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করবেন ও যথাযথ নির্দেশনা দেবেন।

- তবে শিক্ষামূলক এই পরিভ্রমণকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে হলে এটিকে শিক্ষার মূল্যায়নের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত করতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত তাত্ত্বিক ও অব্যবহারিক হওয়ায় স্থান পরিভ্রমণের গুরুত্ব ঠিকমত প্রতিফলিত হয় না। তাই এবিষয়ে সরকার, বিদ্যালয়, অভিভাবক সকলকে সজাগ হতে হবে।

৪.৪.খ. শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies)

৪.৪.খ.১. সংশোধনীমূলক শিক্ষণ (Remedial teaching)

পটভূমি : সংশোধনীমূলক শিক্ষণ (Remedial Teaching) শব্দটির ব্যবহার খুব বেশী দিনের নয়। ২০০২ সালে ওয়ান্ডাতে (Yaounde) একটি জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা সভায় এই বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করা হয়। এটা আবিষ্কৃত হয় যে ক্যামেরুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে থেকে যাওয়ার (অনুত্তীর্ণের) হার ৪১ শতাংশ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে এই ইঙ্গিত দেয় যে, শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কোথাও ত্রুটি রয়েছে এবং ফলস্বরূপ শিখনে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলিতে অধিকাংশ শিক্ষকই ছাত্রদের ব্যর্থতার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখান না। ছাত্রদের ব্যর্থতাকে নিজেদের ব্যর্থতা বলে মনে করার রেওয়াজও এদেশে নেই, বরঞ্চ তাদেরকে উপেক্ষা করেন এবং গতানুগতিক পাঠদান চালিয়ে যান। পারতপক্ষে তাঁরা সময়ে পাঠ্যসূচীটাকে শেষ করে দেন। ফলস্বরূপ খুব স্বল্প সাফল্যের সাথে পরিচিত হন। তাই যেকোনো শ্রেণীতে পিছিয়ে থাকা (যারা প্রত্যাশা থেকে কম সাফল্য পায়) ছাত্রের সংখ্যা, শ্রেণী শিক্ষকদের গুণগতমানের যথার্থতাকেই চ্যালেঞ্জ করে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একশ্রেণীর ছাত্রদেরকে সমস্যাসহ পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করেন। তাঁরা মনে করেন সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ছাত্ররা শিখে যাবে। যখন তারা শেষ শ্রেণীতে পৌঁছায়, তখন তারা চূড়ান্ত বার্ষিক পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল করতে সমর্থ হয় না। তখন শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন হন কারণ সেটা তাদের কাজের গুণগতমানকে প্রতিবিম্বিত করেন। একইভাবে শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়নকে বৃদ্ধি করে। মানবসম্পদের যথাযথ বিকাশও ব্যাহত হয়। তখন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষককে বিকল্প কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। স্বাভাবিক শ্রেণী শিক্ষণ বজায় রেখে অকৃতকার্য বা পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের শ্রেণীশিক্ষণের স্বাভাবিক গতির সাথে তাল মিলিয়ে বিশেষ প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ নিতে হয়। তাদেরকে গতানুগতিক শ্রেণী শিক্ষণের বাহিরে প্রাতঃকালীন এবং সন্ধ্যাকালীন অতিরিক্ত অনুশীলনের ব্যাপারে যত্নবান হতে হয়।

আমরা এমন একটি ভবিষ্যৎ সময়ের দিকে তাকিয়ে আছি যখন শিক্ষণ এবং শিখন হবে আরো ফলপ্রসূ। অনুন্নয়ন বা অনুত্তীর্ণের হার ন্যূনতম হবে এবং শিশুরা সফলভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করবে। তাই সেই সমস্ত শিশুরা যারা তাদের সহপাঠীদের সমকক্ষ হতে পারছে না, তাদেরকে সংশোধনী শিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন যাতে করে তারা আশার স্তরে পৌঁছাতে পারে, তার জন্য কিছু বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন আছে।

সংশোধনীমূলক শিক্ষণের সংজ্ঞা (Defination of Remedial Teaching) :

এটি ক্ষতিপূরণমূলক অথবা সংশোধনীমূলক শিক্ষণ নামে পরিচিত। শিক্ষণ চলাকালীন ধীরগতিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ঘাটতিপূরণে সাহায্য করার জন্য শিক্ষক শিক্ষাদান করেন। ''It is a multi faceted approach, tailoring remedial intervention plans to a child specific needs. It makes use of one-on-one instruction, small group instruction, written work, verbal work and computer based work.''.

- ❋ স্কুল সময়ের শেষে, সপ্তাহের শেষে অথবা ছুটিতে শিক্ষকমহাশয় অতিরিক্ত ক্লাস নেন।
- ❋ তিনি বেশিমাত্রায় শিক্ষণ সম্পদ এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন।
- ❋ শিক্ষক ছাত্ররা যেটা শিখল সেটাকে রপ্ত করতে, সংরক্ষণ করতে অথবা স্মরণ করতে সাহায্য করেন।

কোন কোন শিশুদের সংশোধনীমূলক শিক্ষণ প্রয়োজন (Which children need remedial teaching) :

১। কম পারদর্শিতা সম্পন্ন শিশু, পিছিয়ে পড়া বা ধীরগতিসম্পন্ন শিশু।

২। অনগ্রসর শিশু।

৩। প্রতিবন্ধী যেমন— বধির, মূক, বিকলাঙ্গ, অ্যালবিনো, ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন প্রভৃতি শিশুরা, এই ধরনের শিক্ষণের আওতায় পড়ে।

৪। এছাড়া যেসব শিশু দলগত শিক্ষণ এবং সহযোগিতামূলক শিক্ষণে নিষ্ক্রিয় থাকে তাদের জন্য এই ধরনের শিক্ষণ প্রয়োজন।

পিছিয়ে পড়ার কারণ (Causes of Under achievements) :

১। দীর্ঘ সময় ধরে শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলার কারণে শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়তে পারে।

২। শিশুদের কম প্রেষণা (উৎসাহিত) দেওয়া।

৩। বারবার ব্যর্থতার কারণে নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস হারানো।

৪। বিদ্যালয় পরিবেশের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া।

৫। বিদ্যালয়ে অনিয়মিত হাজিরা এবং পলায়ন মনোভাব।

৬। মাদকাসক্ত ও নেশাগ্রস্ত হওয়া।

৭। শ্রেণী শিক্ষণে মনোযোগের অভাব।

৮। শিক্ষক হিসাবে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার স্তরে পৌঁছে না দেওয়া।

৯। যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থার অভাব ও শিক্ষণের উদ্দেশ্যহীনতা।

১০। শিক্ষার্থীর যথাযথ মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়া।

সবমিলিয়ে শিশুরা যখন এই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তখন তাদের গুণগতমান সামগ্রিকভাবে কমে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে সকল শিশুর শিক্ষায় অগ্রগতি স্বাভাবিক রেখে শিক্ষার অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধ করার মাধ্যমে শিক্ষার সামগ্রিক খরচ কমানোর ক্ষেত্রে সংশোধনীমূলক শিক্ষণ কৌশল এক অনবদ্য প্রয়াস।

সংশোধনীমূলক শিক্ষণের কার্যপ্রণালী (Procedures for remedial teaching) :

* বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে ভাগ (Small Steps) করে পড়ানো হয়, ফলে জটিল ও বৃহৎ বিষয়বস্তুকে সহজ করে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে উপস্থাপন করা যায়।

* সংশোধনীমূলক শিক্ষণ চলাকালীন শিখন কেন্দ্রগুলি যথাযথভাবে পরিদর্শন করা হয় বা নজর রাখা হয়।

* ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individualized) শিক্ষা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

* পাঠের পুনঃশিক্ষণের (Re-teach) উপর জোর দেওয়া হয়।

* গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation) পদ্ধতি এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। গঠনমূলক মূল্যায়ন হল পাঠ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাইয়ের লক্ষ্যে ছোটখাটো পরীক্ষা নেওয়া। যার ফলে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পারদর্শিতা নির্ধারণ করা যায়, শিক্ষার্থীর যেমন শিখনে ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা যায়, তেমনি শিক্ষকদেরও শিক্ষাদানের সাফল্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

* চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative Evaluation) সংশোধনীমূলক শিক্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রত্যেকটা Unit-এর শেষে পরীক্ষা দিতে হবে। যারা ৮০ শতাংশ নাম্বার পাবে তাদেরকে একটা দলে ফেলা হবে এবং সেই Unit-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমৃদ্ধিমূলক কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ করবে। এটা তাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করবে। অন্যদিকে যারা ৮০-এর নীচে নাম্বার পাবে তাদেরকে আর একটি দলে ফেলা হবে এবং আরো কিছু অতিরিক্ত সময় ধরে সংশোধনীমূলক শিক্ষণ দেওয়া হবে। পরিশেষে শিক্ষকদের উচিত এদেরকে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়নের কাজ দেওয়া, যারা ৮০ শতাংশের বেশি নাম্বার পাবে তাদেরকে সমৃদ্ধ গ্রুপে যুক্ত করা এবং যারা ৪০ শতাংশের কম নাম্বার পাবে তাদের সংশোধনীমূলক শিক্ষণ পুনরায় চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা সেই Unit-টাকে বা পাঠকে আয়ত্ত করতে পারছে এবং ৮০ শতাংশের উপরে নাম্বার পাচ্ছে। এছাড়া পুনরায় আগের শ্রেণীর সাথে এদেরকে যুক্ত করে একটি নতুন Unit বা দল গঠন করে এই সংশোধনীমূলক শিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারে।

৪.৪.খ.২. প্রতিবিম্বিত শিক্ষণ (Reflective teaching) :

শিক্ষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া, শিখনে সহায়তার প্রক্রিয়া। আধুনিক অর্থে শিখন একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। তাই শিখন প্রক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করার জন্য বর্তমানে মনোবিদ্যায় বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। আবার শিক্ষণকে কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন শর্তের কথাও মনোবিদগণ উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে শ্রেণী শিক্ষণের সময় শিক্ষককে শিক্ষণের এই শর্তগুলি অনুসরণ করতে হয়।

এদিক থেকে বিচার করলে শিক্ষণ একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ শিখন সংক্রান্ত নীতিগুলি সীমাবদ্ধতার মধ্যে কার্যকরী করতে হয়। অন্যদিকে শিক্ষণ একটি শিল্পকলা (art)। কোনো প্রকৃত শিল্পকলাই সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হতে পারে না। তাই সুষ্ঠু শিক্ষার সাথে এই দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণার মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। শিক্ষাবিদ Stern বলেছেন, "The art of teaching lies in the communication and projection of an essentiaty private experience"। শিক্ষণের এই ধরনের সংজ্ঞায় শিক্ষণকে একটি পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষা হল একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া, এই অর্থে শিক্ষণও একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া (bipolar process)। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রতি কিছু ক্রিয়া করেন, পরিবর্তে শিক্ষার্থীরাও কিছু প্রতিক্রিয়া করে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই শিক্ষণ সংঘটিত হয়। ফলস্বরূপ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর আচার আচরণের পরিবর্তন ঘটে। আর এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি চিন্তনের ন্যূনতম স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে শেষ হয়।

শিক্ষণে প্রাথমিকভাবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও মুখস্থকরণের উপর জোর দেওয়া হয়; যেখানে বুদ্ধির বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না। অন্তর্দৃষ্টি গঠিত হয় না। শিক্ষণের প্রারম্ভিক এই স্তরকে মনোবিদেরা স্মৃতির স্তর (Memory level of teaching) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এর পরের স্তর হল বোধগম্যতার স্তর (Understanding level of teaching); যেখানে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুর মধ্যেকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্কগুলিকে খুঁজে পায়, বিষয়বস্তুকে নিজের দখলে নিয়ে আসে এবং বিষয়বস্তুর সামান্যকীকরণ করতে সক্ষম হয়। এই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার শেষ এবং সর্বোচ্চস্তর হল প্রতিবিম্বিতস্তর (Reflective level of teaching)। এই শিক্ষণ স্তর হল চিন্তনমূলক শিক্ষণের স্তর। এই স্তরে শিক্ষর্থীরা স্বাধীনভাবে অন্তর্দৃষ্টি গঠনে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুকে নিজস্ব ঢং-এ শ্রেণীবিন্যস্ত করে, পুনর্গঠিত করে। প্রতিবিম্বিত শিক্ষণ স্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। এই শিক্ষণ হল গণতান্ত্রিক এবং উদ্দেশ্যমুখী। চিন্তাশীল এই শিক্ষণ স্তরে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে। বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম হয়। কল্পনা শক্তি ও যুক্তি শক্তির বিকাশ ঘটে। M.L. Biggs-এর মতে "Reflective level of teaching tends to develop the classroom atmosphere which is more alive and exciting, more critical and penetrating and more open to fresh and oroginal thinking. Further more, the type of enquiry pursued by a reflective as tends to be more rigorous and work producing than pursued in the understanding learning situation"।

প্রতিবিম্ব শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of reflective teaching) :

১। এই স্তরের শিক্ষণকে কার্যকরী করে তুলতে শিক্ষার্থীর প্রেষণা ও প্রত্যাশাকে উদ্দীপিত করা বিশেষ প্রয়োজন হয়।

২। প্রতিবিম্ব শিক্ষণ পরিচালনা করতে গেলে স্মৃতি ও বোধগম্যতার শিক্ষণ স্তর সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে হয়।

৩। শিক্ষার্থীর একাগ্রতা বিশেষ মানসিক প্রস্তুতি ও উচ্চ মূল্যবোধ এই শিক্ষণ স্তরের সঙ্গে যুক্ত।

৪। বিষয়বস্তু উপস্থাপন এই স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এমনভাবে সমস্যার আকারে উপস্থাপন করা হয় যাতে তাদের মধ্যে চিন্তন ও সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটে এবং নিজেরাই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানসূত্র খুঁজে পায়।

৫। এই স্তরের শিক্ষণে পাঠ্যক্রম বা বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; সুনির্দিষ্ট কোনো প্রোগ্রাম অনুসরণ করা হয় না। এই স্তরের শিক্ষণ হল সমস্যাকেন্দ্রিক।

৪.৪.খ.৩ মাচান নির্মাণ (Instructional Scaffolding) :

শিক্ষণে মাচান নির্মাণ হল এক প্রকার নিবিড় স্তরের শিখন প্রক্রিয়া। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যাবলীতে নিযুক্ত করার জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকেন, যার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিখনের প্রাথমিক অসুবিধা বা বাধাগুলি কাটিয়ে বিদ্যালয়ের করণীয় কাজ (task) স্বাধীনভাবে করতে পারে। যাকে আমরা সাধারণভাবে শিক্ষণে মাচান নির্মাণ বা মজবুতিকরণ (Instructional Scaffolding) বলে থাকি। (Instructional scaffolding is a learning process designed to promote a deeper level learning. Scaffolding is the support given during the learning process which is tailored to the needs of the student with the intention of helping the student achieve his/her learning goals Sawyer, 2006)।

শিখন কার্যে এমন কিছু কাজ এবং অ্যাসাইনমেন্টাস ছাত্রদের দেওয়া হবে যেটা স্বতন্ত্র এবং নতুনত্ব হবে যা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবে এবং তাদের অর্থবহ শিখন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করবে। কাজগুলি হবে যথাযথভাবে সোজা যা শিক্ষার্থীদের সাফল্য দেবে যদি তার পিছনে যথেষ্ট সময় দেয়। কাজটির সাফল্য তখনই আসবে যখন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে দেওয়ার আগে কাজটি ব্যাখ্যা করেন এবং উদাহরণের সাহায্য বুঝিয়ে দেন এবং শিক্ষার্থীদের সাহায্যের দরকার হলে সাহায্য করেন। এই শিক্ষণের নীতি বলতে বোঝায় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, মডেলিং, কোচিং এবং অন্য যেকোনো প্রকার সাহায্যের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের নৈকট্য বিকাশ এলাকায় (Zone of Proximal Development-ZPD) থাকা জ্ঞানকে শক্তপোক্ত করা যখন শিক্ষকের বাইরের থেকে সহযোগিতা করাটা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যাবে। নৈকট্য বিকাশ এলাকা বলতে বোঝায় শিশুর অন্যের সাহায্য ছাড়াই বিকাশ ক্ষমতা এবং অন্য কোনো ব্যক্তি বা শিক্ষকের সাহায্যে অর্জিত বিকাশ ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্যকে বোঝায়। পরবর্তীকালে তারা যা শিখছে সেটা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

শিক্ষণে মাচান নির্মাণ হল শিক্ষার্থীর শিখনকে ত্বরান্বিত করতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহযোগিতা প্রদান করা বিশেষ করে যখন কোনো শিক্ষার্থীর ধারণা (Concepts) এবং দক্ষতার (Skills) সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হয়। এই সহযোগিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- Resourcess
- Compelling task
- Templates and guides
- Guidance on the development of Cognitive and social skills.

শিক্ষার্থীর মধ্যে যখন স্বাধীনভাবে শিখন কৌশল বিকশিত হবে তখন এই সহযোগিতাগুলি পর্যায়ক্রমে অপসারিত হবে এবং তাদের মধ্যে নিজস্ব জ্ঞানমূলক (Cognitive), অনুভূতিমূলক (Affective) এবং মনোসঞ্চালনমূল (Psychomotor) শিখন দক্ষতা ও প্রসার উন্নয়ন ঘটবে। এই Scaffolding তত্ত্বের প্রথম প্রবর্তক হলেন জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানী Jerome Burner (1905), পরবর্তীকালে এই তত্ত্বকে Lev Vygotsky, Wood, Ross (1976), Jesper Holfmeyer, Ellis & Northington (1944), প্রমুখেরা আরো বিকশিত করেন।

এই মাচান নির্মাণ Soft levl এবং Hard level-এ হতে পারে। স্বাভাবিক শ্রেণী শিক্ষণে যখন কোনো সমস্যার সমাধানে প্রশ্ন-উত্তর বা গঠনমূলক feed-back-এর সাহায্য নেওয়া হয় তখন তা Soft level-এর মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে Hard level-এর মাচান নির্মাণ হল পরিকল্পিতভাবে শ্রেণী কার্যাবলী সম্পাদনে সাহায্য করা যা উচ্চস্তরের চিন্তনে উদ্দীপিত করে। বিশেষ করে আবিষ্কারমূলক কার্যাবলীতে উত্তর সংকেত (Hints) বা সমাধান সূত্র (Clue) দিয়ে সাহায্য করা।

শ্রেণীকক্ষে মাচান নির্মাণের প্রক্রিয়া (Scaffolding in the classroom) :

শ্রেণী শিক্ষণে সফলতা পেতে গেলে শ্রেণী কার্যাবলীর (activities) যথাযথ নির্বাচন করার পাশাপাশি পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ (Monitoring) ও অনুসরণের (Followup) প্রয়োজন আছে। এর অর্থ হল উপযুক্ত নির্দেশনা (Guidance) প্রদান করার মাধ্যমে Feedback গ্রহণের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে শ্রেণীশিক্ষণে প্রস্তুত করা এবং শ্রেণীকে পরবর্তী প্রতিক্রিয়া প্রদানের (Post activity reflection) দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শ্রেণী কার্যাবলীর সূচনা পর্বে শিক্ষকমহাশয়দের উচিত উদ্দেশ্য নির্ধারণের উপর বেশী করে জোর দেওয়া এবং শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। তারপর প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট (Relevant background), অভিজ্ঞতা (Knowledge), মডেল (Model), কৌশল (Strategies) প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণী কার্যবলী (task) বা মাচান নির্মাণের প্রতি শিক্ষক পঠন বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। মূল ধারণাগুলি (Main ideas) সামান্যকীকরণ করবেন, এছাড়াও শিক্ষক Key ideas ও structural elements-এর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যে Study guides বিতরণ করবেন। শ্রেণী কার্যাবলী (task) বা assignments সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে তাদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা, উৎসাহিত করা Monitor করা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। এই ধরনের শিক্ষণ কৌশলকে আরও বেশি নিখুঁত করার জন্য শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের পারদর্শিতার (Performance) মূল্যায়ন করা। যখন Performance দুর্বল হয় তখন শিক্ষকের উচিত পুনঃশিক্ষণ (Reteaching) দেওয়া এবং assignments গুলি অনুসরণ করা। কোনো শ্রেণী কার্যাবলীকে (assignments) সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে শ্রেণী শিক্ষণকে প্রতিবিম্বিত স্তরে (reflective level) পৌঁছানো প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণী কার্যাবলীর পুনর্মূল্যায়ন (review) করেন ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে তাদের পারদর্শিতার সম্বন্ধে feedback

প্রদান করেন। এছাড়াও সামগ্রিক পাঠের লক্ষ্য (Goal) সম্পর্কিত মূল ধারণাগুলির উপর আলোকপাত করে পুনঃশক্তি প্রদান করবেন। Reflection activities-এর ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেমন—

১। ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয় অনুযায়ী প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া।

২। শ্রেণী, কার্যাবলীর পর্যবেক্ষণ অথবা অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

৩। মতামতের তুলনা করার মত শিখন-শিক্ষণ পরিবেশ বজায় রাখা।

অন্যভাবে বলতে গেলে শিক্ষার্থীরা কী শিখল এবং তা কীভাবে ও কতটুকু স্কুলের বাইরের জীবনের সাথে সম্পর্কিত হল তার বোধগম্যতার স্তরকে বৃদ্ধি করা।

সারাংশ (Summary) :

- মাচান নির্মাণ হল একপ্রকার শিখন প্রক্রিয়া যা শিখনকে সহজসাধ্য করে তোলে।
- এই প্রক্রিয়া শিক্ষার্থী এবং বিশেষজ্ঞ (expert) বা শিক্ষকের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে যা সহযোগিতামূলক এবং শিখন প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করে তোলে।
- শিখন সম্পন্ন হয় শিশুর নৈকট্য বিকাশ এলাকায় (Zone of proximal development-ZPD)।
- শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা বা সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞ তার সহযোগিতা বা নির্দেশনা ক্রমপর্যায়ে সরিয়ে নেবে।

৪.৪.খ.৪. মেধা বিক্ষেপণ (Brain Storming) :

মেধা বিক্ষেপণ (Brain Storming) একটি সৃষ্টিশীল বা সৃজনাত্মক প্রকৌশল। কোনো বিশেষ সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য যখন দলগতভাবে প্রত্যেক সদস্য অথবা এককভাবে কোনো ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ ধারণা প্রদান করে সমস্যাটির সমাধান করতে প্রয়াসী হয় তখন তাকে মেধা বিক্ষেপণ প্রকৌশল বলা হয়।(Brain Storming is a group or individual creativity teachnique by which efforts are made to find a conclusion for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously contributed by its members.)। অ্যালেক্স ফাইকনি অসবর্ন (Alex Faickney Osborn) 1953 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত '(Applied Imagination)' গ্রন্থে তাঁর এই মতবাদটি প্রকাশিত হয় এবং এই মতবাদ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অসবর্ন দাবি করেন সমস্যা সমাধানের জন্য ধারণা তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁর এই মেধা বিক্ষেপণ মতবাদ ব্যক্তিগত কর্মপ্রকৌশলের অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী। অবশ্য সাম্প্রতিককালের গবেষণায় Osborn প্রবর্তিত এই মতবাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। যদিও বর্তমানে অসবর্নের এই মেধা বিক্ষেপণ শব্দটি সমস্যা সমাধানের সমস্তরকম দলগত ধারণা সৃষ্টির আলোচনার ধারক হয়ে উঠেছে। Osborn-এর মতে মেধা বিক্ষেপণ মতবাদটি মূল দুটি নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে—

১। বিলম্বিত সিদ্ধান্ত (Defer Judgment)

২। সিদ্ধান্ত বা ধারণার পরিমাণ বৃদ্ধি করণ (Reach for Quantity)

এই দুটি মূল নীতি থেকে তিনি তাঁর মতবাদের পক্ষে ৪টি সূত্রের উদ্ভাবন করেন। এই সূত্রগুলি সৃষ্টির পিছনে তিনি তিনটি উদ্দেশ্য সামনে রেখেছেন। যথা—

১। সমস্যা সমাধানকারী দলের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক বাধা কমানো।

২। সমস্যা সমাধানের ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের উদ্দীপিত করা।

৩। সমস্যা সমাধানের ধারণা উদ্ভাবনের জন্য সামগ্রিকভাবে দলের সদস্যদের সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি করা।

মেধা বিক্ষেপণের সূত্র (General Rules) :

Osborn তার মতবাদ প্রতিষ্ঠায় যে চারটি সূত্রের অবতারণা করেছেন সেগুলি হল—

১। সমস্যা সমাধানের বহু ধারণার সৃষ্টি সঞ্চারণ।

২। সমস্যা সমাধানে ধারণাগুলির সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকবে।

৩। সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাভাবিক ধারণাগুলিও স্বাগত।

৪। সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্ভূত ধারণাগুলির সমন্বয়সাধন ও উন্নত ধারণার উদ্ভাবন।

ক) বহু ধারণার সৃষ্টি সঞ্চারণ (Focus on quantity) :

অসবর্নের সমস্যা সমাধান কৌশলের এইটি প্রথমসূত্র। এই সূত্র অনুযায়ী যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক ধারণার সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 'পরিমাণই গুণের উৎস'-এই আপ্তবাক্য থেকে Osborn তাঁর এই সূত্র তৈরী করেছেন। Osborn স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নিয়েছেন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যত বেশী পরিমাণে ধারণা তৈরী হবে ততই সমস্যাটির জন্য একটি কার্যকরী ও মৌলিক সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

খ) সমস্যা সমাধানে সৃষ্ট ধারণাগুলি সমালোচনা মুক্ত হবে (Withhold Criticism) :

সমস্যা সমাধানের জন্য মেধা বিকিরণ কৌশলের এইটি দ্বিতীয় সূত্র। Osborn-এর মতে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়োজিত সদস্যগণ ধারণা সৃষ্টি করে যাবে। এই ধারণাগুলি সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক সে বিষয়ে কোন সমালোচনা থাকবে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে সমস্যাটির সমাধানের জন্য নতুন নতুন ধারণা সম্প্রসারণ ও সংযোজন করা।

(গ) সমস্যা সমাধানের জন্য অস্বাভাবিক ধারণাগুলি স্বাগত (Welcome unusual ideas) :

সমস্যা সমাধানে Osborn প্রণীত মেধা বিকিরণ কৌশলের এইটি তৃতীয় সূত্র। এই সূত্র অনুসারে সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের সৃষ্ট ধারণার একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং এই তালিকায় কিছু কিছু অস্বাভাবিক ধারণাও স্থান পাবে এবং সেই ধারণাগুলি সমস্যা সমাধানের নতুন প্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করে গ্রহণ করা হবে। Osborn মনে করেন সমস্যা সমাধানের এই নতুন চিন্তাগুলি অধিকতর উন্নতমানের সমাধান দিতে পারবে।

ঘ) সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্ভূত ধারণাগুলির সমন্বয় ও উন্নত ধারণার উদ্ভাবন (Combine and improve ideas) :

সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মেধা বিকিরণ বা বিক্ষেপণ কৌশলের এইটি শেষ বা চতুর্থ সূত্র। এইসূত্রে osborn বলেছেন যে সমস্যা সমাধানের জন্য দলের সদস্যগণ তাদের প্রস্তুত করা ভালো ভালো ধারণাগুলি সমন্বয় করে একটি মাত্র অধিকতর ভালো ধারণা গঠন করবেন। "১ + ১" = ৩ এই স্লোগানের উপর ভিত্তি করেই তাদের অধিকতর উন্নতমানের ধারণাটি উদ্ভাবন করবেন যাতে সমস্যা সমাধান অধিকতর ভালোভাবে ও সহজে সাধিত হয়, কারণ এটা বিশ্বাস করা হয় যে সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিন্তা বা ধারণা সৃষ্টি উদ্দীপিত হয়। osborn তাঁর মেধাবিকিরণ বা মেধাবিক্ষেপণ কৌশলের প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে এই কৌশলের মাধ্যমে কেবলমাত্র একটি বিশেষ সমস্যার সমাধান করা যাবে, কারণ তিনি মনে করেন যে সমস্ত সভা বা অধিবেশনে অনেক প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয় সেগুলি কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

উপরন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নয় বরং ধারণা সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। উদাহরণ দিয়ে osborn বলেছেন যে কোন দ্রব্যের নাম দিতে হলে সেই দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন নাম সৃষ্টি করাই হল মেধা বিকিরণ (Brain Storming)।

মেধা বিক্ষেপণে দলবিন্যাস :

মেধা বিক্ষেপণ কৌশল সফল প্রয়োগের জন্য Osborn কয়েকটি দলের কল্পনা করেছেন এবং প্রত্যেকটি দলে বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষানবিশ সহ ১২ জন অংশগ্রহণকারী রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নিজ নিজ ধারণার কথা বলতে বলা হবে এবং এইসব ধারণা অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক ও উদ্ভট হলেও, ধারণাগুলির কোন সমালোচনা করা যাবে না। প্রত্যেক দলই সাধারণভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের ধারণার কথা বলে থাকে কিন্তু কোন বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্তের কথা বলবে না। সমস্যার সমাধানে নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বিষয়ে পরবর্তী সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মেধা বিক্ষেপণ কৌশলের বিভিন্নতা (Variations of Brainstorming) :

ক) তথাকথিত দলগত কৌশল (Norminal Group Technique)

এই কৌশলের মূল কথা হল যে দলে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলি দলনেতার কাছে নাম গোপন রেখে জমা দেবে। দলনেতা সেইসব মতামত জমা নিয়ে প্রত্যেকটি মতামতের উপর দলের প্রত্যেক সদস্যের ভোট গ্রহণ করবেন। ভোট দানের পদ্ধতিটি সহজ হবে; প্রত্যেক সদস্য গৃহীত প্রত্যেকটি মত বা ধারণার পক্ষে তাদের হাত তুলে ভোট দেবেন এবং ভোট গ্রহণের এই পদ্ধতিকে বলা হয় পরিশ্রবণ বা পাতন পদ্ধতি (Distillation Method)।

এইভাবে ধারণাগুলির পরিশ্রবণ বা পাতনের পর সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব ধারণা প্রথম সারির ধারণা হিসেবে গৃহীত হবে সেগুলিকে পুনরায় দলের মধ্যে অথবা উপদলের মধ্যে আরও চিন্তাভাবনার জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হবে। কখনও কখনও যেসব ধারণাগুলিকে আগে বর্জন করা হয়েছিল সেইগুলিকে সামনে নিয়ে এসে তাদের পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

খ) ধারণাসমূহের দলগত সঞ্চারণ (Group passing teachnique) :

দলের প্রত্যেক সদস্য চক্রাকারে বসে তাদের প্রত্যেকের ধারণা এক টুকরো কাগজে লিখে তার পাশের অংশগ্রহণকারীকে সরবরাহ করবে এবং পাশের অংশগ্রহণকারী পরে সেই ধারণার উপর তার নিজের চিন্তাভাবনা সংযোজন করবে। এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে যতক্ষণ না প্রত্যেকে তাঁর নিজস্ব ধারণা সম্বলিত কাগজটি ফেরত পায়। এইভাবে সমগ্রদল প্রত্যেকের ধারণার বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করবে।

এই পদ্ধতি অনুসারে সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক সময় দলের সকল সদস্যের ধারণাগুলি সন্নিবিষ্ট করে একটি 'ধারণাগ্রন্থ' (Idea book) তৈরী করা হয়। এর পরে ধারণাগুলি পড়ার জন্য দলের সদস্যদের একটি সভা বসবে এবং বই-এর মধ্যে সংগৃহীত ধারণাগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এই প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সমস্যাটি সম্পর্কে গভীরভাবে ভাববার সময় পায়।

গ) দলীয় ধারণার চিত্রায়ন পদ্ধতি (Team idea mapping method) :

দলীয় ধারণার চিত্রায়ন পদ্ধতি মস্তিষ্ক বিক্ষেপণ কৌশলের তৃতীয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে অনুষঙ্গমূলক পদ্ধতিও বলা হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে দলীয় সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বিকশিত হয় এবং ধারণার পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটে।

এই প্রক্রিয়াটি একটি সুনির্বাচিত বিষয় নিয়ে শুরু হয়। প্রত্যেক সদস্যই এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে মস্তিষ্ক চালনার সুযোগ পায় এবং সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের ধারণাগুলি প্রদান করে। পরে প্রদত্ত ধারণাগুলিকে একটি বড় মানচিত্রে সন্নিবেশ করা হয়। এই মানচিত্রটিকে বলা হয় 'ধারণা চিত্র' (Idea mapping)। সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন বিচিত্র ধারণাগুলিকে সংহত করার পর্বে দলের অংশগ্রহণকারীরা যখন সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের জমাকৃত ধারণাগুলি সম্পর্কে সহমত হয়ে উপলব্ধি (Understanding) স্তরে পৌঁছায় তখন অনুষঙ্গের ফলে অনেক সময় অনেক নূতন নূতন ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সেই নূতন ধারণাগুলিকে ধারণার মানচিত্রে পুনরায় সন্নিবিষ্ট করা হয়। তখন দল ধারণাগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজায় এবং সমস্যা সমাধানের কাজ শুরু করে।

ঘ) নিয়মলঙ্ঘনের কৌশল (Breaking the rules technique) :

এই পদ্ধতি অনুসারে দলীয় অংশগ্রহণকারীরা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথাগত অথবা প্রথা বহির্ভূত সমস্ত নিয়মরীতিগুলির একটি তালিকা প্রণয়ন করে তারপর তারা এইসব প্রতিষ্ঠিত নিয়মরীতিগুলিকে ভাঙা অথবা এড়িয়ে চলার জন্য বিকল্পের কোনো পদ্ধতি গড়ে তোলে।

ঙ) নিয়ন্ত্রিত মেধা বিক্ষেপণ (Directed Brainstorming) :

নিয়ন্ত্রিত মস্তিষ্ক চালনা বা মেধাবিক্ষেপণ বৈদ্যুতিন মস্তিষ্ক চালনার একটি ভিন্নতর রূপ। এই ধরনের মস্তিষ্ক চালনা কম্পিউটারের সাহায্যে সম্পন্ন করা যায়।

নিয়ন্ত্রিত মস্তিষ্ক চালনায় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি কম্পিউটার দেওয়া হয়। তারপরে তাঁকে মস্তিষ্ক চালনা করার মত একটি প্রশ্ন দিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়। উত্তর পাওয়ার পর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে অধিক উন্নতমানের একটি ধারণা সৃষ্টি করতে বলা হয়। পরীক্ষা করে

দেখা গেছে নিয়ন্ত্রিত মস্তিষ্ক চালনায় অংশগ্রহণকারীদের সৃষ্টিশীলতা বৈদ্যুতিন মস্তিষ্ক চালনার অপেক্ষা তিনগুণ বৃদ্ধি পায়।

চ) নির্দেশিত মেধা বিক্ষেপণ (Guided brainstorming) :

নির্দেশিত মেধা বিক্ষেপণ বা মস্তিষ্ক চালনা একটি পূর্ব নির্ধারিত অধিবেশন কেন্দ্রিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে মস্তিষ্ক চালনা করা হয় এই বিশেষ অধিবেশনে। এই ধরনের মস্তিষ্ক চালন প্রক্রিয়ায় সমস্তরকম দ্বন্দ্ব দূর করে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত চাপ সৃষ্টি করে, যার ফলে অংশগ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে সুস্থ ও শান্ত পরিবেশে ব্যাপৃত হয়ে সৃষ্টিশীল ও সমালোচনামূলক চিন্তার উদ্ভব ঘটায়। নির্দেশিত মস্তিষ্ক চালন কৌশলের পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নির্ধারিত সময়ের জন্য তাঁদের মানসিক প্রস্তুতি রাখার কথা বলা হয় যার ফলে তারা দলের কাজের পর্যবেক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় মানসিক মানচিত্রে তাদের ধারণা সংযোজন বা চিত্রিত করতে পারে। মানচিত্রে সমন্বিত বহুমুখী প্রেষিতের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে অংশগ্রহণকারী সহজ সমাধানগুলি সম্ভবত খুঁজে পায় এবং সমষ্টিগতভাবে একটি বড়ো কাজের প্রেক্ষিত তৈরী হয়।

ছ) ব্যক্তিগত মেধা বিক্ষেপণ (Individual Brainstorming) :

ব্যক্তিগত মেধা বিক্ষেপণ বা মস্তিষ্ক চালন কৌশল নির্জনে সংঘটিত মস্তিষ্ক চালন কৌশল। স্বাধীনভাবে লেখালেখি করা, কথা বলা, শব্দ সংযোজন করা এবং মনের মানচিত্র নির্মাণ করা প্রভৃতি কাজগুলি নির্দিষ্টভাবে এই কৌশলের অন্তর্ভুক্ত এবং এই কাজগুলি মস্তিষ্ক চালন কৌশলে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মনে যেসব চিন্তার চিত্র উদ্ভূত হয় সেগুলিকে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করার একটি কৌশল। ব্যক্তিগত মস্তিষ্ক চালন সৃজনশীল রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি এবং এই কৌশলটি তথাকথিত সমষ্টিগত মস্তিষ্ক চালন কৌশল অপেক্ষা শ্রেয় বলে মনে করা হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ব্যক্তিগত মস্তিষ্ক চালন কৌশল ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমষ্টিগত মস্তিষ্ক চালন কৌশল অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী।

জ) মেধার সাহায্যে প্রশ্ন প্রণয়ন (Question brainstorming) :

প্রশ্ন প্রণয়ন মস্তিষ্ক চালন কৌশলের একটি ভিন্নমুখ। এই কৌশলে প্রশ্নের চটজলদি উত্তর প্রদান অথবা সাময়িক সমাধান অপেক্ষা প্রশ্ন করার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেহেতু এই পদ্ধতিতে প্রশ্নের সমাধানসূচক উত্তর দিতে হয় না, সে কারণে এই কৌশলে অংশগ্রহণ সহজ হয়। কৌশলের সাহায্যে যেসব প্রশ্ন করা হয় তার উত্তরের মধ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি পরিকাঠামো নিহিত থাকে। এই পদ্ধতি অনুসারে মেধা ও মস্তিষ্কের সাহায্যে প্রশ্নগুলি প্রস্তুত করে তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং সেই প্রশ্নগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজিয়ে নিয়ে সমস্যাটির সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়। অনেকে এই প্রশ্নক্ষেপণকে মস্তিষ্কচালন বা মেধা বিক্ষেপণ বা মগজ ধোলাইয়ের অপর কৌশলের অন্য একটি পরিভাষা (term) হিসাবেও মনে করেন।

৪.৫. সারাংশ (Summary)

❋ আধুনিক যেকোনো আদর্শ পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর জীবনবিকাশের এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের সামঞ্জস্য বজায় রেখে গড়ে ওঠে। এই ধরনের গতিশীল পদ্ধতিতে যেহেতু শিক্ষার্থীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সক্রিয়তার ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেহেতু এখানে মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন নীতিও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ফলে, আধুনিক গতিশীল পদ্ধতিগুলি মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা জানি, শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিকতারই পরিচায়ক।

❋ আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সক্রিয়তা, জীবনকেন্দ্রিকতা, উদ্দেশ্যমুখীনতা, অনুরাগ-সহায়ক, প্রেষণা সৃষ্টির ক্ষমতা, বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশলের সমন্বয়, অনুবন্ধের নীতি, পরিবর্তনশীলতা, নির্ণায়ক ক্ষমতা, অনুশীলনের সুযোগ, বিষয়বস্তুর মনোবৈজ্ঞানিক বিন্যাস, খেলাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতির আনন্দ, পরীক্ষামূলক মনোভাব, ব্যক্তিগত বৈষম্য, বিষয়বস্তুকে মূর্ত করে তোলা, সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি।

❋ ডাল্টন পরিকল্পনা (Dalton Plan), উইনেটকা পদ্ধতি (Winnetka Method), প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project Method), সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Method), বুনিয়াদি শিক্ষণ পদ্ধতি (Basic Method), প্রোগ্রাম পদ্ধতি (Programmed instruction) ইত্যাদি কয়েকটি পদ্ধতিকে প্রতিনিধিস্থানীয় প্রগ্রতিশীল পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪.৬. প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :—

১। শিক্ষণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।

২। সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি কী কী?

৩। আবিষ্কার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৪। আলোচনা পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশলগুলি বর্ণনা করুন।

৫। প্রোজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :—

১। শিক্ষণের গতিশীল পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

২। সমস্যা সমাধান পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

৩। বক্তৃতা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

৪। আবিষ্কার পদ্ধতির সুবিধাগুলি কী কী?

৫। প্যানেল আলোচনা কী?

৬। সিমপোজিয়াম কী?

৪.৭. গ্রন্থপঞ্জি (References)

১। নির্দেশনামূলক মনোবিদ্যা — ড. সনৎ কুমার ঘোষ

২। শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ— সুশীল রায়

৩। Principles, Methods & Teachniques of teaching – J.C. Aggarwal

৪। Modern technique of teaching – V.K. Nanda.

৫। Technology of teaching – R.A. Sharma.

একক (UNIT)— ৫

শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার
(Educational Laboratory)

১। ভূমিকা (Introduction)

২। উদ্দেশ্য (Objectives)

৩। শিক্ষাবিজ্ঞান পরীক্ষাগারের পরিমাপ, আসবাবপত্র ও উপকরণ (Space, Furniture & Equipments of educational laboratory)

৪। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রদীপন (Important teaching Aids)

৫। পরীক্ষাগার সামগ্রী সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ (Procuring equipments and Preservation)

৬। পরীক্ষাগার ব্যবহারের নির্দেশাবলী (Laboratory Manual)

৭। শিক্ষণ প্রদীপন নির্বাচন ও ব্যবহার (Selection and uses of Teaching Aids)

৮। সারাংশ (Summary)

৯। প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

১০। গ্রন্থপঞ্জী (References)

১। ভূমিকা (Introduction)

পরীক্ষাগার সাধারণভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার (Science) সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান শিক্ষার মূল কথাই হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই করা। পরীক্ষাগারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মডেল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়, জ্ঞানের শিক্ষাগত মূল্য অধিক হয়। পরীক্ষাগার হবে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত এবং সেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত থাকবেন। পাঠ্যক্রম নির্ধারিত বিষয়বস্তুসমূহ যাতে শিক্ষার্থীরা পরখ করে নিতে পারে পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থীরা সে সুযোগ পাবে। শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা করে দেখাবেন। পরীক্ষাগারে কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়তা লাভ করবে, বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবে; বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, পাঠে মনোযোগী হবে।

অন্যদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান আন্তঃবিষয়ক (Interdisciplinary) বিভাগ হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ, শিক্ষা বিজ্ঞানের কাজ কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'শিক্ষা' সম্পর্কিত ধারণা (Concept) যেমন জীবনাদর্শ ও সমাজাদর্শের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করেছে, তেমনি শিক্ষার কাজ কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে, চিন্তাবিদগণের সিদ্ধান্তেরও বিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন যুগে প্রচলিত জীবনদর্শন, সমাজদর্শন এবং মানুষের প্রত্যাশা শিক্ষার

উপর আরোপিত দায়িত্ব নির্ধারণের কাজকে প্রভাবিত করেছে। মনুষ্যসমাজে শিক্ষা যখন সম্পূর্ণভাবে অসংগঠিত এবং অনিয়ন্ত্রিত ছিল, তখন অপরিণত শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল শিক্ষার প্রধান কাজ। অর্থাৎ, মানুষ যাতে জীবনের প্রাথমিক কিছু স্থূল চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করতে পারে, সে ব্যাপারে তাকে কিছু উপযোগী তথ্য সরবরাহ করা বা সেই উপযোগী কিছু দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করাই ছিল তখনকার 'শিক্ষার' প্রধান কাজ। শিক্ষার এই দায়িত্ব নির্ধারিত হয়েছিল, শিক্ষা সম্পর্কিত প্রচলিত সংকীর্ণ ধারণার দ্বারা। আবার, বিবর্তনের ধারায় আধুনিককালে শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা অনেক বিস্তৃত হয়েছে। 'শিক্ষা' ব্যক্তিজীবনের জৈবিক প্রয়োজনগুলির সঙ্গে সঙ্গে, ব্যক্তির আত্মিক প্রয়োজনগুলিও মেটাতে পারবে, এ প্রত্যাশা আধুনিক শিক্ষাবিদদের। আধুনিক জীবনাদর্শের ও সমাজাদর্শের স্বার্থেই মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলি নিবৃত্তির কৌশলের পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, শিক্ষাই আধুনিক জীবনে সেই দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ, শিক্ষার কাজের পরিবর্তনও ঘটে চলেছে। তবে প্রাচীন মতাদর্শ অনুযায়ী হোক বা আধুনিক মতাদর্শ অনুযায়ী হোক, শিক্ষার কোনো কাজকেই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে অবাঞ্ছনীয় হিসাবে পরিত্যাগ করা হয়নি; কেবলমাত্র তাদের গুরুত্ব পরিবর্তন হয়েছে বলা যায়।

দর্শন (Philosophy) এবং তার সঙ্গে মনোবিদ্যা (Psychology), সমাজবিদ্যা (Sociology) ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিজ্ঞানের জ্ঞানের সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। তাই শিক্ষাতত্ত্বে যেকোনো বিষয়ের আলোচনাতেই দার্শনিক আদর্শ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ভর যুক্তির সহ-অবস্থান লক্ষ করা যায়। মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক মানবশিশু কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সম্ভাবনাগুলি প্রকৃতিদত্ত বা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বলা যায়। এই সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনা ও ক্ষমতাগুলি বিকশিত করাই হল শিক্ষার মুখ্য কাজ। সুতরাং, শিশুর বা যে-কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ বা বৃদ্ধি (Balanced development or growth) শিক্ষার একটি কাজ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। শিক্ষার এই দায়িত্বটি নির্দিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষাবিদগণ, সামাজিক চাহিদা সম্পর্কেও সচেতন হয়ে পড়েন। কোনো ব্যক্তিই একক বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করে না। সে সমাজের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় এবং সমাজের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করে। তাই সমাজের প্রয়োজনও তাকে পরিতৃপ্ত করতে হয়। তাই শিশুর বিকাশ যদি আত্মকেন্দ্রিক হয়, সেক্ষেত্রে সমাজ উপকৃত হতে পারে না। আধুনিক প্রথাগত শিক্ষা, বৃহত্তর সমাজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তাই শিক্ষাকে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। অর্থাৎ, সমাজের কল্যাণসাধন (Social welfare) করা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শিক্ষা ব্যক্তির উন্নতিসাধনের মাধ্যমে, উন্নত ব্যক্তিত্বের দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধন করে। শিক্ষা উল্লিখিত দুটি কাজ ছাড়াও আরও একটি দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিক্ষা ব্যক্তিসত্তা বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সামাজিক কল্যাণসাধনের বা বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এই বিকাশ বা উন্নতি কোন অভিমুখে হবে এবং কতটুকু হবে, তা নির্ধারণ করার দায়িত্বও শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ব্যক্তি যেমন গতিশীল তেমনি সমাজও একটি গতিশীল সত্তা। এই গতিশীল দুইসত্তার বিকাশ বা উন্নতির মান কী তা শিক্ষাই নির্ধারণ করে।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান, শিক্ষাদর্শন তথা জীবনদর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শিক্ষা কী, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে, তাকে মনুষ্যজীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষের জীবন জটিল হলেও তা যেমন একটি সংশ্লিষ্ট একক (Complex but a synthetic unit), আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণাও তেমনি জটিলও সামগ্রিক। মানুষের প্রবাহমান জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, শিক্ষা শব্দের ব্যবহারিক

অর্থ ও তাৎপর্যের মধ্যে গতীয় ধর্ম সঞ্চার করা হয়েছে। শিক্ষা তাই জ্ঞান (Knowledge) বা দক্ষতার (Skill) মতো ফল (Product) নয়; শিক্ষা, জীবনের সঙ্গে চলমান প্রক্রিয়া (Process)। আর এই চলমান প্রক্রিয়ার চলনশক্তি সঞ্চার করছে জীবনাদর্শ ও সমাজাদর্শ। শিক্ষা যেমন তাত্ত্বিক দিক থেকে জীবনাদর্শ ও সমাজাদর্শকে অনুসরণ করে নিজে বেগবান হয়, তেমনি ফল হিসাবে জীবনাদর্শের ও সমাজাদর্শের অভিব্যক্তি ঘটায়। তাই আধুনিক শিক্ষা সুপরিকল্পিত।

আর এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার (Educational laboratory) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

২। উদ্দেশ্য (Objectives)

(১) পরীক্ষাগার বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

(২) শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

(৩) শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

(৪) শিক্ষণ প্রদীপন নির্বাচন করা ও তার ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া।

৩। শিক্ষাবিজ্ঞান পরীক্ষাগারের পরিমাপ, আসবাবপত্র ও উপকরণ (Space, Furniture & Equipments of educational laboratory)

৩.ক. পরীক্ষাগারের পরিমাপ (Space of the Laboratory) ঃ

National Council for Teacher Education (NCTE)-এর নিয়মনীতি অনুযায়ী এই পরীক্ষাগারের ন্যূনতম আয়তন হবে ৭৫ বর্গমিটার যার মধ্যে ১৫ বর্গমিটার Store Room হিসাবে পৃথক করা হবে। তবে এই পরীক্ষাগারে সর্বাধিক ২০ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ থাকবে।

৩.খ. আসবাবপত্র (Furniture) ঃ

এখানে NCTE নির্ধারিত আসবাবপত্রের একটি তালিকা দেওয়া হল-

(Nature of Furniture):

a.	Laboratory	
	Work Tables	4 Tables of Size 1.25mt ×
	(Science, Psychology,	0.9mt in each laboratory
	Educational Technology and	4 Stools (of 0.6mt ht.)/chairs
	Other labs)	ïfor each table (20 in each lab)
	Teacher's table	1 per Lab
	Teacher's Chair	1 per Lab

	Steel almirah	1 per Lab
	Storage racks	2 per Lab
b.	Workshop	
	(Furniture for each workshop)	4 work benches of size (1.25mt × 2mt × 0.75mt)
	Work benches/Stools	20 (0.5mt ht.)
	Teacher's table	1 per Lab
	Teacher's Chair	1 per Lab
	Steel almirah	1 per Lab
	Storage racks	2 per Lab
	Black board	1 (3.5mt × 1.0mt)
	(Active interaction and linkage with relevant and near by work centres)	
	Notice board	One
	Bulletin board	One

৩.গ. শিক্ষাবিজ্ঞান পরীক্ষাগারের উপকরণ (Equipments of the educational laboratory) ঃ

আন্তঃবিষয়ক বিভাগ হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি সুসংহত পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক উপকরণ থাকাটা বাঞ্ছনীয়। একটি শিক্ষার্থীর ভাষার বিকাশ সহায়ক উপকরণ থেকে শুরু করে শিক্ষণ সহায়ক প্রদীপন তথ্য প্রযুক্তিমূলক উপকরণ মানসিক প্রবণতা পরিমাপক বিভিন্ন ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষ পত্র এবং মূল্যায়ন সহায়ক বিভিন্ন প্রকার উপকরণ (tools) প্রভৃতি শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে আবশ্যিক উপকরণ হিসাবে পরিচিত।

৪। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রদীপন (Some Important teaching aids)

প্রদীপন মাত্রেই তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাদের ব্যবহার বিধিও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এখানে আমরা, কয়েকটি সাধারণ ধরনের শিক্ষামূলক প্রদীপনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব এবং শিক্ষক কীভাবে সেগুলি শ্রেণীতে ব্যবহার করবেন, সে বিষয়ে উল্লেখ করব।

বাস্তব বস্তু (Real object) ঃ

শিক্ষণের ক্ষেত্রে বাস্তব বস্তুই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। সুতরাং, শ্রেণীকক্ষে পাঠ পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষককে প্রদীপন হিসেবে যতদূর সম্ভব বাস্তববস্তুকে ব্যবহার করা উচিত। যেমন, গাছের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে শিক্ষণ দিতে গিয়ে শিক্ষক শ্রেণীতে যদি একটি চারাগাছ নিয়ে যান, তা হলে ভালো হয়। ইতিহাসের শিক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষক যদি ঐতিহাসিক কোনো বস্তুর নমুনা শ্রেণীকক্ষে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা

পাঠে অনেক বেশী আগ্রহী হয়। তবে এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ প্রয়োজন, শ্রেণীকক্ষের সীমিত পরিবেশ, সকল সময় বাস্তব বস্তু, প্রদীপন হিসেবে ব্যবহারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে বর্তমানে বিকল্প হিসেবে নমুনা (Specimen) বা বাস্তবাংশ (Realia) প্রদীপন হিসেবে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। যেমন, জীববিদ্যা পাঠের ক্ষেত্রে মরা জীবজন্তুর সংরক্ষিত নমুনা ব্যবহার করা যেতে পারে; ভূগোলে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন নমুনা ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থনীতিতে মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নমুনা দেখানো যেতে পারে। এই ধরনের নমুনা প্রদীপন হিসেবে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে একদিকে যেমন কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়, অন্যদিকে পাঠে তাদের আগ্রহ বাড়ে। তাছাড়া, এই ধরনের শ্রেণীশিক্ষণের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ধরনের বস্তু সংগ্রহের 'হবি'ও গড়ে ওঠে।

পাঠ্যপুস্তক (Text book) ঃ

পাঠ্যপুস্তক হল সবচেয়ে সাধারণ এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শিক্ষণমূলক প্রদীপন। পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে অনেকে একে আবশ্যিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং তাঁরা মনে করেন এটি একটি শিক্ষণ উপকরণ (Teaching appliance)। যাই হোক, পাঠ্যপুস্তক হল মানবজাতির চিন্তাধারার বিবরণ এবং এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষণে সহায়তা করা (A text book is a record of racial thinking organised for instructional purpose)। পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীকক্ষে বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রকৃত বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে। পাঠ্যপুস্তকের ছাপার অক্ষর শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় স্থির অপ্রক্ষিপ্ত (Still non-projected) শিক্ষণ প্রদীপন হিসবে কাজ করে। তাছাড়া, আজকাল বিষয়বস্তুকে আরও মূর্ত করে তোলার জন্য পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে বহু ছবি, মানচিত্র, লেখচিত্র ইত্যাদি ছাপা হয়। এইসব ছবি, মানচিত্র, লেখচিত্র, তালিকা ইত্যাদিও শিক্ষণ-প্রদীপন হিসাবে কাজ করে। গতানুগতিক শিক্ষণপদ্ধতিতে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের পাঠ ছাড়া আর অতিরিক্ত শিক্ষণের কাজ কিছুই করতেন না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের শিখনকৌশল কিছুই ব্যক্ত হত না। তাই বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারকে আরও নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পাঠের সহায়ক হিসেবে বিশেষভাবে কার্যকরী হওয়া উচিত।

ব্ল্যাকবোর্ড (Black-board) ঃ

ব্ল্যাকবোর্ড পাঠ্যপুস্তকের মতো শ্রেণীকক্ষের একটি আবশ্যিক শিখন সম্পদ। তাই একেও অনেকে উপকরণ (Appliance) হিসেবে বিবেচনা করেন। খুব স্বল্প খরচে এই ধরনের শিক্ষণ-প্রদীপন তৈরি করা যায় বলে এর ব্যবহার বহুল প্রচারিত। সাধারণত কালোরঙের একটি শক্ত বস্তুর তৈরি এই জিনিসটি শ্রেণীকক্ষে এমন জায়গায় স্থাপন করা হয়, যে তার উপর লিখলে বা ছবি আঁকলে শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী তা দেখতে পায়। আজকাল বোর্ড কালো রঙের না করে অন্য রঙের করা হয়; বিশেষভাবে সবুজ রঙের। কালো রঙের ওপর যে চকচকে ভাব (Glaze) থাকে এবং দেখার অসুবিধা সৃষ্টি করে, তা দূর করার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই কারণে 'ব্ল্যাকবোর্ড' কথার পরিবর্তে 'চকবোর্ড' কথাটি ব্যবহার করা হয়। ব্ল্যাকবোর্ড বা চকবোর্ড পাঠ উপস্থাপনের সময়, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে পাঠের মূল বক্তব্য, উল্লেখযোগ্য শব্দ, সারাংশ ইত্যাদি পরিবেশন করতে সহায়তা করে। তাছাড়া, বোর্ডের ওপর বিভিন্ন ধরনের ছবিও অঙ্কন করা যায়। এগুলি শিক্ষণের প্রদীপন হিসেবে কাজ করে। ব্ল্যাকবোর্ড শিক্ষার্থীদের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকাশেও সহায়তা করে।

যেমন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অভ্যাস, নির্ভুলতার অভ্যাস, পরিবেশনের ক্ষিপ্রতা ইত্যাদি। তাছাড়া, বোর্ডের অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্র সহজে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, ফলে শ্রেণীশিক্ষণের সুবিধা হয়। শ্রেণীকক্ষে বোর্ড ব্যবহার করে শিক্ষক পাঠের গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাছাড়া, এর মাধ্যমে অনুশীলনমূলক কাজ (Drill work) সহজে করানো যায়।

ফ্লানেল বোর্ড (Flannel Board) ঃ

ফ্লানেল বোর্ড, চৌম্বক বোর্ডেরই সরল সংস্করণ। এই শিক্ষণ-প্রদীপন শিক্ষক নিজেই তৈরি করতে পারেন। একটি কাঠের বা ম্যাসোনেটের বোর্ডের ওপর শক্ত করে একটি ফ্লানেল-জাতীয় কাপড় লাগালে ফ্লানেল বোর্ড তৈরি হয়। বোর্ডের ওপর ফ্লানেলের বদলে মোটা খদ্দরের কাপড় লাগালে কাজ হয়। এখন ফ্লানেল বোর্ড ব্যবহার করার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু তৈরি করতে হয়। কোনো লেখা, বা ছবি, ইত্যাদি বোর্ডে সহজে আটকানোর জন্য ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোর পেছনে শিরীষ কাগজের (Sand paper) টুকরো আটকে দেওয়া হয়। এই খণ্ড খণ্ড অংশগুলি ফ্লানেল বোর্ডের ওপর চেপে দিলে খুব সহজভাবে আটকে যায়; আবার টান দিলেই খুলে আসে। ফ্লানেল বোর্ডে ব্যবহৃত এই উপকরণগুলিকে বলা হয় ফ্লানেল গ্রাফ (Flannel graph)। এই ধরনের বোর্ডে বারবার লেখা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া, বিষয়বস্তুর চলমান অবস্থা (Movement) প্রদর্শন করা সম্ভব হয়। পাঠের মধ্যে বিষয়বস্তুর পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন হলে খন্ডগুলির শুধুমাত্র স্থান পরিবর্তন করে তা সম্ভব হয়। যেমন, ইংরেজিতে জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যে পরিবর্তন করার শিক্ষণ দিতে গিয়ে শিক্ষক This, Is, A, Table, ইত্যাদি পৃথকভাবে লেখা টুকরোগুলিকে আটকে বাক্যটি গঠন করতে পারেন। এই ধরনের প্রদীপন ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে। যেকোনো বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষণের ক্ষেত্রে ফ্লানেল বোর্ড ব্যবহার করা যায়। ফ্লানেল বোর্ডে রঙিন চিত্রও ব্যবহার করা যায়।

বুলেটিন বোর্ড (Bulletin Board) ঃ

শিক্ষক শ্রেণীতে বুলেটিন বোর্ডকে শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। শ্রেণীকক্ষে চক বোর্ডের পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় বুলেটিন বোর্ডটি রাখা উচিত। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে একটি করে বুলেটিন বোর্ড থাকে। বুলেটিন বোর্ডের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র খবর বা তথ্য সরবরাহ করা নয়, এর সাহায্যে শিক্ষক তাঁর পাঠদানের সফলতা আনতে পারেন। বুলেটিন বোর্ড শিক্ষণের কাজে নানাভাবে সহায়তা করে। প্রথমত, বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনাত্মক বিভিন্ন কাজ সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে পারে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষণের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের চার্ট, লেখচিত্র, মানচিত্র, ছবি, সংবাদপত্রের অংশ ইত্যাদি সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য শিক্ষক বুলেটিন বোর্ডকে ব্যবহার করতে পারেন। তৃতীয়ত, বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ নির্দেশ প্রচার করতে পারেন; শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কাজ নির্দেশ করতে পারেন। চতুর্থ, শ্রেণীকক্ষের বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণে সহায়তা করার জন্য, শিক্ষক বুলেটিন বোর্ড ব্যবহার করতে পারেন।

চার্ট (Chart) ঃ

শিক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য চার্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এডগার ডেল (Edger Dale) চার্টের সংজ্ঞায় বলেছেন- "Chart is a visual symbol summarizing, compar-

ing, contrasting or performing other helpful services in explaining subject matter." অর্থাৎ, পাঠ্য বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্য, বা তুলনামূলক বিশ্লেষণকে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে মূর্ত করে তোলার জন্য যে দর্শনধর্মী কৌশল, তাকে বলা হয় চার্ট। চার্ট বিষয়বস্তু ও পরিবেশনের প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এই প্রত্যেক ধরনের চার্ট শিক্ষক প্রয়োজনানুযায়ী শ্রেণীশিক্ষণে ব্যবহার করবেন -

(১) তালিকামূলক চার্ট (Table Chart) ঃ সাধারণত এই ধরনের চার্টে দুই বা ততোধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনামূলক বিচার করা হয়। এই ধরনের চার্টে প্রয়োজন মতো কতকগুলি স্তম্ভ থাকে এবং প্রত্যেক স্তম্ভে এক একটি তুলনীয় বিষয়বস্তুর জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। পরে প্রত্যেক সারিতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক বিচার করা হয়। বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি সকলরকম বিষয়ে এই চার্ট ব্যবহার করা হয়।

(২) শাখামূলক চার্ট (Branching Chart) ঃ এই ধরনের চার্টে কোনো ধারণার বিকাশ কীভাবে সংঘটিত হয়েছে, তা দেখানো হয়। এই ধরনের চার্টে সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং তার বিভিন্ন দিকের বিকাশ শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে দেখানো হয়। ভাষার ক্রমবিকাশ, জীববিদ্যায় প্রাণীর ক্রমবিকাশ ইত্যাদি শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই ধরনের চার্ট ব্যবহার করা উচিত।

(৩) ধারাবাহিক চার্ট (Flow Chart) ঃ বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত পরিস্ফুট করার জন্য এই ধরনের চার্ট ব্যবহার করা হয়। সাধারণ তিরচিহ্নের (Arrow) সাহায্যে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন, পৌরনীতির পাঠে 'সরকার কীভাবে পরিচালিত হয়' তা ব্যক্ত করার জন্য এই ধরনের চার্ট ব্যবহার করা যায়।

(৪) চিত্রযুক্ত (Pictorial Chart) ঃ এই ধরনের চার্টকে 'Isotype' চার্টও বলা হয়। চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান পরিবেশনের এটি একটি আন্তর্জাতিক রীতি। এই ধরনের চার্টে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বোঝানোর জন্য কোনো সাংকেতিক (Symbolic) বা কখনও প্রকৃত বস্তুর ছবি থাকে এবং ছবির সংখ্যার দ্বারা কোনো বিশেষ বিষয়ের পরিসংখ্যান বোঝানো হয়। এই ধরনের চার্টও শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করা যায়। ভূগোলে বিভিন্ন স্থানের ধান, পাট ইত্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ দেখানোর জন্য, জনসংখ্যা বোঝানোর জন্য এই ধরনের চার্ট ব্যবহার করা যায়।

(৫) বৃত্তীয় চার্ট (Pie Chart) ঃ এই ধরনের চার্টে একটি বৃত্তকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে প্রত্যেক অংশে কোনো বিষয়ের পরিমাণগত দিক বোঝানো হয়। আলোচ্য বিষয়ের পরিমাণগত দিক তুলনামূলকভাবে বিচারের জন্য এই ধরনের চার্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

রেখাচিত্র (Diagram) ঃ

রেখা এবং জ্যামিতিক আকৃতির সাহায্যে অঙ্কনকে বলা হয় রেখাচিত্র। রেখাচিত্রে কোনো ছবি থাকে না। এই ধরনের রেখাচিত্রের সাহায্যে যেকোনো বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যায়। জ্যামিতির শিক্ষণে, কোনো কারিগরি কৌশল বিশ্লেষণে, বা বিষয়বস্তুর সম্পর্কে বিশ্লেষণে রেখাচিত্রকে শিক্ষণমূলক প্রদীপন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভূগোল, অর্থনীতি, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়েও এই ধরনের শিক্ষণকৌশলকে কাজে লাগানো যায়।

মডেল (Model) ঃ

কোনো প্রকৃত বস্তুর প্রতিরূপকে (Representation) বলা হয় মডেল (Model)। মডেল বস্তুর আকৃতির সমান হতে পারে বা ছোটো বড়ো দুইই হতে পারে। মডেল সাধারণত ত্রিমাত্রিক (Three dimensional) হয়। যেসব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বস্তুকে শ্রেণীকক্ষে আনা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে শিক্ষণকে সহায়তার জন্য মডেল ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষণের ক্ষেত্রে মডেল ব্যবহার করা যায়। মডেলের মাধ্যমে বর্তমান ও অতীত উভয়কেই শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করা যায়। আবার, কোনো বড়ো বস্তুকে প্রয়োজনমত ছোটো করে এবং ছোটো বস্তুকে প্রয়োজনমতো বড়ো করেও উপস্থাপন করা যায়। শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন ধরনের মডেল ব্যবহার করা যায়। মডেল ব্যবহার করতে হলে মডেল নিখুঁত হওয়ারও দরকার। অর্থাৎ, কোনো প্রকৃত বিষয়বস্তুকে মডেলে রূপান্তরিত করার সময় নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী করা উচিত।

স্থির প্রক্ষিপ্ত চিত্র (Still Projected Picture) ঃ

বিভিন্ন ধরনের চিত্র এবং প্রকৃত বস্তু বা তার প্রতিরূপ শিক্ষণপ্রদীপন হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পাঠ্যবিষয়বস্তুর আলোচনাকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য, এবং শিক্ষণকে আরও কার্যকর করার জন্য শিক্ষক এইসব বস্তুর ছবি বা ফোটোগ্রাফ প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে (Projector) দেওয়াল বা পর্দার ওপর ফেলে দেখাতে পারেন। এ পদ্ধতিতে প্রদীপন আরও অনেক বেশি নিখুঁত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। স্থির প্রক্ষেপণের জন্য শিক্ষক নানা ধরনের জিনিস ব্যবহার করতে পারেন। যেমন —

(১) স্লাইড (Slide) ঃ কোনো স্বচ্ছ বস্তুর ওপর কোনো কিছুর প্রতিবিম্বকে বলা হয় স্লাইড। শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ পাঠের বিভিন্ন অংশের ওপর ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে স্লাইড তৈরি করা হয়। এই স্লাইডগুলি পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্রম অনুসারে তৈরি করা হয়। শ্রেণীতে শিক্ষক যখন যে অংশ আলোচনা করেন, তখন সেই স্লাইডটি প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে শ্রেণীর সামনে পর্দা বা দেওয়ালের ওপর ফেলেন।

(২) ফিল্ম স্ট্রিপ (Film strip) ঃ ফিল্ম স্ট্রিপ সাধারণত ফিল্ম-এর ছোটো ছোটো খণ্ড। এই খন্ডের এক একটি অংশে এক একটি চিত্র থাকে। পরপর চিত্রগুলি ক্রমানুসারে সাজানো থাকে। কোনো বিশেষ পাঠের জন্য একটি বা তার অধিক স্ট্রিপ থাকে। অনেক সময় একই এককভুক্ত পাঠের জন্য অনেকগুলি ফিল্ম স্ট্রিপ মিলে একটি একক প্রদীপন হয়। শিক্ষক প্রয়োজনমতো এগুলি প্রক্ষিপ্ত করে তাঁর শিক্ষণকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারেন।

(৩) ছবি (Picture) ঃ শিক্ষক বিশেষ যান্ত্রিক-কৌশল ব্যবহার করে কোনো ছবিকে বৃহদাকারে প্রক্ষিপ্ত করে দেখাতে পারেন। এই ধরনের প্রদীপনে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের ছবিও ব্যবহার করতে পারেন। এক বলা হয় অস্বচ্ছ প্রক্ষেপণ (Opaque Projection)।

(৪) সূক্ষ্ম বস্তু (Microscopic elements) ঃ যেসব বস্তুকে ক্ষুদ্র বলে খালি চোখে দেখা যায় না, তাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এসব বস্তুকে বৃহদাকারে সকল শিক্ষার্থীকে একত্রে দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারি। জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রাণী বা কোশ সম্পর্কে আলোচনার সময় এই ধরনের প্রদীপন ব্যবস্থা করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণপ্রদীপন ব্যবহারের জন্য যান্ত্রিক কৌশলের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আমরা যে যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করে থাকি, তাও বিভিন্ন ধরনের হয়।

ক. স্থিরচিত্র প্রক্ষেপণ যন্ত্র (Still Projector) ঃ এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা স্লাইড (Slide) অথবা ফিল্মস্ট্রিপ (Film strip)-এর প্রতিচ্ছবিকে বৃহদাকারে শ্রেণীর দর্শনযোগ্য করে পর্দার ওপর ফেলতে পারি।

খ. ফ্লিমস্ট্রিপ প্রক্ষেপণ যন্ত্র (Film strip projector) ঃ যে-কোনো প্রক্ষেপণ যন্ত্রের মধ্যে কিছু অভিযোজন (Adjustment) করে ফিল্মস্ট্রিপ প্রক্ষিপ্ত করা যায়। তাছাড়া, বিশেষভাবে ফিল্ম স্ট্রিপ প্রক্ষেপণের জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্র পাওয়া যায়। শিক্ষক ইচ্ছা করলে, সেই যন্ত্রের সাহায্যে ফিল্ম স্ট্রিপ প্রক্ষেপ করতে পারেন।

গ. ওভারহেড প্রক্ষেপণ যন্ত্র (Overhead projector) ঃ এই ধরনের প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে স্লাইড বা ফিল্ম স্ট্রিপের চিত্রকে শ্রেণীকক্ষে ওপরের দিকে কোনো অংশে ফেলা যায়। ফলে, এই ধরনের প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সুবিধা হল এই যে, শিক্ষক তাঁর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনকালে, শ্রেণীবিন্যাসের কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না করেই স্লাইড বা ফিল্মস্ট্রিপের সাহায্যে নিতে পারেন।

ঘ. মাইক্রো প্রোজেক্টর (Micro projector) ঃ এই ধরনের যান্ত্রিক কৌশলে খুব সূ বস্তুকে বড়ো আকারে প্রক্ষেপ করা যায়। সাধারণত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যেসব বস্তুকে দেখতে হয়, তাদের প্রক্ষেপণের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোনো সূক্ষ্ম বস্তুকে পর্দায় প্রক্ষেপণের পর শিক্ষক তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় অগ্রসর হন। এই কৌশলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং প্রক্ষেপণ যন্ত্রের কাজ একই সঙ্গে হয়।

ঙ. অস্বচ্ছ বস্তুর প্রক্ষেপণ যন্ত্র বা এপিডায়াস্কোপ (Opaque Projector or Epidiascope) ঃ এই যান্ত্রিক কৌশলও এক ধরনের প্রক্ষেপণ যন্ত্র। এর সাহায্যে অস্বচ্ছ বস্তুর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে তাকে প্রক্ষেপণ করা হয়ে থাকে। এর জন্য স্লাইড (Slide) বা ফিল্ম স্ট্রিপ (Film Strip)-এর প্রয়োজন হয় না। সাধারণ বইয়ের চিত্র বা বইয়ের যে পাতায় কোন তালিকা আছে, সেই সম্পূর্ণ পাতাকে বৃহদাকারে প্রক্ষপণের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এমন কী, বিশেষ বস্তুর নমুনাকেও বৃহদাকারে এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রক্ষেপণ করা যায়।

চ. শিক্ষণ যন্ত্র (Teaching Machines) ঃ শিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে, স্বয়ং শিক্ষণের (Autoinstruction) বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যবিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থিত করা যায়। অর্থাৎ, প্রোগ্রাম পাঠ্যবিষয়ক (Programmed materials) যথাযোগ্য ক্রমে পরিবেশের যান্ত্রিক কৌশলসমূহকে বলা হয় শিক্ষণ যন্ত্র (Teaching machine)। এই যন্ত্রে শুধুমাত্র যে বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করা হয় তাই নয়, প্রয়োজনবোধে রেখাচিত্র, স্লাইড, ফিল্ম স্ট্রিপ ইত্যাদিও পরিবেশন করা যায়। এই যন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—এর মধ্যে ভুল ও সঠিক উত্তর নির্ণয় করার ব্যবস্থা থাকে। কারিগরি ও প্রযুক্তির যুগে Computer এবং LCD Projector প্রভৃতি আবশ্যিক শিক্ষণ উপকরণ হিসাবেও কাজ করে।

চলমান প্রক্ষিপ্ত চিত্র (Moving projected Picture) ঃ স্থির প্রক্ষিপ্ত অপেক্ষা চলমান চিত্র শিক্ষণকৌশল হিসেবে অনেক বেশি কার্যকরী। এই ধরনের চিত্র শুধু চলমান নয়, সবাকও বটে। আক্ষপিক অর্থে, এই ধরনের শিক্ষণপ্রদীপনকে শ্রবণ-নিরীক্ষা শিক্ষণ প্রদীপন (Audio-Visual aid) বলা যেতে পারে। কারণ, এখানে শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় একই সঙ্গে কাজ করে। এই ধরনের শিক্ষণপ্রদীপন সৃষ্টির জন্যও প্রক্ষেপণ যন্ত্র

(Projector) ব্যবহার করা হয়। তবে এই ধরনের প্রক্ষেপণ যন্ত্রে শব্দ সৃষ্টিরও ব্যবস্থা থাকে বলে একে বলা হয় সবাক প্রক্ষেপণ যন্ত্র (Sound Projector)। এই প্রক্ষেপণ যন্ত্র নানা ধরনের ফিল্মে ব্যবহার করা হয়। যেমন— স্বল্পদৈর্ঘ্যের ফিল্ম (Short-length film), পূর্ণদৈর্ঘ্যের ফিল্ম (Full-length film), তথ্যমূলক ফিল্ম (Documentary film), শিশু চিত্র (Childern's film), ধীরগতি চিত্র (Slow motion picture) প্রভৃতি।

শব্দ ও প্রচারমূলক প্রদীপন (Sound & Broadcasting Aid) ঃ

বিভিন্ন ধরনের শ্রবণভিত্তিক যন্ত্র ও প্রচারমূলক যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। সাধারণত শিক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যান্ত্রিক কৌশলগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(১) টেপ রেকর্ডার (Tape recorder) ঃ টেপ রেকর্ডার শ্রবণের সাহায্যে শিক্ষায় প্রেরণা জোগায় এবং মৌখিক শিক্ষণ (Oral teaching) পদ্ধতিকে আরও বেশি কার্যকরী করে তোলে। এই ধরনের যন্ত্রে একটি চৌম্বক ফিতার (Magnetic tape) সাহায্যে শব্দ ধরে রাখা যায় এবং পরে আবার সেটিকে পুনরাবৃত্তি করা যায়। ভাষা ও আবৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের শিক্ষণকৌশল বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

(২) গ্রামোফোন (Gramophone) ঃ গ্রামোফোনে শিক্ষামূলক রেকর্ড (Disc)-এর সাহায্যে আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষণে সহায়তা করতে পারি। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা উচ্চারণ, আবৃত্তি, বক্তৃতা অনুশীলন করতে পারে। আজকাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভাষাশিক্ষণের জন্য ক্রমোচ্চমান (Graded) পাঠ (Lesson) রেকর্ড করেন। এই ধরনের পাঠগুলিকে বলা হয় লিংগুয়াফোন (Linguaphone)। এই পাঠের পরিচালনা ও অনুশীলনের জন্য নির্দেশিকা পুস্তিকা ব্যবহার করা হয়।

(৩) ভাষা পরীক্ষাগার (Language Laboratory) ঃ বর্তমানে ভাষাশিক্ষণের জন্য এই ধরনের কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট ঘরে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পৃথক পৃথক বসার জায়গা থাকে। এগুলিকে একেকটি বুথ (Booth) বলা হয়। প্রত্যেক বুথে হেডফোন (Headphone) এবং মাইক থাকে। এই পরীক্ষাগারে পরিচালককে বলা হয় মনিটর (Monitor)। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বুথের সঙ্গে তাঁর সংযোগ থাকে। তিনি সম্পূর্ণ পরীক্ষাগারের কাজ এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কোনো টেপ বা রেকর্ড-এর সাহায্যে পাঠদান করেন। শিক্ষার্থীরা নির্দেশগুলি শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে। কোনো শিক্ষার্থী ভুল করলে তিনি শুধুমাত্র তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং পৃথকভাবে তার ভুলে শুধরে দেন। এতে করে শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীর কাজের অগ্রগতির ব্যাঘাত ঘটে না। প্রয়োজনবোধে কোনো শিক্ষার্থী নিজে মনিটারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাঁর সাহায্য চাইতে পারে। এইভাবে বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলে ব্যক্তিগত পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বলে, একে ভাষা পরীক্ষাগার বলা হয়।

(৪) টেলিভিশন (Television) ঃ বর্তমানে টেলিভিশনের সাহায্যে পাঠদানের কাজকে সহায়তা করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই কৌশল বর্তমানে বহুল প্রচারিত। এমনকি, পৃথিবীর অনেক দেশে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নিজস্ব টেলিভিশন কেন্দ্র আছে। এইসব টেলিভিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত পাঠ প্রচার করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যেখানে যেখানে টেলিভিশন কেন্দ্র আছে, সেখানেও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক প্রচারসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাবিদগণ টেলিভিশনকে বহুমুখী শিক্ষণসহায়ক প্রদীপন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই ধরনের যান্ত্রিক কৌশলে শিক্ষার্থীর সামনে বিষয়বস্তুকে শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের

গ্রাহ্য করে তোলা যায়। তাছাড়া, এর মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে গতিধর্মী করেও তোলা যায়। এই কারণে টেলিভিশনকে; (Dramatized Black-board) আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(৫) মনোবৈজ্ঞানিক প্রবণতা ও পারদর্শিতা পরিমাপক বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা হল বুদ্ধি অভীক্ষা (ভাষামূলক ও ভাষাবিহীন), প্রবণতা পরিমাপক অভীক্ষা, সৃজনীশক্তি পরিমাপক অভীক্ষা, ব্যক্তিত্ব মাপক স্কেল, আগ্রহ মনোভাব পরিমাপক অভীক্ষা, সংজ্ঞাবহ চেষ্টীয় অভীক্ষা প্রভৃতি।

৫। পরীক্ষাগার সামগ্রী সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ (Procuring equipments and Preservation) ঃ

যে কোনো পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি বা উপকরণ নির্বাচনের সময় শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম ও উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রথমত, এইসব প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণের একটি তালিকা তৈরি করতে হয়। শিক্ষা উপকরণের গুণগতমান যাচাই করা এবং সেইসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করা হয় এবং স্টক বইয়ে (Stock Register) নথিভুক্ত করা হয়। এই বইয়ে ক্রয় করা উপকরণের বা সামগ্রীর নাম, দাম, তারিখ প্রভৃতির একটা নির্দিষ্ট ক্রমে নথিভুক্ত করা হয়। এই বই দু'ধরনের হলে ভালো হয়। একটিতে ক্রয় করা সমস্ত সামগ্রীর একটা নথি (Record) লিপিবদ্ধ থাকবে আর অন্যটিতে দৈনন্দিন ব্যবহার ও ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হওয়া উপকরণের তালিকা থাকবে।

৬। পরীক্ষাগার ব্যবহারের নির্দেশাবলী (Laboratory Manual)

এই ধরনের নির্দেশাবলী হল এক ধরনের পুস্তিকা যেখানে পরীক্ষাগারে বিভিন্ন কাজের নির্দেশ, কাজ করার নিয়ম-কানুন, সতর্কতা, সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করা থাকে। ব্যক্তিগত নির্দেশদানে কোনো অসুবিধা থাকলে শিক্ষক এই Manual অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কাজ করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীর সহজে ও নির্ভুলভাবে কাজ করতে এই Manual খুবই সহায়ক।

৭। শিক্ষণ প্রদীপন নির্বাচন ও ব্যবহার (Selection and use of Teaching Aid)

প্রদীপন নির্বাচন ঃ শিক্ষণের কাজে প্রদীপন ব্যবহার করার সময় শিক্ষককে তাঁর নিজের বিচার-বিবেচনা বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হয়। যেকোনো পাঠের ক্ষেত্রে প্রদীপন ব্যবহারের পূর্বে শিক্ষক বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন, তিনি কী ধরনের প্রদীপন ব্যবহার করবেন। সব রকম প্রদীপন, সবরকম পাঠের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তাই শিক্ষকের বিচার-বিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত, পাঠ এবং শিক্ষণ প্রদীপন উভয়ের কার্যকারিতা নির্ধারণ করে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কী ধরনের শিক্ষণমূলক প্রদীপন ব্যবহার করবেন, তা নির্ধারণ করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে নজর রেখে কাজ করবেন।

(১) প্রদীপন নির্বাচন করার সময় প্রথমত শিক্ষক প্রদীপনটির সাংগঠনিক দিক বিচার করে দেখবেন। অর্থাৎ, প্রদীপনটির মাধ্যমে যে বিষয়কে মূল করে তোলার চেষ্টা করে হয়েছে, তা সঠিকভাবে সম্ভব হয়েছে কিনা, তা বিচার করার দরকার। বিষয়বস্তুর নির্ভুলতা এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিচার্য। প্রদীপন যতই সুদৃশ্য হোক না কেন, তার মধ্যে যদি তথ্যগত ভুল থাকে, তা শিক্ষণের জন্য কোনো সময় নির্বাচন করা উচিত নয়।

(২) প্রদীপন নির্বাচন করার সময়, তা বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা বিচার করা প্রয়োজন। যে প্রদীপন শিক্ষণের কাজে সহায়তা করে না এবং বিষয়বস্তুর গুণাগুণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত।

(৩) প্রদীপন নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের বয়স, অক্ষিজ্ঞতা, মানসিক ক্ষমতা ইত্যাদি বিচার করা উচিত। প্রদীপনের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের ফলে বিষয়বস্তু সরলীকরণ যদি না হয় এবং প্রদীপন যদি বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতার উপযোগী করে উপস্থাপনে সহায়তা না করে, সে প্রদীপনের কোনো শিক্ষামূল্য নেই।

(৪) প্রদীপন নির্বাচনের সময় শ্রেণীকক্ষের অবস্থারও বিচার করার দরকার। যে প্রদীপন শ্রেণীকক্ষের সাধারণ অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না, সে প্রদীপন নির্বাচন করা উচিত নয়।

(৫) প্রদীপন নির্বাচন করার সময় তার ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজন। যে প্রদীপন ব্যবহারের আদর্শ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষক কিছু জানেন না, সে প্রদীপন নির্বাচন করা উচিত নয়। সাধারণত কোনো যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহারের সময় তার নির্দেশিকা পুস্তিকা সংগ্রহ করা উচিত।

(৬) প্রদীপন নির্বাচনের সময় তা কীভাবে শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে পারে, তা বিচার করা উচিত। যে প্রদীপন শিক্ষার্থীদের চিন্তনকে সক্রিয় করে তুলতে পারে না, তাদের কৌতূহল প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতে পারে না, সেই প্রদীপনের শিক্ষাগত কোনো মূল্য নেই।

(৭) এমন ধরনের প্রদীপন শ্রেণীকক্ষের জন্য নির্বাচিত করা উচিত, যা আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Teacher-pupil relation) এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Pupil-pupil relation) স্থাপনে সহায়তা করে।

(৮) প্রদীপন নির্বাচন করার সময়, তার আর্থিক দিক সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। খুব ব্যয়বহুল প্রদীপন ব্যবহার করা উচিত নয়।

(৯) প্রদীপন নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual difference) আছে, তা বিচার করা উচিত। প্রদীপন যাতে শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী হয়, তা বিবেচনা করার দরকার।

(১০) কোনো প্রদীপন শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের পর তার উপযোগিতা সম্পর্কে পুনর্বিচার করা উচিত।

প্রদীপনের ব্যবহার (Uses of Teaching Aids) ঃ

প্রদীপনের নির্বাচনের পর শিক্ষককে সেগুলি শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করতে হয়। শুধুমাত্র শিক্ষণ প্রদীপনগুলি শ্রেণীতে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করলে চলবে না, তাদের এমনভাবে ব্যবহার করা দরকার, যাতে তারা সত্যি সত্যিই শিক্ষণের কাজে সহায়তা করে। শ্রেণীতে শিক্ষণমূলক প্রদীপন ব্যবহার করতে গিয়ে শিক্ষক নিম্নলিখিত নীতিগুলি স্মরণ করবেন।

(১) শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠের কোন কোন অংশে প্রদীপন ব্যবহার করবেন, তার পরিকল্পনা পূর্বেই করা উচিত। শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে এসম্পর্কে নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) শিক্ষক কীভাবে প্রদীপন শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করবেন, তাও পূর্বে চিন্তা করা উচিত। পাঠের অগ্রগতি ও আলোচনার ধারাবাহিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে প্রদীপন স্থাপন করলে সেই প্রদীপন পাঠে সাহায্য করবে না।

(৩) শিক্ষক শ্রেণীতে যে উপকরণগুলি নিয়ে যাবেন, সেগুলি যেন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন এবং পাঠও শেষ করতে পারেন। এজন্য সময়ের বাজেট একান্তভাবে প্রয়োজন।

(৪) শ্রেণীকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের সময়, বিশেষভাবে যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহারের সময়, সম্পূর্ণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন না। মাঝে মাঝে তিনি বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

(৫) শিক্ষামূলক প্রদীপন শিক্ষক শ্রেণীতে এমন জায়গায় স্থাপন করবেন, যেন শ্রেণীর প্রত্যেক শিক্ষার্থী তা ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

(৬) শিক্ষকের মনে রাখা উচিত, প্রদীপন শিক্ষণসহায়ক, প্রদর্শনীর জিনিস নয়; তিনি শ্রেনীতে সব সময় প্রদীপনটি সামনে রাখবেন না। প্রয়োজনমতো তিনি সেটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন এবং তার প্রয়োজন শেষ হলেই সেটিকে সরিয়ে ফেলবেন। শ্রেণীর সম্মুখে যদি সবসময় প্রদীপনটি থাকে, তাহলে তা শিক্ষার্থীদের মনোযোগের ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে।

(৭) শিক্ষক শ্রেণীতে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রদীপন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যদি শিক্ষার্থীদের সহায়তা নিতে পারেন, তাহলে সেইসব প্রদীপনের উপযোগিতামূল্য অনেক বেড়ে যায়। এই সক্রিয়তা শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দেয়।

(৮) শ্রেণীতে শিক্ষামূলক প্রদীপন হিসেবে খুব চমকপ্রদ জিনিস ব্যবহার না করাই ভালো। তাতে পাঠের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীর মনেযোগ ওই বস্তুটির বৈশিষ্ট্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। সব সময় শিক্ষক সহজ, সরল শিক্ষামূলক প্রদীপন ব্যবহার চেষ্টা করবেন।

৮। সারাংশ (Summary)

★ পরীক্ষাগার সাধারণভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার (Science) সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান শিক্ষার মূল কথাই হল পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই করা। পরীক্ষাগারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মডেল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়, জ্ঞানের শিক্ষাগত মূল্য অধিক হয়। পরীক্ষাগারে কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়তা লাভ করবে, বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবে; বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, পাঠে মনোযোগী হবে।

★ আন্তঃবিষয়ক বিভাগ হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি সুসংহত পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক উপকরণ থাকাটা বাঞ্ছনীয়। একটি শিক্ষার্থীর ভাষার বিকাশ সহায়ক উপকরন থেকে শুরু করে শিক্ষণসহায়ক প্রদীপন তথ্য প্রযুক্তিমূলক উপকরণ মানসিক প্রবণতা পরিমাপক বিভিন্ন ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষ পত্র এবং মূল্যায়ন সহায়ক বিভিন্ন প্রকার উপকরণ (tools) প্রভৃতি শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে আবশ্যিক উপকরণ হিসাবে পরিচিত।

★ শিক্ষণের কাজে প্রদীপন ব্যবহার করার সময় শিক্ষককে তাঁর নিজের বিচার-বিবেচনা বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হয়। যেকোনো পাঠের ক্ষেত্রে প্রদীপন ব্যবহারের পূর্বে শিক্ষক বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন, তিনি কী ধরনের প্রদীপন ব্যবহার করবেন। সবরকম প্রদীপন, সবরকম পাঠের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তাই শিক্ষকের বিচার বিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত, পাঠ এবং শিক্ষণ প্রদীপন উভয়ের কার্যকারিতা নির্ধারণ করে।

৯। প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

(১) পরীক্ষাগার বলতে কী বোঝায়? শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।

(২) শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিন।

(৩) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ প্রদীপন নির্বাচন ও ব্যবহারের নীতিগুলি আলোচনা করুন।

(ক) শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের আয়তন কত?

(খ) শিক্ষাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের আসবাবপত্রের একটি তালিকা দিন।

(গ) ব্ল্যাকবোর্ড সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

(ঘ) বুলেটিন বোর্ডের ব্যবহার লিখুন।

১০। গ্রন্থপঞ্জী (References)

1. Joshua M. Pearce, Open-Source Lab:How to Build Your Own Hardware and Reduce Research Costs, Elsevier, 2014.
2. Joshua M. Pearce, "Building Research Equipment with Free, Open-Source Hardware," Science)
3. Michael L. Matson, Jefrey P. Fitzgerald, Shirley Lin (2007). "Creating Customized, Relevant, and Engaging Laboratory Safety Videos".
4. Bond, L. (1995). Norm-referenced testing and criterion-referenced testing: The differences in purpose, content and interpretation of results. Oak Brook, IL: North Central Regional Educational Laboratory.
5. Herman, J.L., Aschbacher, P.R., & Winters, L. (1992). A practical guide to alternative assessment. Alexandria.
6. Newman, D., Griffin, P., & Cole, M. (1989). The construction zone: Working for cognitive change in school. Cambridge, MA: Cambridge University Press.